কমিউনিজম ও ভাবীকাল

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

চিরায়ত প্রকাশন
প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট • কলকাতা ৭০০০৭৩

COMMUNISM O BHABIKAL

Bengali translations of Rahul Sankrityayan's Hindi Originals
Samyabad hi Kyon* and *Baisvin Sadi

প্রথম সংস্করণ
আশ্বিন, ১৩৭০

প্রকাশক

শিবব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড

কলকাতা ৭০০০৭৩

মুদ্রাকর

শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়

এস. বি. প্রিণ্টার্স

কলকাতা ৭০০০০৬

অনুবাদ

জ্যোতিশঙ্কর ভট্টাচার্য ও মলয় চট্টোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ

সুবোধ দাশগুপ্ত

প্রকাশকের নিবেদন

পণ্ডিতপ্রবর এবং ভারতীয় সাহিত্যে সাম্যবাদী চিন্তাধারার অন্যতম পথিকৃৎ রাহুল সাংকৃত্যায়নের 'সাম্যবাদ হী কিঁউ' এবং 'বাইসবীং সদী' নামের দুটি বই একসঙ্গে বাঙলায় তর্জমা করে 'কমিউনিজম ও ভাবীকাল' নাম দিয়ে আমরা প্রকাশ করলাম। যে দুটি বই একসঙ্গে তর্জমা হলো সেই বই দুটি প্রসঙ্গে কিছু তথ্য আমরা পাঠকদের জানাতে চাই এবং কেন দুটি আলাদা বই এক করে বাঙলায় প্রকাশ করছি তার সপক্ষে আমাদের যুক্তি কি, সেটাও এই সুযোগে বলে দেওয়া যাবে।

প্রথমোক্ত বইটির ভূমিকায় রাহুলজী লিখেছিলেন, যাঁরা সাম্যবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে প্রাথমিকভাবে এবং অল্প সময়ের মধ্যে পরিচিত হতে চান তাঁদের জন্যেই বইটি লেখা এবং লেখকের উদ্দেশ্য যে সফল হয়েছিল তা' জানা যাচ্ছে উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা থেকে। বাঙলা ভাষায় এ ধরনের বই দু'একটি লেখা হলেও রাহুলজীর মতো প্রাঞ্জল ভঙ্গীতে মার্কস্‌বাদের প্রাথমিক ধারণা অর্জন করার বইয়ের অভাব এখনও রয়েছে। তাই আমাদের এই প্রচেষ্টা। এইসঙ্গে এটা বলে নেওয়া দরকার, ১৯৩৪ সালে প্রথম প্রকাশিত 'সাম্যবাদ হী কিঁউ' কয়েক বছর পরে দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশকালে সামান্য কিছু সংশোধন ও সংযোজন লেখক নিজের হাতে করেছিলেন এবং সেখানেই পরিমার্জনার কাজ শেষ। তাই সাম্যবাদী দর্শনের মূল ভিত্তিভূমি বহু বিস্তৃত বিজ্ঞানের যে সূত্রগুলি ঐ সময়ে গ্রাহ্য হতো সেগুলির ওপর নির্ভর করেই লেখক কমিউনিজমের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। মূল গ্রন্থ প্রথম প্রকাশের পর ৪৬ বছর আমরা এগিয়ে এসেছি —বিজ্ঞানও সেই অনুপাতে এগিয়ে চলেছে। তাই রাহুলজী যে সব বৈজ্ঞানিক সূত্র-সিদ্ধান্তকে কমিউনিজমের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে ব্যবহার করেছিলেন তার কয়েকটি একালে পরিত্যক্ত। কিন্তু যে

উদ্দেশ্য নিয়ে বইটি লেখা সেই উদ্দিষ্ট পথে আজ পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ক্রমশ অধিকতর সংখ্যায় এগিয়ে চলেছেন। তাঁদের দরকার —সহজ ও সরল ভাষায় সাম্যবাদ কি ও কেন জেনে নেওয়া। আমরা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, প্রাথমিকভাবে যাঁরা কমিউনিজম কি ও কেন জানতে চান তাঁদের কাছে এই বইটির প্রথম অংশ (সাম্যবাদ হী কিঁউ) আলোক-বর্তিকা হিসাবে গৃহীত হবে।

'বাইসবীং সদী' রাহুলজীর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। রাহুলজীর বিশেষ স্নেহ-ভাজন এবং সাম্প্রতিক হিন্দী সাহিত্যের অগ্রণী সাহিত্যসেবক প্রভাকর মাচওয়ে বইটিকে উপন্যাস হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু রাহুলের আত্মজীবনী থেকে জানা যায়, 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো', লেনিনের 'রাষ্ট্র' এবং আরও কয়েকটি ছোট ছোট পুস্তিকা পড়ে রাহুল এক শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেন এবং তারই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় উপন্যাসের ধরনে 'বাইসবীং সদী' লিখে ফেলেন। এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, ১৯২৩ সালে রাহুল দু'শ' বছর পরে সাম্যবাদী পৃথিবীর যে ছবি এঁকেছেন সেটা কল্পনাশ্রয়ী সাম্যবাদের (ইউটোপিয়ান সোসালিজম্-এর) বেশী কিছু নয়। কিন্তু সেই কল্পনাশ্রয়ী উপন্যাসে সমগ্র পৃথিবীর মানুষের যে সুখ-সমৃদ্ধি-নিরাপত্তার কাহিনী বিধৃত হয়েছে সেটাই কমিউনিজমের এক অগ্রবর্তী লক্ষ্য।

তাই আমাদের প্রকাশিত 'কমিউনিজম ও ভাবীকাল' বইটিতে কমিউনিজমের লক্ষ্য, পদ্ধতি ও ঐতিহাসিক বিকাশ ধারার যেমন প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া যাবে, তেমনি ভাবীকালের পৃথিবীকে কমিউনিস্টরা কিভাবে রূপান্তরিত করতে চান সে সম্পর্কেও একটা মোটামুটি ধারণা করে নিতে পারবেন। আগেই বলেছি, এই বই মার্কসীয় প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করবে, ভূমিকা শেষ করার সময় আবার বলছি, সাম্যবাদ এবং ভবিষ্যৎ সাম্যবাদী সমাজ সম্পর্কে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সাধারণ পাঠকরা মোটামুটি স্বচ্ছ ধারণা পেয়ে যাবেন এই একটি বই-এর মধ্যেই।

কমিউনিজম

(সাম্যবাদ হী কিঁউ ?)

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

১৯৩৪ সালে 'সাম্যবাদই বা কেন' বইটি লিখেছিলাম। ঐ সময়ে হিন্দীভাষায় এই ধরনের বইয়ের অভাব ছিল। এই স্বল্পাকার বইটি পাঠকদের ভালো লেগেছে জেনে আমার প্রচেষ্টা সফল হয়েছে মনে করি। বর্তমান সংস্করণে অনেক জায়গাতেই সংশোধন করেছি, পাঠক হয়তো বা চিন্তা করেছিলেন, বইটির আকার বৃদ্ধি ঘটবে কিন্তু তার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। সাম্যবাদের বিষয় সবিস্তারে জানতে উৎসুক পাঠকদের জন্যে ইতিমধ্যেই অন্যান্য পুস্তক রচনা করেছি। আধুনিক বিজ্ঞান যে কীভাবে সাম্যবাদী ভাবনা-চিন্তাকেই সমর্থন করে —তা' জানতে হলে 'বিশ্বের রূপরেখা' পড়তে পারেন, মানব-সমাজের বিকাশ ধারায় কীভাবে এক বিশেষ সময়ে সাম্যবাদ এসেছে, তা' জানার জন্যে আছে 'মানব-সমাজ', সাম্যবাদী দর্শনের জন্যে আছে 'বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ' এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমস্ত দর্শনগুলির সাম্যবাদী বিশ্লেষণ করেছি 'দর্শন-দিগ্‌দর্শন' গ্রন্থে। আর ইতিহাস তার গতিপথে চলতে চলতে কী ভাবে সাম্যবাদের দরজায় উপস্থিত, তা' যদি কাহিনীর রূপে পড়তে চান, তার জন্যে আছে —'ভোল্‌গা থেকে গঙ্গা'। এগুলি ছাড়াও সাম্যবাদের মহান্ নেতৃবৃন্দ—মার্কস, এঙ্গেলস্, লেনিন ও স্তালিন-এর বহু গ্রন্থই হিন্দীভাষায় অনুবাদ করেছি। এই চিন্তা থেকেই বর্তমান পুস্তকটির আকার বৃদ্ধি ঘটাইনি। মোটামুটিভাবে দু'তিন ঘণ্টার মধ্যেই সাম্যবাদ সম্পর্কে যাঁরা জানতে এবং বুঝতে চান, তাঁদের জন্যে' এই বইটিকে প্রবেশিকা বলে ধরা যেতে পারে। আর যাঁরা, আরো বিশদভাবে জানতে ইচ্ছুক, নিজের জন্যে এবং আগামীকালের উত্তরপুরুষ আর মানবতার কল্যাণ সাধনে যে জ্ঞান অত্যন্ত জরুরী, তাঁদের জন্য আছে আরো বহু মূল্যবান গ্রন্থাদি।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

প্রথম সংস্করণে লেখকের ভূমিকা

যাদের ইংরাজী অথবা অন্যান্য ভাষায় রচিত এই বিষয়ের ওপর ভালো ভালো বই পড়বার সুযোগ নেই ; অথবা যাঁরা আমারই মতো স্বয়ম্ভু পণ্ডিত, তাঁদের জন্যেই এই বইটি লিখেছি। 'বাইসবীং সদী' (ভাবীকাল) লেখার আগে পর্যন্ত, অর্থশাস্ত্র এবং সাম্যবাদ এই দুই বিষয়েই আমার জ্ঞানের ভাণ্ডার ছিল নিতান্তই সামান্য। এই বইটি লেখার সময়েও সাম্যবাদ সম্পর্কে আমার জ্ঞানের পরিধি ঠিক ঐ রকম না হলেও, অতি অল্প তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমার নিজের মনে বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত সমস্যা ভিড় করেছে, সেগুলি সমাধানের দৃষ্টিভঙ্গী মাথায় রেখে এই বইটি লিখেছি। আধুনিক সভ্যতা থেকে বহুদূর, লাসা নগরীতে প্রবাসকালে এই বইটি লিখেছি বলে প্রয়োজনীয় বই-পত্তরের সাহায্য একেবারেই পাইনি। এক রকমভাবে বলা যেতে পারে, কাগজ-কলম নিয়ে বসে শুধুমাত্র চিন্তাকে আশ্রয় করেই এই বইটি লিখেছি ; কাজে কাজেই ত্রুটি না থাকলেই আশ্চর্য হব। আলোচনা প্রসঙ্গে এক সময় আমার এক বন্ধু বলেছিলেন —'সাম্যবাদ কেন ?' এই বিষয়ে না লিখে 'সাম্যবাদ কীভাবে প্রতিষ্ঠা হবে' এই প্রসঙ্গে আমার লেখা উচিত, এই ব্যাপারে আমার অসমর্থতা জানিয়ে হয়তো বা তাঁকে অসন্তুষ্ট করেছি, কিন্তু অনেক ভাবনা চিন্তা করে দেখেছি যে, আমি ঐ কাজের সম্পূর্ণ অযোগ্য, আর ঐ বিষয়ে আমার জ্ঞানের ভাণ্ডার যে নিতান্তই অপর্যাপ্ত সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন


Rahula Sankrityayan

ভূমিকা

মানুষের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

মানবজাতির ক্রমবিকাশের একটি বিশেষ পর্যায়ের রূপই হচ্ছে, কমিউনিজম বা সাম্যবাদ। সুতরাং আলোচ্য বিষয়ে প্রবেশের আগে, মানবজাতির উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশের ইতিহাস সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের মতামত জেনে নেওয়াটা বিশেষ জরুরী। এই বইটি ভারতবর্ষের বিশেষ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে রচিত, তাই মানুষের ক্রমবিকাশের কথা লেখবার সময়েও ভারতবর্ষকে মনে রাখা হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক এবং জ্যোতির্বিদদের মতে আজ থেকে বেশ কয়েককোটি বছর আগে আমাদের গ্রহ, উপগ্রহ, সূর্য সব কিছুই একটি পিণ্ডাকারে ছিল। আজকের তুলনায় তখন সূর্যের তাপ ছিল আরো অনেকগুণ বেশী। পৃথিবী, মঙ্গল ইত্যাদি গ্রহগুলির উপাদানও বাষ্পীয় আকারে থাকার ফলে সূর্যপিণ্ডটি অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আজকের তুলনায় সূর্যপিণ্ডটি যদিও আরো অনেকগুণ বৃহদাকার ছিল কিন্তু সেই কারণে সারা আকাশ যে সূর্যের দ্বারা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, তা মোটেই নয়। রাত্তিরে আকাশের দিকে তাকালে যে অসংখ্য তারা দেখতে পাই, সেগুলির আয়তনের সঙ্গে তখনকার সূর্যের তুলনা করা যেতে পারে এবং এই সমস্ত তারা যেমন আকাশকে ঢেকে ফেলতে পারে না, তেমনি সূর্যও কখনো আকাশকে ঢাকতে পারেনি। এই সব তারা যেন বিশাল সমুদ্রের বুকে বেয়ে চলা এক-একটি নিঃসঙ্গ জাহাজ। সূর্যের আশপাশের জায়গা ছাড়া তখন আকাশটা ছিল আজকের মতোনই ঠাণ্ডা। অনেক অনেক বছর আগে এক জ্যোতির্মণ্ডলীয় দুর্ঘটনার ফলে অগ্রসরমান কোনো এক নক্ষত্রের বিপুল আকর্ষণে সূর্যের দেহের কিছুটা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়েই পৃথিবীর রূপ পরিগ্রহ করেছিল। ঘটনাটি এই ধরনের—বহুকাল আগে কোনো একসময় আকাশের এক বিশাল নক্ষত্র সূর্যের দিকে

যেতে থাকে। ঐ নক্ষত্র যতই সূর্যের কাছাকাছি আসে, ততই সূর্যের বাষ্প-সমুদ্রে উঠতে থাকে এক বিশাল জোয়ার-ভাটা। নক্ষত্রটি সূর্যের নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রায় কোটি মাইল লম্বা চুরুটের মতো একটা লেজ তৈরী হয়ে যায়। এবং যখন সেই নক্ষত্রটি সূর্য থেকে ক্রমশ দূরে সরে গেলো তখন ঠিক জোয়ারের বেগে সমুদ্রের বাইরে উপছে পড়া ঢেউয়ের মতো, সূর্যের বাষ্প-সমুদ্রের ঐ লেজের অংশটি প্রধান অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। ঐ আলাদা হয়ে যাওয়া অংশটিই কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়ে সূর্যের চারধারে প্রদক্ষিণ করতে লাগল। এইভাবেই সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলির জন্ম। এরপর প্রায় কয়েককোটি বছর বাদে, ঐ একইভাবে সূর্যপিণ্ড থেকে আলাদা হয়ে পৃথিবীর সৃষ্টি। এবং এইভাবেই আকাশের কোনো গ্রহগত কারণেই পৃথিবীর একটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে সৃষ্টি হলো চন্দ্র।

পৃথিবীর উষ্ণতা ক্রমশ তাপ বিকীরণ করতে করতে পৃথিবীর চারপাশের শীতল আবহাওয়ায় ছড়িয়ে গেলো। এরপর ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে পড়তে লাগল স্তর। তখনকার উষ্ণ আবহাওয়ায় উৎপন্ন বায়ুমণ্ডল, মেঘমণ্ডল পৃথিবীকে পরিক্রমণ করতে লাগল। এর ফলে কখনো কখনো বৃষ্টি হতো কিন্তু ঐ তপ্ত স্তর নিমেষে বৃষ্টির জল শুষে নিতো। মাঝে মাঝে পৃথিবী থর-থর করে কেঁপে উঠত, আর সেই স্তর ভেঙেচুরে সৃষ্টি হলো উঁচু-নীচু জমি আর খাদ-গুলি। পৃথিবীর তাপমাত্রা যখন আরো খানিকটা কমলো, ঐ খাদগুলিতে জমতে লাগল বৃষ্টির জল। আর এইভাবেই তৈরী হলো সৃষ্টির আদিকালীন সমুদ্র। এই সমুদ্র ছিল নিতান্তই অগভীর। এবং ঐ স্তরীভূত শিলা-ই আজ স্ফটিক ইত্যাদি স্তরে পরিণত, পরে (প্রাণীর জন্মের আগে) আশপাশের পাহাড়ের গা বেয়ে আসা বৃষ্টির জলে স্তরের পর স্তর জমতে লাগল ধুলোরাশি আর তাই আজ স্তরীভূত অজীব শিলা। প্রথমদিকে সমুদ্রের জল ছিল খুবই উষ্ণ, আরো লাখ লাখ বছর বাদে যখন পৃথিবীর উপরিভাগ আরো ঠাণ্ডা হলো, তখন সমুদ্রের জলের উষ্ণতাও ক্রমশ কমলো। এই সময়েই সমুদ্রে প্রথম জীবের জন্ম হলো। কেঁচোর মতোন অস্থিবিহীন জীব। জীবের বিশেষ গুণই হচ্ছে —অন্তর্বৃদ্ধি এবং পরে প্রসব।

ভূ-তাত্ত্বিকদের মতে, আজ থেকে প্রায় তিরিশকোটি বছর আগে পৃথিবীতে জীবের উৎপত্তি। এই সময়কে জীবকল্প বলা যেতে পারে; আর এর আগের সময়কে বলা হয় অ-জীবকল্প (Azoic)।

আস্তে আস্তে পৃথিবীর তাপমাত্রা আরো কমতে লাগল, মৃতপ্রাণী আর ধুয়ে আসা ধুলোর সংমিশ্রণে তৈরী হলো বিবর্তিত প্রাণীর খাদ্য। যার থেকে সৃষ্টি হলো কাঁকড়া ইত্যাদি প্রাণীর আর নিম্নমানের কিছু গাছপালার। তিরিশ কোটি বছর আগের পুরাতন জীবকল্পের প্রায় দশ কোটি বছর পর এল মধ্য-জীবকল্প (সরীসৃপ যুগ)। এই সময় পৃথিবীতে বসবাস ছিল ভয়ঙ্কর সরীসৃপদের। ভূ-গর্ভ থেকে শ'শ ফুট লম্বা এদের হাড়ের জীবাশ্ম (ফসিল)

পাওয়া গিয়েছে। এই যুগেই ভূ-পৃষ্ঠের নানা জায়গায় বিশাল বিশাল পাতা-বিহীন গাছের জন্ম হয় এবং সেই সমস্ত গাছকেই আজ আমরা পাথুরে কয়লার রূপে পাই।

সরীসৃপ যুগের শেষভাগে পৃথিবীর জল-বায়ুতে আমূল পরিবর্তনের ফলে অধিকাংশ জীবগুলি (Species) ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই সময়েই সমুদ্রের নিকট-বর্তী শুকনো ডাঙাতে গাছপালা জন্মাতে থাকে। জন্ম নিল উভচর প্রাণী, যার মধ্যে একদিকে স্তনধারী জন্তু, লোমধারী জন্তু আর অপর দিকে পক্ষী।

গাছপালার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভূমি থেকে জল শুষে সবুজ বনরাশি সমুদ্রতট থেকে আরো বহু দূর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হতে লাগল; অন্য দিকে শীত-গ্রীষ্ম ইত্যাদি সহ্য করার জন্য প্রাণীর শরীরে গজিয়ে উঠল বিশেষ লোম, ডানা ইত্যাদি। ভূ-কম্পনের ফলে সমুদ্রগর্ভে বিলীন অধিকাংশ জমি ডাঙায় উঠে এল, মৃত্তিকাপূর্ণ জমির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ঐ ডাঙা দূর-বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হলো।

বৈজ্ঞানিকদের মতে, এই সমস্ত লোমধারী আর স্তনধারী প্রাণীদের মধ্যে কেউ কেউ শত্রুর হাত থেকে বাঁচবার তাগিদেই গাছে চড়তে শিখল এবং নিরবচ্ছিন্ন ভাবে এই গাছে চড়ার অভ্যাস থেকেই তাদের হাত-পা ইত্যাদি শারীরিক অবয়বগুলি হলো গাছে চড়বার উপযোগী। এবং এইভাবেই বৃক্ষারোহণে পটু বানর জাতির সৃষ্টি।

ইতিমধ্যেই আমরা সরীসৃপ যুগ ছেড়ে নবজীবকল্পের 'ইয়োসিন্' (Eocene) যুগে প্রবেশ করেছি।

'ইয়োসিন্' যুগের প্রথম দিকে, ভারতবর্ষের বিন্ধ্যাচল থেকে দক্ষিণভাগ পর্যন্তই সমুদ্রগর্ভের বাইরে ছিল। ঐ সময় তিব্বত, হিমালয় ও ভারতের বাকী অংশ ছিল সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন। 'মায়োসিন্' (Miocene) যুগে, ভূ-পৃষ্ঠের প্রচণ্ড আলোড়নের ফলে হিমালয় পৃথিবীর উপরিভাগে উঠে এল। এককালে সমুদ্রগর্ভে থাকার ফলে আজও হিমালয়ের পর্বতশৃঙ্গগুলিতে সামু-দ্রিক জীবজন্তুর ফসিল পাওয়া যায়।

ভূ-সঞ্চালনের ফলে কোনো সময়েই সমুদ্রগর্ভ থেকে জমি সহজ-সরলভাবে ওপরে উঠে আসেনি এবং অজীবকল্প আদিম সমুদ্রগর্ভ থেকেও স্তরের পর স্তর জমি উপরিভাগে উঠে আসেনি, সব সময়েই এই উঠে আসাটা হয়েছে এবড়োখেবড়ো ভাবে। এবং এই কারণেই, পাহাড়ের উপর পাথরের স্তরকে আমরা এবড়োখেবড়ো ভাবেই দেখতে পাই। বৃষ্টির জল হিমালয়ের গা ধুয়ে অপার বালুকারাশি সঙ্গে নিয়ে, নদীগুলি দিয়ে সমুদ্রাভিমুখে বইতে লাগল। অপরদিকে ইতস্তত ভূ-কম্পনের ফলেও সমুদ্রের উপর প্রচণ্ড প্রভাব পড়ল। এইভাবেই গঙ্গা ইত্যাদি নদীগুলি হাজার হাজার বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে উত্তর ভারতকে সমুদ্রসীমা থেকে আলাদা করতে সক্ষম হলো।

যে সময়টায় উত্তর ভারতের ভূমি প্রস্তুত হচ্ছিল, ঐ সময়েই হিমালয়ের

পাদদেশে শিবালিক্-এ (সপাদলক্ষ) বিভিন্ন জন্তুজানোয়ার বসবাস করত। অধুনালুপ্ত গরিলা, বনমানুষ ইত্যাদি বহু জীব-জন্তুর ফসিল আজও সেখানে পাওয়া যায়। আবিষ্কৃত বনমানুষের ফসিল ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, আজ থেকে প্রায় চার-পাঁচ লাখ বছর আগের 'মায়োসিন্' যুগের সমসময়েই বিবর্তনের ধারা মানবজাতির দিকে অগ্রসর হয়েছিল। এই সময়েই মানুষ আর বনমানুষের অন্তর্বর্তীকালীন এক প্রাণীজাতির অস্তিত্বের প্রমাণ শিবালিক্-এ পাওয়া যায়।* আবার এই একই সময়, জাভায় মানুষ এবং বনমানুষের মাঝামাঝি এক বিশেষ প্রাণী বসবাস করত, এই জাতিকেই 'পিথে-ক্যানথ্রোইরেক্টাস্' (Pithe-canthroerectus) বলা হয়।

প্রায় দু'লাখ চল্লিশ হাজার বছর আগে পৃথিবীর বুকে এক ভয়ঙ্কর হিম-প্রলয় ঘটে। এর কারণ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকেরা বিভিন্ন মতামত পোষণ করেন। কেউ কেউ বলেন, এই সময় সৌরমণ্ডলের বাইরের কোনো গ্রহ পৃথিবীর খুব কাছ দিয়ে যাওয়ার ফলে পৃথিবীর অক্ষ (Axis) সামান্য তেরছাভাবে বেঁকে যায়, যার ফলে ঋতু পরিবর্তনের সৃষ্টি। অথবা সৌর-জগতই ঘুরতে ঘুরতে আকাশের কোনো অতিশীতল অঞ্চলে গিয়েছিল। জলের বিশেষত্ব এই যে, যেখানে অন্যান্য জলীয় পদার্থ অত্যধিক শীতল অবস্থায় সঙ্কুচিত হয়ে জমে যায়, সেখানে জল অবশ্য জমে—তবে ছড়িয়ে গিয়ে জমে। যদি আজ হঠাৎ কোনো কারণে পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রের জল জমে যায়, তা'হলে ঐ জল বরফ হয়ে পৃথিবীর স্থলভাগের বহুদূর পর্যন্ত দখল করে প্রায় একশো হাত পুরু বরফ হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে যাবে। ঐ সময় পৃথিবীর অক্ষ একটু বেঁকে যাওয়ার ফলে পৃথিবীতে প্রচণ্ড শীতের আধিক্য হয় এবং উত্তর গোলার্ধ পর্যন্ত বরফে ঢেকে যাওয়ার ফলে সমগ্র উত্তর ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার নিউইয়র্ক পর্যন্ত বারোমাসের জন্য বরফে ঢেকে গেলো। দক্ষিণ গোলার্ধে টাস্-মেনিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশেরও ঐ একই দশা হয়। ভারতবর্ষে হিমালয়ের যে হিমবাহ আজ দশহাজার ফুটের নীচে কোথাও নেই, তা তখন পোঠবার-এ (কাশ্মীর) দু'হাজার ফিট (সমুদ্রতল থেকে উপরে) পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। ঐ সময় কলকাতাতেও লণ্ডনের মতোই ঠাণ্ডা পড়ত। কারণ যাই হোক, এই হিমযুগ সমগ্র ভূ-মণ্ডলের উপর এক দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল।

প্রথম হিমযুগের স্থায়িত্বকাল প্রায় এক হাজার বছর। তার পর এল

---

* বিগত শতকের শেষভাগে ভারতীয় জিওলজিক্যাল সার্ভের ডঃ পিলগ্রিম ও তাঁর সহকর্মীরা প্রমাণ করেন যে, 'মায়োসিন্' যুগে ও 'প্লায়োসিনে'র গোড়ার দিকে ভারতবর্ষে বৃহদাকার নানা জাতের অ্যান্থ্রোপয়েড বনমানুষের বসবাস ছিল। পিলগ্রিমের প্রাপ্ত অন্যান্য অ্যান্থ্রোপয়েডের মধ্যে 'শিবালিক্' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। —অনুবাদক

দ্বিতীয় হিমযুগ। আজ থেকে প্রায় এক লাখ বছর আগে এল তৃতীয় হিম-যুগ এবং পঞ্চাশ হাজার বছর আগে চতুর্থ হিমযুগ। এই হিমযুগগুলির দরুণ পৃথিবীর প্রাণীজগতে হয় এক বিশাল ওলোট্‌ পালোট্‌। এর ফলে বেশ কিছু প্রাণীজাতি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে চিরতরে লুপ্ত হয়ে যায় এবং এদের মধ্যে যারা আত্মরক্ষার তাগিদে শরীর আর মনকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পেরেছিল, তারাই অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পেরেছে। আজ থেকে বেশ কয়েক লাখ বছর আগে, শেষ হিমযুগের অনেক আগে, পূর্ব ইউরোপে এক ধরনের মনুষ্য জাতির সন্ধান পাওয়া যায়, যাদের হাইডেল্‌বর্গীয় মানুষ বলা হয়। এমনিতে গরিলা বা বেবুনকে ডাণ্ডা বা পাথর ছুঁড়ে মারতে দেখা যায়, কিন্তু হাইডেল্‌বর্গীয় মানুষ ভীমবেগে লম্ফঝম্প করে প্রবল পরাক্রমে পাথরের হাতিয়ার প্রয়োগ করত। পঞ্চাশ হাজার বছর আগে চতুর্থ হিমযুগের সময় ইউরোপে নিয়াণ্ডার্থাল মনুষ্য জাতির অস্তিত্বের খবর পাওয়া গেছে। অত্যধিক শীতের ফলে এরা পাহাড়ের প্রাকৃতিক গুহাতে বসবাস করত। এই জাতি পাথর ও গাছের ডালপালাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে জানত। শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচবার তাগিদে তারা যেমন আগুনের ব্যবহার জানত, তেমনি শিকার করা জন্তুজানোয়ারের চামড়া দিয়ে নিজেদের শরীরকেও ঢাকতে শিখেছিল। এদের শরীরের গঠন ইত্যাদি থেকে অনুমান করা হয় যে, এরা তীর-ধনুকের ব্যবহার জানত না অথবা জানলেও খুব সামান্যই জানত। তখনো এদের মনে ধর্ম দেবতা ইত্যাদি কল্পনার সৃষ্টি হয়নি।

যে সময় ইউরোপের গুহায় নিয়াণ্ডার্থাল মানুষ বাস করত, ঠিক ঐ একই সময় দক্ষিণ ভারতের গুন্টুর, কর্নুল, কড়পা ইত্যাদি স্থানেও মানুষ গুহায় বস-বাস করত। এই দুই জায়গার প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভেদ এই ছিল—যখন চতুর্থ হিমযুগের দরুণ ইউরোপে শীতের প্রকোপ ছিল অত্যধিক, তখন ভারতে ঠাণ্ডা ছিল সহনশীল। চল্লিশ হাজার বছর পূর্ব থেকে পঁচিশ হাজার বছর পূর্ব পর্যন্ত ধীরে ধীরে ইউরোপে শীতের প্রকোপ কমে যেতে লাগল এবং ভারতবর্ষেও ঠিক ঐ এক নিয়ম অনুসারেই আবহাওয়ার পরিবর্তন হলো।

পঁচিশ হাজার বছর আগে ইউরোপে স্পেন ইত্যাদি দেশে আর একটি জাতির মানুষ বসবাস করত, এদের 'ক্রোমাগ্‌নন্‌' (Cromagnon) বলা হয়। যদিও নিয়াণ্ডার্থাল জাতির মানুষের অস্তিত্ব তখনও পর্যন্ত ছিল তবুও এই দুই জাতির রক্ত সংমিশ্রণ না হওয়ার কারণ বোধ হয় নিয়াণ্ডার্থাল মানুষের কুরূপতা ও বীভৎসতা। ক্রোমাগ্‌নন্‌ মানুষ ছিল শিকারী। এক ধরনের ছোট ঘোড়া ছিল এদের খাদ্য, এই ধরনের ঘোড়ার প্রচুর কঙ্কাল সোলুত্র (ফ্রান্স) ইত্যাদি স্থানে পাওয়া গেছে। স্পেনের বহু গুহার গায়ে এদের আঁকা চিত্রাবলী আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সমস্ত চিত্রাবলী গুহার ভিতর অন্ধকার জায়-গায় আছে। তা থেকে বোঝা যায় এরা বাতির ব্যবহারও জানত। এরা মৃতকে কবর দিত, মাটির খেলনা বানাতেও জানত, কিন্তু পাত্রের ব্যবহার

এরা জানত না। তা থেকে অনুমান করা যায়, তারা রান্না করে খাওয়া শেখেনি। যে সময় ক্রোমাগ্নন্ জাতি দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপে বাস করছে, সেই সময় ভারতে রায়পুর জেলার সিঙ্গনপুর এবং আশপাশের অঞ্চলেও মানুষের বসবাসের খবর পাওয়া গেছে। এরাও গুহার মধ্যে অনেক চিত্রাবলী এবং পাথরের হাতিয়ার ইত্যাদি রেখে গেছে। উপরোক্ত দু'ধরনের চিত্রে শুধু বুনো জানোয়ার আর শিকারের দৃশ্য পাওয়া যায়, তা থেকে অনুমান করা যায় যে তখন পর্যন্ত তাদের মধ্যে দেবতা ইত্যাদি সংস্কারের ধারণাগুলি তৈরী হয়নি। হয়ত তারা তখনো ভাষাকে রপ্ত করতে পারেনি। ভাষা ছাড়া কী ভাবে পুরাণ আর ইতিহাসকে একযুগ থেকে আর এক যুগে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব? ইতিহাস আর পুরাণই তো সৃষ্টি করে ধর্ম আর দেবতা।

বারো হাজার বছর আগে মানুষের মধ্যে এল এক নতুন প্রগতি। এখন মানুষ ভোঁতা পাথরের হাতিয়ারের পরিবর্তে ঘষে ঘষে ছুঁচলো করা পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করতে শিখল, এই জন্য এই যুগকে বলা হয় নব-প্রস্তর যুগ (Neolithic Age)। এই যুগে তাম্র-বর্ণের এবেরিয়ান জাতি (দ্রাবিড় জাতিকে এরই একটি শাখা বলা যেতে পারে) অনেক ব্যাপারেই এগিয়ে ছিল। এই জাতির মূল বাসস্থান ছিল ভূমধ্যসাগরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। চতুর্থ হিমযুগের আগে এই অঞ্চল ছিল অত্যন্ত শস্য-শ্যামল। ভূমধ্যবাসী এই জাতি সে-যুগেই নিজের ভাষাকে অনেকাংশে বিকাশিত করতে সক্ষম হয়েছিল। পরবর্তীকালে এদেরই বংশধরেরা উত্তর, দক্ষিণ আর পুবে ছড়িয়ে যায়। এরাই ইউরোপে গিয়ে ক্রোমাগ্নন্দের স্থান দখল করে নিল। সুমেরীয়, সিন্ধু-উপত্যকার অধিবাসী এবং প্রাচীন মিশরীয়রা সম্ভবত এদেরই উত্তরপুরুষ। ধারাল পাথরের অস্ত্রের ব্যবহার ছাড়াও এরা আবিষ্কার করেছিল তীর-ধনুকের। খৃষ্টপূর্ব ৪০০০ বছর আগে, প্রথম যখন ধাতুর ব্যবহারের কথা জানা যায়, তখন চকমকি পাথরের টুকরোকে ঘষে তপ্ত করে বাণের ডগায় লাগানো হতো। শিকারী কুকুরকে এরা পোষ মানায়, এবং পরে পোষে গরু, ভেড়া ইত্যাদি। পোষ মানানো জন্তুর আহারের জন্য ঘাস কেটে যে স্থানে জমা করত সেই জায়গা উর্বর হওয়ার ফলে লম্বা লম্বা ঘাস জন্মাতে এরা দেখল। এই ভাবেই গো-খাদ্যের জন্য শুরু হয় কৃষিকার্য। পরে আনাজ-পাতির উপযোগিতা জানার পর তারা ক্ষেত খামারীও শুরু করল। এই কৃষিকার্যের বাঁধনে বাঁধা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোর স্বাধীনতা হারাল, খুঁটিতে বাঁধা পশুর মতো একই জায়গায় বসবাস করতে লাগল। এর পর থেকে পশুপালন কৃষি জীবনের গৌণ অংশে পরিণত হলো। শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার তাগিদে তারা (কৃষক এবং পশুপালক) সমষ্টিগত ভাবে গ্রাম তৈরী করে বসবাস করতে লাগল। শত্রু সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সমষ্টিগত ভাবে বসবাস করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করল —পত্তন হলো নগরবসতি। পারস্পরিক

লড়াই আর যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন এবং অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে কেউ কেউ সমাজে আপন প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে রাজা পদে ভূষিত হলো। সুসায় (ইরাণ) প্রাপ্ত ধ্বংসাবশেষের প্রাচীনতম স্তরে এই ধরনের শিকারী কৃষক জীবনের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। অদ্যাবধি আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষগুলি পরীক্ষা করে প্রত্নতাত্ত্বিকরা অনুমান করেন পৃথিবীতে প্রথম গ্রামের পত্তন হয়েছিল মেসোপটেমিয়াতে এবং ঐ সময় ওখানকার মানুষ কৃষিকার্যের ব্যবহার শিখেছিল। ঐ সময়টা খৃষ্টপূর্ব পাঁচ হাজার বছরের কাছাকাছি হবে।

আজ থেকে অনেক অনেক হাজার বছর আগে যখন উত্তর ভারত আর হিমালয় সমুদ্রগর্ভের তলায় ছিল, তখন দক্ষিণ ভারত, আফ্রিকা এবং লঙ্কা পর্যন্ত বিস্তৃত মহাদ্বীপের একটি অংশ ছিল। তার প্রমাণ, শিলা এবং জীব-জন্তুর ফসিলের সাদৃশ্য। চতুর্থ হিমযুগের পর ভারতবর্ষে যে সব মনুষ্যজাতির খোঁজ পাওয়া যায় তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন দুটি জাতি—হাবসী (Nigroid) এবং প্রাক্-দ্রাবিড়ীয় (বেদা, মুণ্ডা ইত্যাদি)। আদি চন্নলুর-এ (মাদ্রাজ) প্রাপ্ত কঙ্কালের মস্তিষ্কের কপাল সংস্থিতি (Cephalic Indices) বেদা জাতিরই মতোন। চিত্রাবলীর সাদৃশ্য ইত্যাদি দেখে মনে হয়, সিঙ্গনপুর-এর (রায়পুর জেলা) চিত্রকরের সঙ্গে মুণ্ডা জাতির সম্বন্ধ ছিল। অনুমান করা হয় নব প্রস্তর যুগে (খৃষ্টপূর্ব পাঁচ হাজার বছর) এই দুই জাতিরই নিবাস ভারতবর্ষে ছিল। নব প্রস্তর যুগে ভূমধ্যদেশীয় মূরী জাতি*-র বসবাস স্পেন, মিশর, মেসোপোটেমিয়া, ইরাণ আর ভারতবর্ষ থেকে চীন পর্যন্ত ভূখণ্ডে বিস্তৃত ছিল বলে মনে হয়। ধারাল পাথরের হাতিয়ার ছাড়াও সূর্য-নাগ পূজা এবং স্বস্তিকা চিহ্নের প্রবর্তনও এই জাতিই করেছিল। পাঁচ হাজার বছর আগে এই জাতিই, সিন্ধু উপত্যকার মহেঞ্জোদোরো আর হরপ্পা নগরে বসবাস করত। বিজ্ঞানীদের মতানুসারে তারাই হচ্ছে সেই অনার্য জাতি, যারা খৃষ্টপূর্ব দু'হাজার বছর আগে ভারতবর্ষে হামলাকারী আর্যদের সঙ্গে লড়াই করে এবং আজকের দ্রাবিড় জাতি ও উত্তর ভারতের আদি জাতিগুলি তাদেরই উত্তরপুরুষ।

অনুমান করা হয়, ঐ ভূমধ্যদেশীয় মূরী জাতি বিশাল সংখ্যায় ভারতবর্ষে আসেনি, এই কারণেই তাদের ওপর শীল, মুণ্ডা এবং হাবসীদের রংয়ের ছাপ পড়ে। এই জন্যই অনার্য জাতিকে সুচতুর নাগরিক হিসেবে স্বীকার করলেও, আগন্তুক আর্য জাতি, এদের নাকচ্যাপ্টা ও কৃষ্ণকায় বলেছিল। এই আগন্তুক আর্যরা যে অধিকতর সভ্য ছিল তার প্রমাণ, ছোটনাগপুরের প্রাক্-দ্রাবিড়ীয় ওঁরাও জাতিকে নিজভাষার পরিবর্তে আর্যভাষা বলতে বাধ্য করেছিল

---

* এই মূরী জাতি সেমেটিক (প্রাচীন এ্যাসিরীয়ান, ফিনিসিয়ান ও আধুনিক ইহুদী এবং আরব), হেমেটিক (প্রাচীন মিশরীয়), ইথিয়োপিয়ান, প্রাচীন ক্রেত, ইওরোপের বাস্ক, সিন্ধু উপত্যকা নিবাসী এবং আধুনিক দ্রাবিড়।

এবং পরবর্তীকালে এইভাবেই প্রাক্-দ্রাবিডীয় ভীল এবং দ্রাবিড় জাতি আর্য-ভাষীতে রূপান্তরিত হয়। পাঁচ হাজার বছর আগে দ্রাবিড সভ্যতা যে কতখানি উন্নত ছিল তার নিদর্শন মহেঞ্জোদোরো আর হরপ্পায় পাওয়া যায়। যে সময়ে দক্ষিণ ইউরোপে বাস্কজাতির পূর্বপুরুষ, সিন্ধুতটে অনার্য, ক্রিট্-এর সভ্য অধিবাসী, মিশরে প্রাচীন মিশরীয়, মেসোপটেমিয়াতে সুমেরীয় জাতি বসবাস করছিল; এবং যখন শেষোক্ত ঐ চারটি জাতিই পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক উন্নত আর সুসভ্য বলে পরিগণিত —ঠিক ঐ সময়েই মধ্য এশিয়ার কৃষ্ণসাগরের উত্তর তীর পর্যন্ত জায়গা নিয়ে শিকারী এবং পশুপালনকারী আর একটি জাতি বসবাস করত, ঐতিহাসিকরা যাদের হিন্দি-ইউরোপীয়* নামে অভিহিত করেন। ইউরোপিয় আমেরিকান, আফ্রিকান, অস্ট্রেলিয়ান ইত্যাদি শ্বেতকায় জাতিগুলি; ইরাণী, আফগান এবং উত্তর ভারতের অধিবাসী সবাই এই হিন্দি-ইউরোপীয় জাতিরই উত্তরপুরুষ। এই জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত আছে। ধার্মিকদের বক্তব্য, প্রাচীন শ্বেতকায়, মূরী (সুমেরীয়, দ্রাবিড ইত্যাদি), পীতকায় (মঙ্গোল) এবং দাক্ষিণাত্য (বেদা, মুণ্ডা ইত্যাদি) সব জাতিগুলিই এক আদিম পিতা-মাতার সন্তান। এবং লাখ লাখ বছর ধরে ভিন্ন ভিন্ন জলবায়ু ও ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে বসবাসের ফলে এদের মধ্যে এই পার্থক্য ঘটে। এঁদের অভিমত মনুষ্য জাতির সৃষ্টি একটি বিশেষ স্থানেই হয়েছিল। কিন্তু আধুনিক গবেষকরা চার-পাঁচটি জাতির মূল পুরুষ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত পোষণ করেন।

পাঁচ হাজার বছর আগে এই জাতি কি অবস্থায় ছিল তার খানিকটা খোঁজ ভারতীয় আর্যদের প্রাচীন গ্রন্থ বেদ, ইরাণী আর্যদের প্রাচীন গ্রন্থ অবস্তা এবং বিভিন্ন হিন্দি-ইউরোপীয় লোকগাথাগুলি থেকে পাওয়া যায়। গরু, ভেড়া ছাড়া ঘোড়াকেও এরা লালন-পালন করত। প্রথমেই ঘোড়সওয়ার হিসেবে ব্যবহারের জন্য ঘোড়াকে এরা পালন শুরু করেনি, খাদ্য হিসেবে এবং দুধ ও দই-এর জন্যই ঘোড়াকে পালন করত। আজও দক্ষিণ-পূর্ব রুশ দেশে ঘোড়াকে খাদ্য হিসেবেই লালন-পালন করা হয়। সহস্র শতাব্দী যাবৎ যাযাবরের জীবন কাটিয়ে এদের একটি দল খৃষ্টপূর্ব ২৫০০ সালে পামীর-এর আশপাশের প্রদেশে আসে। অন্য দলের কিছু অংশ পামীর থেকে উত্তর পশ্চিমে আসে এবং আরও কিছু লোকজন রুশ থেকে পশ্চিমের দিকে এগিয়ে যায়। সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উর্বর জমির খোঁজে এরা আরো এগিয়ে যায়। অনুমান করা হয়, পামীরের আশপাশে বসবাসকারী আর্যদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি ইত্যাদি কারণে এরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়। এদের একটি দলের উত্তরপুরুষ হিন্দু আর্য এবং অপর দলটির উত্তরপুরুষ ইরাণী আর্য।

---

১ পূর্ব মঙ্গোল জাতির আদি নিবাসই এদের আদি নিবাস। যার উত্তর পুরুষ তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, চীন, কোরিয়া, জাপান-এর লোকজন।

খৃষ্টপূর্ব দু'হাজার বছরের কাছাকাছি সময়ে হিন্দু আর্যদেরই একটি শাখা মেসোপটেমিয়াতে পৌঁছায় এবং সেখানকার সুসভ্য সুমেরীয় জাতিকে পরাস্ত করে নিজ অধিকার স্থাপন করে। এরাই হচ্ছে মিত্তনী জাতি (Mittanni) —যারা সভ্যজগতে সর্বপ্রথম ঘোড়ার ব্যবহার প্রচলন করে। এদের দেব-দেবতাও হিন্দু আর্যদের মতোনই ছিল, তার প্রমাণ, মিত্তনী রাজা মত্তিউয়জা এবং সামীয় জাতির হিত্তাইত (Hittite) রাজা সুন্‌বিলুলি উমা-র অভিলেখগুলি, যা বোগজকাই (Boghazkui) নামক স্থানে পাওয়া গিয়েছে। প্রাপ্ত অভিলেখগুলিতে ইন্দ্র প্রভৃতি বৈদিক দেবতার নাম সম্মানের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে।

ভারতীয় আর্যরা যখন সুবাস্তুর (স্বাত, আফগানিস্থান) উপত্যকায় পৌঁছায়, তখনই সিন্ধু উপত্যকার সভ্যজাতির সঙ্গে তার সংঘর্ষের সূত্রপাত। এই দুই জাতির সংঘর্ষই বেদ ও পুরাণে দেবাসুর সংগ্রাম নামে প্রসিদ্ধ। যদিও অসুর ছিল অপেক্ষাকৃত চতুর এবং সভ্য কিন্তু হাজার হাজার বছরের নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত হওয়ার ফলে সৈনিক চরিত্র হারিয়ে ফেলেছিল এবং এই কারণেই শিক্ষিত সৈনিক থাকা সত্ত্বেও অশিক্ষিত কিন্তু লড়াকু আর্যদের দ্বারা পরাজিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, ইতিহাসে এই ধরনের অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতিগুলিকেই বিজয়ী হতে দেখা গিয়েছে।

বিজয়ী হয়ে আর্যরা পরাজিত দ্রাবিড়দের সংসর্গে এসে ধীরে ধীরে সভ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের পরিশ্রমী জীবনকে ত্যাগ করে অনার্যদের আরাম আর বিলাসের জীবন গ্রহণ করল। যুদ্ধের পর যখন দুই জাতিই সিন্ধু উপত্যকায় বসবাস করতে লাগল, তখন বিজেতা আর পরাজিতদের ঝগড়া এক নতুন রূপ নিল। কৃষ্ণযোনি* (কৃষ্ণকায় জাতি) চ্যাপ্টা নাক অথবা নির্নাস, খর্বকায় ইত্যাদি বলে অনার্যদের আর্যরা ঘৃণা করতে শুরু করল। আজকের আমেরিকার সাদা-কালোর মতোন তারাও বর্ণ (রঙ)-এর প্রশ্ন তুলে অনার্যদের সঙ্গে বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক ব্যাপারে কড়া নিষেধ চালু করল। তথাপি আর্যরা নিজেদের রক্ত শুদ্ধ রাখতে পারেনি। যখন আর্যদের গৃহে অনার্য দাসীদের প্রবেশের ক্ষেত্রে কোনো বাধা ছিল না এবং আর্য অনার্যদের বসতি একই জায়গায় ছিল তখন রক্তশুদ্ধির ব্যাপারটা কি ভাবেই বা সম্ভবপর ?

মোহেঞ্জোদোরো-র স্থাপত্যে কোথাও লোহার ব্যবহারের খোঁজ পাওয়া যায়নি। আর্যদের প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে লৌহ এবং অয়স্ শব্দ তামা আর লোহা দু'য়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ; এইজন্য কেবল লোহার বেলায় কৃষ্ণ-অয়স্ এবং তামার ক্ষেত্রে তাম্র-লৌহ শব্দ তৈরী করতে হয়েছে। খৃষ্টপূর্ব ১৪০০

---

* ঋগ্বেদ—(২/২০/৭)

সালের কাছাকছি সময়েই লোহার আবিষ্কার। তার আগেই সিন্ধু, মেসোপটেমিয়া, মিশর, ক্রেত ইত্যাদি জায়গায় তামা আর পেতলের হাতিয়ারের প্রচলন ছিল। আর্যদের আসার আগেই সিন্ধু-উপত্যকার লোকজনেরা একধরনের চিত্রলিপির ব্যবহার করত। তারপর ঐ সময়কার কোনো লিপি (সম্ভবত এখনকার সম্বলপুর জেলার গঙ্গাপুরে প্রাপ্ত শিলালিপি) থেকেই আর্যরা প্রস্তুত করে তাদের ব্রাহ্মীলিপি। ভারতে আসার আগেই ভয় আর বীরপূজার মাধ্যমে আর্যদের মধ্যে অনেক দেবদেবীর প্রচলন ছিল। পরে সিন্ধু-উপত্যকার সংস্পর্শে এসে আরো কিছু অনার্য দেব-দেবী ঐ পুরাতন দেবদেবীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

আগেই বলা হয়েছে যে, অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে হাবসী এবং দাক্ষিণাত্যে প্রাক্-দ্রাবিড়ীয় মুণ্ডা ইত্যাদি জাতি বসবাস করত। পরে সাত আট হাজার বছর আগে অল্পসংখ্যক কিছু সুসভ্য মূরী দ্রাবিড় জাতি এখানে আসে। আর্যদের আসার ফলে একটি চতুর্থ জাতির সমাগম হলো। এদের মধ্যে আর্যরা ছিল গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, উন্নত নাসিকা, অভিনীল নেত্র এবং তাম্রবর্ণ কেশ। বাকী তিনটি জাতির ক্ষেত্রে অনেক কিছুই আপোষে মিলেমিশে গিয়েছিল। তারা ছিল কৃষ্ণকায়, চ্যাপ্টা নাক এবং খর্বদেহ।

মানবতত্ত্বের পণ্ডিতেরা ভিন্ন ভিন্ন জাতির শরীরাকৃতি পরীক্ষা করে তার মধ্যে অনেক ভেদলক্ষণ বা অভিব্যঞ্জন পেয়েছেন। যে অভিব্যঞ্জনগুলি অপেক্ষাকৃত ভাবে স্থির, তাকে ব্যবস্থিত অভিব্যঞ্জন বলা হয় এবং যা অপেক্ষাকৃত ভাবে অস্থির তাকে অব্যবস্থিত অভিব্যঞ্জন বলা হয়। প্রথমত উচ্চতা, দ্বিতীয়ত কপাল-সংস্থিতি, তৃতীয়ত নাসিকা-সংস্থিতি —এই তিনটিকে * ব্যবস্থিত অভিব্যঞ্জন বলা হয়। এর মধ্যে আবার প্রথমটির চেয়ে দ্বিতীয় এবং দ্বিতীয়টির চেয়ে তৃতীয়টি অধিক প্রামাণ্য হিসেবে স্বীকৃত। অব্যবস্থিত অভিব্যঞ্জন হচ্ছে —শরীর, চোখ, চুলের রং এবং চোখ আর চুলের আকার প্রকার ইত্যাদি। আর্য-অনার্য'র অব্যবস্থিত অভিব্যঞ্জন সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তাদের ব্যবস্থিত অভিব্যঞ্জন

* পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চির চেয়ে লম্বা মানুষকে দীর্ঘকায় বলা হয়; পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি থেকে পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি —মধ্যমাকার, পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি থেকে পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি —অনুমধ্যমাকার, পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চির কম —খর্বাকার এবং কপাল-সংস্থিতির ক্ষেত্রে, ৮০ থেকে অধিক —আয়তশীর্ষ, ৮০ থেকে ৭৫ —মধ্যশীর্ষ, ৭৫ থেকে কম লম্বশীর্ষ। নাসিকা সংস্থিতির ক্ষেত্রে, ৭০ তুঙ্গনাস, ৭০—৮৫ মধ্যনাস (দ্রাবিড়), ৮৫ এর চেয়ে অধিক আয়তনাস (মঙ্গোল)।

সম্পর্কে কিছু বিশদভাবে আলোচনা করা যাক। এখানে কপাল-সংস্থিতির অর্থ কপালের উচ্চতাকে ১০০ ধরে নিয়ে চওড়া (প্রস্থ)-কে পরিমাপ হিসেবে নিতে হবে ; নাসিকা-সংস্থিতির ক্ষেত্রেও নাকের উচ্চতাকে ১০০ হিসেবে ধরে নিয়ে নাকের নীচের দিকে চওড়া (প্রস্থ)-কে অনুপাত হিসেবে ধরতে হবে (অর্থাৎ উচ্চতা মাপবার সময় নাকের নীচের দিকে দেবে যাওয়া অংশ থেকে আরম্ভ করে নাসাগ্র পর্যন্ত মাপতে হবে)। সঠিক ধারণায় পৌঁছবার জন্য প্রয়োজনীয়, বাছাই না করে এক জাতির রক্ত সম্বন্ধীয় একশো-দেড়শো মানুষকে নির্ণয়ের জন্য নিতে হবে।

পরিমাপ করে দেখা গিয়েছে ভূ-মণ্ডলে শ্বেতাঙ্গদের উচ্চতা প্রায় ১৬০০ মিলিমিটার (৫ ফুট ৪.৪ ইঞ্চি)-এর নীচে হয় না. কপাল-সংস্থিতি ৭১৩ এবং নাসিকা-সংস্থিতি ৭৫-এর উপর হয় না। অন্যান্যদের উচ্চতা ১৫৪০ মিলিমিটার (৫ ফুট ১·৬ ইঞ্চি) পর্যন্ত এবং কপাল আর নাকের সংস্থিতি ৭৫ আর ৭০-এর কম হয় না। শ্বেতাঙ্গদের কপাল-সংস্থিতির ক্ষেত্রে আয়তশির দেখা যায়, যার তুলনা করা যেতে পারে ভারতবর্ষের গুজরাতী ও মারাঠীদের সঙ্গে এবং ইউরোপের জার্মান ইত্যাদি কিছু জাতির আয়তশিরের সঙ্গে। তাই বাকী দুটি অভিব্যঞ্জনের কথাও খেয়াল করতে হবে। নিম্নে বিভিন্ন জায়গায় শ্বেতাঙ্গ-দের ব্যবস্থিত অভিব্যঞ্জনের একটি গঠন প্রকৃতি সূচিত হলো :

	উচ্চতা (মিলিমিটার)*	কপাল	নাসিকা
সিন্ধু-আফগান	১৬৪২ থেকে ১৬৮৩	৮০ থেকে ৮২·৮	৬৭·৮ থেকে ৭৪·৩
সিন্ধু-ইরাণী	১৬৪২ ,, ১৩৮৩	৮০ ,, ৮২·৮	৮৭·৮ ,, ৭৩·৩
ইরাণী-ভূমধ্যদেশীয়	১৬৩৩ ,, ১৭৪৫	৭৬·২ ,, ৭৬·৮	৫৬·৬ ,, ৭৩·৩
আর্মেনিয়ান-পামীর	১৬৬০ ,, ১৭০৮	৮৪·১ ,, ৮৬·৫	৬২·৬ ,, ৭২
জর্জিয়ান	১৬৪৫ ,, ১৬৫৮	৮২·৫ ,, ৮৪·২	৫৭·৬ ,, ৬৪·৫

উত্তর ভারতের আর্যদের একটি গঠন প্রকৃতি

	উচ্চতা	কপাল	নাসিকা
রাজপুত	১৭৪৮	৭২·৪	৭১·৬
পাঞ্জাবী	১৬৮৪	৭৪·২	৭০·২
শিখ	১৭০৬	৭২·৭	৬৮·৬

এর তুলনায় ভারতবর্ষের কিছু অনার্য জাতির গঠন প্রকৃতি

	উচ্চতা	কপাল	নাসিকা
বেদা (সিলোন)	১৫৭১	৭৫·১	৮৪·১৮
মুণ্ডা	১৫৮৬	৭৪·৫	৮৬·৬
তামিল	১৬৩৬	৭৫·৬৬	৭৬·৬৭
দ্রাবিড়-হিন্দু	১৬২৩	৭৫·২	৮২·৩৭

* .২৫ মিলিমিটার=১ ইঞ্চি

হিমালয়, বাংলা আর আসামের ভারতীয়দের মধ্যে প্রচুর মঙ্গোল রক্ত মিশ্রিত হয়েছে। এখানে কিছু মঙ্গোল জাতির অভিব্যঞ্জন দেখানো হলো

	উচ্চতা	কপাল	নাসিকা
বুয়র্ত (সাইবেরিয়া)	১৬৩১	৮৪'৫	৭২'৫২
লাদাকী (কাশ্মীর)	১৬৩৪	৭৬'৭৬	৭৫'৫৪
লেপ্চা (দার্জিলিং)	১৫৭০	৭৬'৬	৬৭'২
জাপানী	১৫৮৫	৭৬'৫	৭২'৬৪

প্রারম্ভিক আর্য ছাড়াও সিকন্দরের সময় হাজার হাজার য়ুনানী, সীথিয়ন (মগ-শক), জাঠ, গুর্জর, আভীর ইত্যাদি আর্য জাতিগুলি ভারতবর্ষে এসে উত্তর ভারতীয় আর্যদের সঙ্গে মিলে যায়। দ্রাবিড় ও অন্যান্য অনার্য জতিগুলি বিজেতা আর্যদের আজ্ঞাবাহীতে পরিণত হয় এবং কিছু কিছু অনার্য পিছু হটে মধ্যপ্রদেশের পাহাড়ী অঞ্চলে এবং দক্ষিণের দিকে চলে যায়। এই সমস্ত জাতির সমাগমে রক্ত-সংমিশ্রণ হওয়াটা ছিল অনিবার্য। পাঞ্জাব আর রাজপুতানা থেকে যতই আমরা পূর্বদিকে এগবো, ততই দেখব আর্য রক্তের মাত্রাটা কমেছে ও দ্রাবিড় রক্তের মাত্রা বেড়েছে এবং বিহারের সীমারেখা অতিক্রম করে বাংলা আর অসামে আবার উত্তর থেকে আগত আর্য-মঙ্গোল রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে। এই রক্ত সংমিশ্রণ সব জাতির ক্ষেত্রেই এক ধরনের হয়নি। উদাহরণ সরূপ আগেকার যুক্তপ্রদেশ এবং বিহারের আহির জাতিকে ধরা যেতে পারে। অন্যান্য জাতির তুলনায় এরা অধিক ফর্সা আর তামাটে চুলের অধিকারী। ব্যবস্থিত অভিব্যঞ্জনগুলি (উচ্চতা, কপাল এবং নাক) লক্ষ্য করলেও আপনি বুঝতে পারবেন যে, এই প্রদেশের মধ্যে, এই এক জাতির মধ্যেই অধিক আর্যরক্ত রয়েছে।

বৈজ্ঞানিকদের মতানুসারে, মানুষের উৎপত্তি এবং বিকাশ মৎস্য, মণ্ডুক, সরীসৃপ, পক্ষী এবং স্তনধারী জন্তু ইত্যাদি যেরূপ ক্রমান্বয়ে স্বীকৃত তা বিশেষত দুটি ব্যাপারের উপরেই নির্ভরশীল। জীবকল্পের প্রস্তরগুলিকে আমরা ঐরকম ক্রমানুসারেই পাই। ঐ পাষাণ যেন সমকালীন ঘটনাবলীর ইতিহাস, যার এক একটি স্তর ঐ গ্রন্থের এক-একটি পাতা। শুধু মাঝে মাঝে ঘটিত হাজার হাজার প্রচণ্ড ভূ-কম্পনে ঐ গ্রন্থের পাতাগুলি ছিঁড়ে এদিক ওদিক উড়ে গিয়েছে। আমেরিকার পশ্চিমের রাজ্যগুলির মতোন কিছু জায়গায় এবং পৃথিবীর অনেক স্থানেই কোটি কোটি বছরের প্রাচীন শিলাস্তর আজও অক্ষুণ্ণ অবস্থায় পাওয়া যায়। ওখানকার উট, ঘোড়া ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন কালের পাথুরে হাড়গুলি (ফসিল) এই বিকাশ সিদ্ধান্তকে সমৃদ্ধ করেছে। পাথুরে হাড় (ফসিল) ছাড়া দ্বিতীয় প্রমাণ স্বয়ং প্রাণীগুলির গর্ভের প্রারম্ভিক অবস্থা। ব্যাঙ ইত্যাদি আদিম প্রাণী মৎস্য থেকেই বিকাশিত হয়েছে, ব্যাঙ-রূপে যাওয়ার আগে তাকে মৎস্যরূপ ধারণ করতে হয়েছে, ঐ সময় শুধুমাত্র তার আকৃতি মাছের মতোনই ছিল না, উপরন্তু সে জলের ভেতর মাছের মতোনই কানকো দিয়ে নিঃশ্বাস

প্রশ্বাসের কাজ চালাত। বর্তমান অবস্থায় পৌঁছানোর জন্য মনুষ্যজাতিকেও যে সমস্ত বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে, এখনো প্রত্যেক মানুষকে গর্ভাবস্থায় এবং শৈশবে সেই সমস্ত বাধা অতিক্রম করতে হয়। প্রারম্ভিক অবস্থায় গর্ভে সে মাছের মতোনই আকৃতি গ্রহণ করে এবং অন্যান্য অবস্থা থেকে ৪-৫ মাস অবধি সে লেজওয়ালা বানরের মতোন আকৃতিতে থাকে। প্রসবের সময় বনমানুষের মতোনই তার হাত-পাগুলি লম্বা লম্বা হয়। শৈশবে বিকাশিত বানরের মতোনই চতুষ্পদ আর দ্বিপদ —মানুষ দু'ভাবেই হাঁটে এবং সম্ভবত তার চিন্তার মানও তখন সেইরকমই থাকে। তিন চার বছর বয়সে সে বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়ায়, পঞ্চাশ হাজার বছর আগের চল্লিশ বছর বয়সী পূর্বপুরুষেরই পুনরাবৃত্তি করে। আমরা যেমন অনেক ব্যাপারেই আমাদের পূর্বপুরুষদের থেকে এগিয়ে গেছি, এইভাবেই উন্নতির সোপান বেয়ে আমাদের উত্তরপুরুষও আজ থেকে ১০ হাজার বছর পরে, ১০ বছর বয়সেই যা চিন্তা করবে, তা বর্তমানের ৪০ বছর বয়সী পণ্ডিতরাও চিন্তা করতে অক্ষম। এইভাবেই আমাদের উত্তরপুরুষরা প্রাক্তন অভিজ্ঞতার সুবিধার অধিকারী হবে।

মানুষের ক্রমবিকাশের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সালপঞ্জী

পৃথিবীর উৎপত্তি	:	২ অর্বুদ বর্ষ পূর্ব
প্রাণীর উৎপত্তি	:	৩ ক্রোড় বর্ষ পূর্ব
মেরুদণ্ডহীন সরীসৃপের উৎপত্তি	:	২ " " "
শিবালিকের জন্তু	·	৩০ লক্ষ " "
শিবালিকের নর-বানর	:	৪-৫ " " "
জাভার নর-বানর	:	৪-৩ " " "
হিমালয়ের তরাই-এর উৎপত্তি	·	৪-৩ " " "
প্রথম হিমযুগ	.	৩ " " "
দ্বিতীয় হিমযুগ	:	২ " " "
হাইডেল্‌বর্গীয় মানুষ	:	১½-১ লক্ষ বর্ষ পূর্ব
তৃতীয় হিমযুগ	:	১ " " "
চতুর্থ হিমযুগ	:	৫০ হাজার " "
নিয়াণ্ডার্থাল, করপা, কর্ণূল্‌-এর মানুষ	:	৫০ " " "
চতুর্থ হিমযুগের শেষ	:	৪০-২৫ " " "
ক্রোমাগ্‌নন্ (দক্ষিণ ইউরোপীয়) মানুষ জাতি	:	৩০-২৫ " " "
সিঙ্গনপুর-এর প্রাক্ দ্রাবিড়ীয় মানুষ	:	৩০-২৫ " " "
প্রকৃত মানুষের ইতিহাসের সূচনা	:	৩০-২৫ " " "
সূর্য-নাগ পূজা এবং স্বস্তিকাচিহ্নের প্রবর্তনকারী মানুষের ইউরোপ, ভারত, চীন, আমেরিকা ইত্যাদি স্থানে বিস্তৃতি	:	১২-৮ " খৃষ্টপূর্ব

তীর-ধনুকের আবিষ্কার	:	১০ হাজার খৃষ্টপূর্ব
নব-প্রস্তর যুগ	:	৫ " "
পশু-পালন, কৃষি এবং মাটির পাত্রের প্রচলনকাল	:	৫ " "
গ্রাম বসতি স্থাপন এবং সভ্যতার প্রারম্ভকাল	:	৫ " "
তামার আবিষ্কার	:	৪ " "
মোহেঞ্জোদোরো সভ্যতা	:	৩ " "
পিতলের আবিষ্কার	:	২ " "
হিরাতে আর্যদের প্রবেশ	:	২৫০০ ,,
সুবাস্তুতে আর্যদের প্রবেশ	:	২০০০ ,,
মিত্তন্নি আর্যদের মেসোপটেমিয়ায় প্রবেশ	:	২০০০ ,,
সিন্ধু-উপত্যকায় আর্যদের অধিকার স্থাপন	:	১৮০০ "
ইউনান্-এ আর্য অধিকার	:	১৫০০ ,,
লোহার আবিষ্কার	:	১৪০০ ,,
গৌতম বুদ্ধ (যুক্তিবাদী)	:	৫৬৩-৪৭৩ "
ইরাণীদের সিন্ধু-প্রদেশ অধিকার	:	৫৩০ ,,
ইউনানীদের ভারত বিজয়	:	৩২৩ ,,
কাগজের আবিষ্কার (চীন)	:	২০০ ,,
শক্-মগ্-দের ভারত আগমন	:	২০০-১০০ ,,
মঙ্গোলিয়ান জাতি দ্বারা ইউরোপে প্রথম বারুদের ব্যবহার	:	১৩০০ খৃষ্টাব্দ
ইউরোপে ছাপাখানা	:	১৪৩৮ ,,
দূরবীন আবিষ্কার	:	১৬১২ ,,
বাষ্পীয়-ইঞ্জিন (ফোর্ট)	:	১৭৮৫ ,,
প্রথম ষ্টীমার	:	১৮০২ ,,
প্রথম রেল-ইঞ্জিন	:	১৮০৪ ,,
বিবর্তনবাদের আচার্য ডারুউইন	:	১৮০৯-৮২ ,,
সাম্যবাদের আচার্য কার্লমার্কস	:	১৮১০-৮৩ ,,
প্রথম রেল-লাইন (ষ্টাক্টন্ থেকে ডার্লিংটন পর্যন্ত)	:	১৮২৫ খৃষ্টাব্দ
দেশলাই	:	১৮৩৪ ,,
গ্রামোফোন	:	১৮৭৮ ,,
রেডিয়াম	:	১৮৯৭ ,,
মনুষ্যবাহক বায়ুযান	:	১৯০৯ ,,
প্রথম কমিউনিস্ট সমাজ-ব্যবস্থা	:	১৯১৭ ,,

প্রথম অধ্যায়

পুঁজিবাদের উৎপত্তি

পুঁজিবাদ হচ্ছে ধন অর্জনের এক বিশেষ কৌশল। একজন মানুষ, শুধুমাত্র উৎপাদনের উপকরণ সামগ্রীর মালিকানার জোরে, নিজস্ব কোনো গুণাবলী এবং শ্রম-বিনিয়োগ ব্যতীতই, বহুসংখ্যক মানুষের শ্রমের অধিকাংশ বিনামূল্যে গ্রহণ করে, ঐ উদ্বৃত্ত অংশকে নিজস্ব লাভ এবং পুঁজির বিকাশের জন্য ব্যবহার করে।

এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, মানুষের শিকারী অবস্থায় পুঁজিবাদের অস্তিত্ব ছিল না। যখন মানুষ শিকারী অবস্থা থেকে উন্নত হয়ে কৃষিব্যবস্থায় প্রবেশ করল, ধীরে ধীরে সে হলো ব্যক্তিগত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মালিক। এরপর, সম্পত্তির মালিক, ভূ-স্বামী, ধনী, সামন্ত এবং রাজা অর্থাৎ শোষকশ্রেণীর আবির্ভাব হলো। অপরদিকে শোষকশ্রেণীর স্বার্থেই সৃষ্টি হলো শ্রমিকশ্রেণী। এইভাবেই শ্রেণীবিভক্ত সমাজে আপন আপন স্বার্থে শুরু হলো শ্রেণীসংঘর্ষ। যদিও এই সমস্ত সামন্ত রাজারা মানুষের শ্রমের একটি অংশ বিনা মজুরীতে গ্রহণ করত, কিন্তু এটা সে করতে সক্ষম হতো পুঁজির জোরে নয়, নিজের রাজশক্তির জোরেই এবং এই উপায়ে বিনা মজুরীতে প্রাপ্ত শ্রমকেও সে ভবিষ্যতে শ্রমের কেনা-বেচার জন্য অর্থাৎ পুঁজি সৃষ্টির জন্য রাখত না। যদিও সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায়, ক্রয় বিক্রয়ের উপর নির্ভরশীল ব্যবসায়ী (বেনিয়া সম্প্রদায়) এবং সুদ-ব্যবসায়ী মহাজনরা ছিল, যারা 'শ্রমের কিছু অংশ বিনা মজুরীতে গ্রহণ ও নিজলাভের জন্য' ব্যবহার করত; তবুও বেনিয়া ব্যবসায়ী ও মহাজন কখনোই পুঁজিবাদী হতে পারেনি। কারণ তারা বেঁচে থাকবার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনের উপকরণ সামগ্রী নিজের কব্জায় আনতে পারেনি। তখন তাঁতের মালিক ছিল তাঁতী, কুমোরের নিজের চাকা আর কামার নিজের হাপরের মালিক

ছিল। যদিও কখনো কখনো এই সমস্ত উৎপাদনের উপকরণ সামগ্রী দখলে এনে উৎপাদন করানো হতো, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা' বিনা মজুরীতে (বেগারী) করানো হতো এবং এটা রাজা অথবা সামন্ত আপন প্রভুত্বের জোরেই করতে পারত। তখন এই সমস্ত উৎপাদনের উপকরণ সামগ্রীরও খুব একটা বেশী দাম ছিল না, ফলে কারিগর নিজেই উপকরণ সামগ্রী উৎপন্ন করে স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে নিজের কাজ করতে পারত। এই কারণেই এই ধরনের ছোট ছোট কারখানা স্থাপনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধনীর আগ্রহ হতো না।

বাষ্পীয় যন্ত্রের আবিষ্কারের আমল থেকেই পুঁজিবাদের শুরু ধরা যায়। যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে উৎপাদনের গতি হস্তচালিত উৎপাদনের তুলনায় অনেক অধিক পরিমাণে বেড়ে গেলো। যেখানে একজন তাঁতী হস্তচালিত তাঁতে সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে সাত-আট গজ কাপড় বুনতে পারত, সেখানে একজন অপটু সাধারণ মানুষও বাষ্পচালিত তাঁত যন্ত্রে পঞ্চাশ-ষাট গজ কাপড় অনায়াসে বুনতে লাগল। যন্ত্রে উৎপাদিত কাপড়ের দাম অপেক্ষাকৃত কম হওয়াটা অনিবার্য ভাবেই সম্ভব, কারণ বস্তুর মূল্য নির্ভর করে উৎপাদনে নিযুক্ত ব্যক্তির শ্রমের উপর। উৎপাদিত বস্তুর দাম কম হওয়ায় তাড়াতাড়ি বিক্রয়ের ব্যবস্থা সম্ভব হলো। আর তাড়াতাড়ি ও অধিক পরিমাণ উৎপাদিত বস্তু বিক্রয় করার সুযোগ হওয়ার ফলে, উৎপাদকের পক্ষে প্রতিটি বস্তুর উপর লাভের অংশ কম রাখা সত্ত্বেও, সব মিলিয়ে মোট উৎপাদিত বস্তুর উপর লাভাংশ অনেক পরিমাণ বৃদ্ধি পেল। লাভের পরিমাণ অনেক অধিক হওয়া সত্ত্বেও এই ধরনের যন্ত্র কেনবার সুযোগ সাধারণ কারিগরদের ছিল না কারণ যন্ত্রের দাম তাঁদের ক্রয়ক্ষমতার নাগালের অনেক উর্ধ্বে। এইভাবেই বাষ্পীয় শক্তি-চালিত যন্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই পুঁজিবাদের উদ্ভব।

পুঁজিবাদের প্রসার

যদিও দু-আড়াই হাজার বছর আগেই মিশরবাসীরা বাষ্প সঞ্চালিত শক্তি সম্বন্ধীয় সাধারণ জ্ঞান আহরণ করেছিল, কিন্তু এই শক্তিকে শিল্পোদ্যোগে প্রথম প্রয়োগ করল ইউরোপ। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বাষ্পীয়-ইঞ্জিনের আবিষ্কার করলেন জেমস ওয়াট। শুরুতেই এর উপযোগিতা না বুঝতে পারলেও অল্প সময়ের মধ্যেই মানুষ বাষ্পীয়-ইঞ্জিনের ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হলো। ঘোড়া, বলদের শক্তির সাহায্যে যেমন করে আটার চাকি, হাল, গাড়ি চালানো সম্ভব ঠিক সেইভাবেই জল আর আগুনের সাহায্যে উৎপন্ন বাষ্পশক্তিতে যে এগুলি চালানো যায়, মানুষ এটাও বুঝতে পারল। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি স্থাপনের পর থেকেই ইংল্যাণ্ডের বাজারে, ভারতবর্ষে তৈরী উচ্চ মানের সুন্দর কাপড়ের খুব ভালো রকমের চাহিদা ছিল। এই ব্যবসাতে কোম্পানি মোটা মুনাফাও করত। অচিরেই ইংল্যাণ্ডের ব্যবসায়ী মগজে একটা চিন্তার উদয় হলো —যদি এই

চরকা আর তাঁতে বাষ্পচালিত শক্তি জুড়ে দেওয়া যায়, তাহলে অনেক কম খরচে কম সময়ে কাপড় উৎপাদন সম্ভব। শুরু হলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা। অবশেষে সাফল্য। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে বাষ্পীয়শক্তি চালিত তাঁত ইংল্যাণ্ডে প্রথম স্থাপিত হলো। অনেক দোষ থাকা সত্ত্বেও, প্রথম থেকেই ঐ মেশিনে একজন লোকই বেশী কাপড় উৎপাদন করতে লাগল। শ্রমিকদের এটা বুঝতে মোটেই অসুবিধা হলো না যে, এই আবিষ্কারের মূল উদ্দেশ্য হলো—মনুষ্যশক্তি ব্যবহারের সংক্ষেপ করণ অর্থাৎ চারজন মানুষের জায়গায় একজন মানুষের কাজ। যন্ত্রের গুণে লাভের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেলো, এই দেখে আরো অনেকেই এই ধরনের শিল্প-কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হয়ে উঠল, ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই ব্যাপক সংখ্যক শ্রমিক বেকার হতে লাগল এবং শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। একটি কারখানায় শ্রমিকরা হরতাল করে, উত্তেজিত শ্রমিক কারখানার যন্ত্রপাতি, মেশিন ভাঙচুর করে সবকিছু নষ্ট করে দেয়।

যে সময় ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকশ্রেণী বাষ্পীয়শক্তি চালিত মিল-এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আর অসন্তোষ প্রকাশ করছিল, ঐ সময় ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ফল্টন্ বাষ্পচালিত জাহাজ আবিষ্কার করলেন, জর্জ ষ্টিফেন্‌শন্ আবিষ্কার করলেন রেল-ইঞ্জিন। ষ্টিফেন্‌শন্ শুধুমাত্র রেল-ইঞ্জিন আবিষ্কার করেই ক্ষান্ত হলেন না, ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ষ্টাফ্‌টন্ আর ডার্লিংটন্-এর মধ্যে রেল লাইন পেতে ছোট ছোট কামরার সঙ্গে ইঞ্জিন জুতে ঘণ্টায় বারো মাইল বেগে চালানোরও ব্যবস্থা করলেন। পুঁজিপতিরা দেখল —অনেক কম সময়ে, কম খরচে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় উৎপাদিত মাল পাঠানোর পক্ষে এটা খুব সুবিধা-জনক ব্যবস্থা। কাঠের পরিবর্তে লোহার জাহাজ। ফলে আগুন লাগার ভয়ও রইল না। এইভাবে পরিবহন-ব্যবস্থায় এক নতুন যুগের উদয় হলো। উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানোর সুযোগ হওয়ার ফলে শিল্প-সঙ্কটের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হলো। এবং সাময়িকভাবে শ্রমিক অসন্তোষ আর বিক্ষোভ শান্ত হলো। এই সময় ইংল্যাণ্ডই ছিল পৃথিবীর সর্ববৃহৎ শিল্পপ্রধান দেশ, পৃথিবীর বাজারে তার সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো দেশ ছিল না। মেশিনে প্রস্তুত এই ধরনের সস্তা মালের চাহিদা প্রচুর থাকায় ক্রমশ নতুন নতুন কারখানা স্থাপিত হতে লাগল। আর এই সমস্ত কারখানায় কাজ করার জন্য নিয়োগ করা হলো প্রচুর সংখ্যক শ্রমিককে।

কীভাবে ইংল্যাণ্ডে পুঁজিবাদের শুরু আর বাষ্পচালিত রেল ও জাহাজের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তার বৃদ্ধি হলো, তা আমরা আগেই আলোচনা করলাম। এতদিন পর্যন্ত সমাজে জমিদার, বণিক সম্প্রদায়, মহাজন, সরকারী আমলা এরাই ধনী বলে গণ্য হতো। কিন্তু শিল্প কারখানায় মূলধন বিনিয়োগে লভ্যাংশ তুলনামূলকভাবে অনেক পরিমাণ অধিক হওয়ায় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অধিকাংশই শিল্প কারখানা স্থাপনের চেষ্টা করতে লাগল। কিছুদিন দেরী

হলেও ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলিও ধীরে ধীরে ইংল্যাণ্ডের পথ অনুসরণ করল। ঐ সময় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যে ফ্রান্সই ছিল ইংল্যাণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী। এর পর জার্মানী, হল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া ইত্যাদি ইউরোপের সব দেশই ধনার্জনের এই সহজ-সরল এবং দ্রুততর পদ্ধতিকে বেছে নিলো।

ভারতবর্ষে পুঁজিবাদের প্রবেশ

পরাধীন ভারতবর্ষ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত নিজের নেশায় মত্ত ছিল। বিদেশ থেকে আমদানীকৃত পণ্যসামগ্রী আর ইউরোপের লোক-জনদের কাছ থেকে যন্ত্রযুগের খবরাখবর সে নিশ্চয়ই পেত কিন্তু তখনো পর্যন্ত এখানকার ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মগজ কল-কারখানার দিকে যায়নি। এর কারণ হয়ত তখনো যন্ত্রসম্বন্ধীয় জ্ঞান পাওয়ার সুযোগ এখানে ছিল না। ব্যবসায়ী বুদ্ধি, প্রগতিশীল বিচার আর ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে এসে পারসী-রাই ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম কল-কারখানার কাজকে বুঝতে সক্ষম হলো। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে, কাবাসজী মনাভাই ডাবর সর্বপ্রথম কাপড়ের মিল স্থাপন করলেন। এর পর আমেদাবাদের কিছু হিন্দু ব্যবসায়ীও কাপড়ের মিল স্থাপন করেন। উনবিংশ শতকের শেষভাগে ভারতবর্ষে মিলগুলির স্থাপনা বা পুঁজিবাদের প্রসার শুরু হলেও, ঐ শতকের শেষ পর্যন্ত এর গতি ছিল খুবই মন্থর। এর কারণ : [১] সু-সংগঠিত এবং একশতকের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ বিদেশী কারখানায় উৎপাদিত মালের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অসুবিধা, [২] যন্ত্রাদির সঙ্গে স্বল্প পরিচয় ; [৩] ব্যাঙ্ক, বীমা ইত্যাদি আজকালকার ব্যবসায়িক সুবিধা গ্রহণের অসুবিধা ; [৪] বিদেশী ব্যবসায়ী, যাদের ভারতবর্ষে প্রচণ্ড প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল, নিজদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে কাউকেই তারা পছন্দ করত না।

যদিও ১৫ বছরের শিক্ষা এবং বিজ্ঞানের প্রচার, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত, কল-কারখানা স্থাপনে অনেকটা সাহায্য করেছিল ; তবুও নানা ধরনের বাধার সম্মুখীন হওয়ার ফলে এর গতি খুব একটা দ্রুত হয়নি। বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের সময়, যখন ইউরোপের দেশগুলি যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং ঐ সমস্ত দেশ থেকে ভারতবর্ষে মাল আমদানী বন্ধ হয়ে যায়, তখনই ভারত-বর্ষে কল-কারখানার প্রসার হতে থাকে। ঐ সময় সরকার, যুদ্ধের দৃষ্টি নিয়েই নতুন নতুন শিল্প-উদ্যোগে উৎসাহ দিয়েছিল। যখন একবার গতির চাকা ঘুরে যায়, তাকে থামানো মুশকিল। এই কারণেই ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের পর থেকেই ভারতীয় ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন ধরনের মাল উৎপাদনের জন্য বৃহৎ পুঁজি

যদিও ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম কাপড়ের মিল একজন ইউরোপীয় কর্তৃক, পশ্চিমবাংলার বাউরিয়া-তে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়, কিন্তু ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম ডাবরই কাপড়ের মিল স্থাপন করেন।

বিনিয়োগ করে হাজার হাজার কারখানা খুলতে লাগল। আজ পুঁজিবাদ ভারতবর্ষে তার শিশুকাল পেরিয়ে যৌবনের পথে পা বাড়িয়েছে। এবং এর সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষেও সেই সমস্ত সমস্যাবলী সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, যার অস্তিত্ব পশ্চিমের শিল্পপ্রধান দেশগুলিতে আগে থেকেই ছিল।

কমিউনিজমের জন্ম

সমাজে কোনো কাজই কারণ ব্যতীত সম্পন্ন হয় না। সেই সময়েই পুঁজিবাদ বা ক্যাপিটালিজম-এর জন্ম, যখন এর জন্মের কারণগুলি সূচিত হয়েছিল, অর্থাৎ : [১] স্বল্প পরিশ্রম কিংবা বিনা পরিশ্রমেই ধনী হওয়ার জন্য মানুষের চরিত্রগত স্বাভাবিক ইচ্ছা ; [২] যন্ত্রাদি আবিষ্কারের সুযোগে স্বল্পপরিশ্রমে অধিক পরিমাণ মাল উৎপাদন করে কম দামে মাল বিক্রয় করার সুবিধা গ্রহণ ; [৩] যন্ত্রে উৎপাদিত মালেব সঙ্গে বাজারের প্রতিযোগিতায় স্বতন্ত্র কারিগরদের এ'টে ওটা মুশকিল হওয়ায়, ধীরে ধীরে প্রতিযোগিতাব প্রশ্ন বিলীন হয়ে যাওয়া ; [৪] বিশেষ কোনো দক্ষতা না নিয়েই যন্ত্রের সাহাযে৷ একজন সাধারণ মানুষের পক্ষেও সুন্দর বস্তু উৎপাদন করা সম্ভবপর হওয়া। এই ভাবেই কমিউনিজম অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক সমাজবাদেব জন্ম তখনই সম্ভব, যখন এর জন্মের কারণগুলি সূচিত হয়।

এটা বুঝতে মোটেই অসুবিধা হয় না, যে সমস্ত বস্তু উৎপাদনে মানুষের মেহনতের পরিমাণ যতখানি জড়িত থাকে, বস্তুর মূল্যের পরিমাণও সেই অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। অনেক খোঁড়াখুঁড়ির পর হীরে কচিৎ কদাচিৎই পাওয়া যায়। তারপরেও সেই হীরার পেছনে আরো নানা ধরনের শ্রম জড়িত আছে। অর্থাৎ একটি হীরার পেছনে ঐ সমস্ত শ্রম বিজড়িত থাকার ফলেই তা' মূল্যবান। যদি অর্ধেক দিনের পরিশ্রমে কোহিনূর পাওয়া যেত, তাহলে তার মূল্য এই পরিমাণ হতো না। এই কারণেই হাতে তৈরী জিনিসের দাম বেশী হয়, কারণ এর উৎপাদনে মানুষের শ্রমের পরিমাণ অনেকগুণ অধিক। এবং মানুষের শ্রমেব পরিমাণ কম থাকে বলেই যন্ত্রে উৎপাদিত জিনিসের মূল্য সেই অনুপাতে কম হওয়া সম্ভব। বস্তু উৎপাদনে মনুষ্যশ্রমের স্বল্পীকরণের উদ্দেশ্যেই যন্ত্রের সাহাযে৷ উৎপাদনের সৃষ্টি। এবং এটাই যন্ত্রের প্রধান কাজ। ফলাফল এই যে, একই পরিমাণ বস্তু উৎপাদনের ক্ষেত্রে মনুষ্যশ্রমের ততখানি প্রয়োজন হয় না, যতখানি হাতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়। উদাহরণ স্বরূপ, হস্ত-চালিত তাঁতকে নেওয়া যেতে পারে, এতে একজন মানুষ সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে অতিকষ্টে দশ বারো গজ কাপড় বুনতে পারে ; কিন্তু ঐ একই সময়ে অপটু সাধারণ মানুষ অনায়াসে ষাট-সত্তর গজ কাপড় মিল-এ বুনতে পারে। আটঘণ্টায় একজন মানুষের ষাট-সত্তর গজ কাপড় বোনার অর্থ, যে কাজটা ছয়জন

মানুষ করত, তা' একজনের দ্বারা সম্পন্ন করে পাঁচজন মানুষকে কাজ থেকে বঞ্চিত করা।

যন্ত্র যে মানুষের কাজকে ছিনিয়ে নেয়, এই সার সত্যটি বুঝতে ঐ সময়ের অশিক্ষিত শ্রমিকেরও বেশীদিন লাগেনি। যন্ত্রযুগের প্রবর্তনের কয়েক বছর পরেই উনিশ শতকের প্রথমদিকে ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকশ্রেণীকে যন্ত্রের প্রতি আক্রোশবশত মিল-এর যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ভাঙচুর করতে দেখা গেছে, কিন্তু ঐ সময়ে শিল্প-সমস্যা ততখানি ভয়াবহ রূপ নেয়নি। এর কারণ হচ্ছে, তখনো পর্যন্ত যন্ত্রের প্রবর্তন কয়েকটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। উৎপাদিত মাল বিক্রির জন্য দুনিয়ার সব বাজারই খোলা ছিল, এবং এইভাবেই বলা যায় যে, চাহিদা অনুযায়ী বস্তু উৎপাদন করতে কারখানাগুলো যথেষ্ট ছিল না। এই জন্য যন্ত্রযুগের প্রারম্ভিককালে, নিশ্চিত লাভ পক্ষান্তরে ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকায় ক্রমশ নতুন নতুন কারখানা স্থাপিত হতে লাগল এবং প্রতিটি নতুন কারখানা স্থাপিত হওয়ার অর্থ আরো অধিক সংখ্যক শ্রমিকের কর্মপ্রাপ্তি। এই কারণে, উনিশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছর, পুঁজিপতিদের প্রতি শ্রমিকশ্রেণীর মনোভাব ততখানি কঠোর হয়নি। কিন্তু একটা দেশ, যান্ত্রিক উৎপাদনের সাহায্যে লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এগিয়ে যাচ্ছে তাই দেখে অন্যান্য দেশগুলিই বা আর কতদিন চুপচাপ বসে থাকতে পারে? এবং অন্যান্য দেশগুলিতে কল-কারখানা স্থাপনের দরুন বাজারে অধিক পরিমাণে মাল আসতে শুরু করল, এর ফলে পূর্বে স্থাপিত কারখানাগুলি যে সংখ্যায় শ্রমিকদের বেকার করেছিল, সেই অনুপাতে নতুন কারখানা স্থাপিত না হওয়ার ফলে বেকার শ্রমিকদের আর কাজ দেওয়া সম্ভব হলো না। দ্বিতীয়ত যন্ত্রের ক্রমাগত উন্নতির ফলে, দশ-জন শ্রমিকের জায়গায় একজন শ্রমিক দিয়েই উৎপাদন সম্ভবপর হতে লাগল। এইভাবেই যন্ত্রের উন্নতি আর নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বেকার শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটাল। তবে এটা নিশ্চয়ই ঠিক যে, বস্তুর মূল্য অনেক কম হওয়ার ফলে ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি করল। তবুও আনুপাতিক হারে, অর্থাৎ বেকারীর সংখ্যা অনুযায়ী ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়নি।

তখন শ্রমিক লক্ষ্য করল, একদিকে কল-কারখানাগুলিতে আর কাজ পাওয়া যাচ্ছে না—অপরদিকে স্বতন্ত্র কারিগরীর রাস্তাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং ক্ষেত-খামারের কাজও তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। পেটের ক্ষিদে, একজন সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকেও অনেক কিছু চিন্তা করতে বাধ্য করে। শ্রমিক দেখল, একদিকে তার এই অসহায় অবস্থা, অপরদিকে কতলোকে রাতারাতি ক্রোড়পতি হয়েছে। এটা বুঝতে তাদের অসুবিধে হলো না যে, তাদের শ্রমের কল্যাণেই ঐ ধনসম্পত্তির বনিয়াদ।

পুঁজিবাদ একদিকে শ্রমিকের এই পরিমাণ ক্ষতি সাধন করলেও, অন্যদিকে আর একটি বিরাট লাভও ঘটিয়ে দিলে।—তা' হচ্ছে, এক বৃহৎ সংখ্যক

শ্রমিককে কল-কারখানার আশেপাশে একজায়গায় জড় করল। যেখানে ক্ষেতের মজুর এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার ফলে চুপচাপ অত্যাচার আর অসুবিধেগুলো সহ্য করতে বাধ্য হচ্ছিল, সেখানে কল-কারখানার শ্রমিক সংগঠিত আন্দোলন করার মতোন শক্তি সঞ্চয় করল। যদিও প্রথম থেকেই রোগ এবং রোগের নিরাময়কারী ওষুধপত্তর সম্বন্ধে তাদের ধ্যান-ধারণাগুলি খুবই অস্পষ্ট ছিল, তবুও তখন থেকেই অস্থির হয়ে তারা হাত ছোঁড়াছুঁড়ি করে প্রতিবাদ করা শুরু করল।

সমাজে এমন কিছু মানুষ জন্মান, যাঁদের সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থাকা সত্ত্বেও অন্যের দুঃখ দুর্দশা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেন এবং এই কারণে, অর্থাৎ অন্যের দুঃখকষ্ট লাঘবে স্বীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদি অনায়াসে বিসর্জন দিতে পারেন। যে সময়ে পুঁজিবাদের অস্তিত্ব ছিল না এবং পুঁজিবাদ যে, সমাজের পক্ষে কী ভয়ঙ্কর ক্ষতি সাধন করে, তাও বোঝা সম্ভব ছিল না, তখনো আর্থিক সমতার প্রচারক দার্শনিকদের জন্ম হয়েছিল। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে, গৌতম বুদ্ধ তাঁর ভিক্ষু সম্প্রদায়ের মধ্যে সমতার নিয়ম চালু করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের প্রয়োজনানুগ বণ্টনের নিয়মই শুধু তৈরী করেননি, উপরন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তির সীমারেখা হ্রাস করে সঙ্ঘ অথবা সমষ্টির সম্পত্তির সীমারেখার বৃদ্ধিও তিনি ঘটিয়েছিলেন। ঠিক অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগ, পাঁচশতকে ইরাণের মজদকও করেছিলেন। নয়শতকের মধ্যভাগে তিব্বতের সম্রাট মুনি-চন্‌-পো তাঁর রাজত্বকালে তিনবার ধনসম্পত্তির সমবণ্টন করিয়েছিলেন। এই ধরনের উদাহরণ আরো অনেক পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কমিউনিজম যা অনিবার্যভাবে পুঁজিবাদের একমাত্র ওষুধ, তা' কোনো ব্যক্তিবিশেষের দয়া বা হৃদয় ঔদার্যের পরিণাম নয়। এই ধরনের উদার হৃদয়ের ব্যক্তি তো অন্যভাবেও চিন্তা করতে পারেন বা পারতেন, যেমন এই বিংশ শতাব্দীতেও কেউ কেউ চিন্তা করেন যে, সব ঝামেলার মূলেই যন্ত্রপাতি, সুতরাং কেনই বা ঐ সমস্ত ঝামেলাকে পৃথিবী থেকে চিরতরে দূর করে দেওয়া হবে না।

কমিউনিজমকে পুঁজিবাদ নামক সামাজিক রোগ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হিসেবে গণ্য করা হয়, তার অর্থ হচ্ছে, বিজ্ঞানের ফসলকে ঘরে তুলে, সমাজের অগ্রগতির পথকে খোলা রেখে পুঁজিবাদজনিত বিপদ থেকে সমাজকে পরিত্রাণ করা। বিজলি বাতির আলো যেমন বাইরে থেকে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেওয়া যায় না, তেমনই বিজ্ঞানের প্রয়োগে, ফলশ্রুতি হিসাবে উদ্ভূত সমস্যাবলীকেও অন্ধ তপস্যা দিয়ে দূর করা যায় না। বৈজ্ঞানিক সমাজবাদীরা জানেন এবং বোঝেন যে, বিজ্ঞান এবং তার আবিষ্কার স্বয়ং-সম্পূর্ণভাবে কখনোই ক্ষতিকারক নয়। যখন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে ব্যক্তি-গত মুনাফার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা শুরু হয়েছে, তখন থেকেই বেকারীর গভীর সমস্যার জন্ম। এই জন্যই, বৈজ্ঞানিক সমাজবাদীদের বক্তব্য, বিজ্ঞান

এবং তার আবিষ্কারকে ব্যক্তির মুনাফার উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করে, সমগ্র সমাজের হিতের জন্য ব্যবহার করা উচিত। যদি বিজ্ঞান ছয়জন ব্যক্তির কাজকে একজন ব্যক্তিকে দিয়ে করানোর মতোন অবস্থার সৃষ্টি করে, তাহলে বাকী পাঁচজন লোককে ছাঁটাই করে অনাহারে না মেরে, কাজের সময়কে ঐ ছয়জনের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া উচিত। ছয়জন মানুষ, বারো ঘণ্টায় যে পরিমাণ কাপড় বুনতে পারে, যদি সেই পরিমাণ কাপড় যন্ত্রের সাহায্যে বারোঘণ্টায় একজন মানুষ দিয়েই বোনানো সম্ভব হয় তাহলে ঐ বারোঘণ্টা কাজের সময়কে দু'ঘণ্টা করে ছয়জনের মধ্যে ভাগ করেদেওয়া যেতে পারে। কমিউনিজম কর্তৃক উপস্থাপিত, বেকারী দূরীকরণের এটা খুবই উত্তম ব্যবস্থা। সমাজবাদ এবং পুঁজিবাদ, দু'জনের রাস্তা সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন এবং বিপরীত। এই দুই ব্যবস্থাই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে ব্যবহারের পক্ষপাতী। কিন্তু পুঁজিবাদ যেখানে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ব্যক্তিগত মুনাফার দরুন গোটা সমাজকেই নরকে পাঠাতে প্রস্তুত, সেখানে সমাজবাদের উদ্দেশ্য, কিছু ব্যক্তির স্বার্থসিদ্ধি নয়, সমগ্র মানবসমাজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করাটাই তার লক্ষ্য। যতদিন শুধুমাত্র লাভের উদ্দেশ্যেই উৎপাদন বজায় থাকবে, ততদিন বেকার-সমস্যা দূরীকরণের উপায় হচ্ছে, কাজের সময়কে ভাগ করে সবাইকেই কাজে নেওয়া, এই ব্যবস্থা গ্রহণে সমস্যাটা বৃদ্ধি পায় না। দু-চাকার সাইকেল ততক্ষণই খাড়া যতক্ষণ তা' চলছে। তেমনি পুঁজিবাদ ততদিনই চলতে পারে, যতদিন পুঁজিপতি তার ব্যক্তিগত মুনাফা বজায় রাখতে পারে। মুনাফা তার কাছে জীবন-মরণের প্রশ্ন।

আজকাল সারা দুনিয়াতেই মানুষকে সমস্যা জর্জরিত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। শুধু, কল-কারখানার মালিক আর ব্যবসায়ীরাই বাজারের মন্দাবস্থার অভিযোগ করেন না, গ্রামের কৃষক আর ক্ষেত-খামারের মজুররাও সমস্যাগুলিকে বেশ ভালোভাবেই অনুভব করছে। শহরের কারখানা-গুলির শ্রমিকদের দুরবস্থার কথা, নতুন করে বলার কিছুই নেই। ইউরোপের দেশগুলি এবং আমেরিকার মতোন শিল্প-সমৃদ্ধ দেশেও বেকারের সংখ্যা এককোটিতে পোঁছে গেছে, বেঁচে থাকবার জন্য আশু প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করাটা, এদের পক্ষে ক্রমশ কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে, বহু মানুষ আত্মহত্যার রাস্তা বেছে নিয়েছে। সমাজের বৃহদাংশকে এইরকম দুঃখ কষ্টের মধ্যে রেখে, মুষ্টিমেয় মানুষের সুখ-সাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থাকে, কোনো দৃষ্টিভঙ্গীতেই সমর্থন করা যায় না।

পুঁজিবাদের পরিণাম যে শুধুমাত্র বেকারী তা' মোটেই নয়, তার বিরুদ্ধে আরও মারাত্মক অভিযোগ আছে, তা' হচ্ছে সামাজিক শান্তিভঙ্গের অভিযোগ —মহাযুদ্ধ, যা পুঁজিবাদেরই অন্তিম পরিণতি। প্রত্যেকটি পুঁজিবাদী দেশই চায় তার দেশের কল-কারখানাগুলি যেন নির্বিঘ্নে চলে, কিন্তু যতক্ষণ উৎপাদিত বস্তুর বিক্রয়ের সম্ভাবনা থাকে, ততক্ষণই কল-কারখানাগুলি চলতে পারে।

এটা আমরা আগেই আলোচনা করেছি, উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত, পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই অনেক বাজার অবজ্ঞাত অবস্থায় পড়েছিল। কিন্তু তার পরের একশতকে অবস্থাটা সম্পূর্ণ পাল্টে গেলো। এখন মাল বিক্রয়ের জন্য কোনো বাজারই আর অজ্ঞাত অবস্থায় পড়ে নেই। ব্যবসা বাণিজ্যর দেশগুলিকে অর্থাৎ বাজারকে, পুঁজিবাদী দেশগুলি নিজেদের মধ্যে আপোষে ভাগ করে নিয়েছে। একসময় ইংল্যাণ্ডই পৃথিবীর অধিকাংশ বাজারের মালিক ছিল, এরপর জার্মানী তার দেশের কল-কারখানা-গুলিকে সমৃদ্ধ করে দুনিয়াতে তার উৎপাদিত মালের বাজার বাড়াতে চাইল। তার পরিণাম হলো, বিগত ভয়াবহ প্রথম মহাযুদ্ধ। এবং যুদ্ধকালীন এই অবস্থায়, ফাঁকা ময়দান পেয়ে আমেরিকা আর জাপান, বাজার দখলের চেষ্টায় উঠে পড়ে লাগল। ঐ দুই দেশের কল-কারখানাগুলি বিপুলভাবে মাল উৎপাদন করতে থাকল। লড়াই থেমে যাওয়ার পর, আজ এতদিন বাদেই বা কী অবস্থা দাঁড়িয়েছে? নিজের বাজার বজায় রাখতে, ইংল্যাণ্ড তার সাম্রাজ্যে আমেরিকার মাল প্রবেশে বাধা দিলো। কীভাবে ইংল্যাণ্ডের এই প্রভুত্বের অবসান ঘটানো যায় এই চিন্তায় আমেরিকা সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় রইল। এই একই কথা জাপান সম্পর্কে বলা যেতে পারে। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে, গোনাগুণতি রুটি আর খাওয়ার জন্য হাজারটা হাঁ।

পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহ এই অশান্তিকে খুব ভালোভাবেই অনুভব করছে। সেই কারণেই নিরস্ত্রীকরণের এত চেষ্টা। তবুও, যতদিন নিজের দেশের মাল বিক্রির জন্য বাজার নিয়ে কামড়া-কামড়ি চলবে, ততদিন সমাজের মাথায় যুদ্ধের তরবারিটা ঝুলবেই। বাজার আর কাঁচামালের জন্য নতুন দেশগুলির উপর আধিপত্য বিস্তারের লোভে একুশবছর বাদে জার্মানী আবার নিজের ভাগ্যপরীক্ষায় নামল এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাত করল। বর্তমান যুগে, পুঁজিবাদই সবকটা বড় বড় যুদ্ধের কারণ। মালের বাজার কমে যাওয়ার আরো একটা বড় কারণ হচ্ছে, আগেকার শিল্পোদ্যোগে পিছিয়ে থাকা দেশগুলিও স্ব-স্ব দেশে, শিল্প-কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি লাভ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতবর্ষের কথা বলা যেতে পারে—যুদ্ধ-পূর্বকালীন অবস্থায়, ভারতবর্ষে নিজ প্রয়োজনের এক পঞ্চমাংশ কাপড় কষ্টেসৃষ্টে উৎপাদিত হতো, সেই জায়গায় এখন নিজ প্রয়োজনের সবটাই উৎপাদন করতে পারছে। ফাউন্টেন পেন, পেনসিল, ব্লেড, ব্যাটারী ইত্যাদি বহু জিনিসই যুদ্ধের আগে ভারতবর্ষে তৈরী হতো না, কিন্তু এখন এসবই এখানে তৈরী হচ্ছে। আর এই ধরনের বস্তু নিজদেশে উৎপাদিত হওয়ার অর্থই হলো, অন্যান্য দেশের বাজার নষ্ট হওয়া। আগেকার এইরকম শিল্পোদ্যোগরহিত দেশগুলিতেও এখন কল-কারখানার সংখ্যা বেড়েই চলেছে। যে রুশদেশ শিল্পকারখানার ব্যাপারে অনেক পিছিয়ে ছিল, সে আজ দ্বিতীয়

আমেরিকা হতে চলেছে। চীন, তুর্কি আর ইরাণ-এর কথা ছেড়ে দেওয়া যাক, আফগানিস্থানের মতোন দেশেও কারখানা স্থাপিত হচ্ছে।

বাজার নিয়ে কামড়া-কামড়ির ফলে যুদ্ধের সম্ভাবনার কথা আগেই বলা হয়েছে। যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদনের ফলে বেকারীর সৃষ্টি এবং নতুন নতুন আবিষ্কার ও যন্ত্রের উন্নয়নে বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি, পাশাপাশি বাজারের ঘাটতিতে ষোলকলা পূর্ণ হলো। সমাজ জীবনে বেকার সমস্যাকে ভয়ঙ্কর রূপদানের ক্ষেত্রে এইগুলিই যথেষ্ট কারণ; কিন্তু এর সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রশ্নটিও আছে। প্রতি দশ বছর অন্তর জন-গণনা থেকেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাপ পাওয়া যায়; একমাত্র ভারতবর্ষেই ১৯২১ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত সময়ে অর্থাৎ এই বিশবছরেই ৬ কোটির ওপর লোকসংখ্যা বেড়েছে। পুঁজিবাদ কিছু মুষ্টিমেয় লোকজনকেই ধনী বানিয়ে, তাদের সুখ-বিলাসের ক্ষেত্রে নতুন নতুন সামগ্রীর যোগান দিতে পারে। আরো দামী মোটর, বিশাল বিশাল অট্টালিকা আর তাকে সাজানোর জন্য হাজার রকমের আসবাব সামগ্রী ও নিত্য নতুন বিলাস-সামগ্রী অবশ্যই পুঁজিবাদ হাজির করতে পারে; কিন্তু যুদ্ধ এবং দেশজোড়া বেকার সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা, পুঁজিবাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। এই সমস্যাবলী তো মানবজাতির কাছে জীবন-মরণের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুদ্ধের সম্ভাবনার কথাই ধরা যাক, এমন এমন হাতিয়ার, বিষাক্ত গ্যাস, পরমাণু ইত্যাদি মানুষের হাতে বিজ্ঞান পৌঁছে দিয়েছে যে, যদি অবিলম্বেই শান্তির রাস্তা তৈরী না হয়, তাহলে মানবজাতির ধ্বংস অনিবার্য। পকেটে কালিভরা ফাউন্টেন পেনের পরিবর্তে ঐ মাপেরই শিশিতে পরমাণু ভরে, এরোপ্লেনে চেপে একজন মানুষ নিউইয়র্ক বা লণ্ডনের মতোন শহরের উপর পরমাণু ফেলে দিয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অতবড় শহরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে পারে। এটা কোনো কাল্পনিক কথা নয়, যুদ্ধ সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, আজকাল এই ধরনেরই হয়। পুঁজিবাদের পরিণতি সম্বন্ধে আরো অনেক কথাই বলা যেতে পারে। তবে সবচেয়ে যা ভয়াবহ তা' হচ্ছে, সমাজের বৃহৎ অংশকে ঘোর দারিদ্রের মধ্যে ফেলে রেখে, অল্প কয়েকজনের সুখ-সমৃদ্ধির ইন্দ্রলোক পুঁজিবাদই জোগায়।

আমাদের সমাজ জীবনে এমন অনেক ছেলে-মেয়েকেই দেখা যায়, যার মধ্যে প্রতিভা আছে, সুযোগ পেলে যে একজন গণিতজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী হতে পারত, কিন্তু পয়সাওয়ালা লোকের ঘরে না জন্মানোর ফলে, সে তার রুচি আর যোগ্যতা অনুযায়ী উপযুক্ত শিক্ষা লাভে বঞ্চিত। অপরদিকে অকালকুষ্মাণ্ড, ধনীর দুলালের জন্য কত হাজার হাজার টাকাই না নষ্ট করা হচ্ছে। পুঁজিবাদের জারজ-সন্তান আইনজীবীর মতো ব্যবসাও এই সমাজে বহাল তবিয়তে চলে, অথচ এর অস্তিত্ব না থাকলে মানবসমাজের সুখ সমৃদ্ধির কোনো ঘাটতিই হতো না। অনেক অনেক কারণের মধ্যে উপরিউক্ত কারণগুলির ফলশ্রুতি হিসেবেই কমিউনিজম-এর জন্ম।

তৃতীয় অধ্যায়

পেছনে ফেরা কী আদৌ সম্ভব ?

প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে পুঁজিবাদ ও কমিউনিজম-এর উৎপত্তি সংক্রান্ত বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে। পুঁজিবাদ সৃষ্ট সমস্যাবলী দূরীকরণের একমাত্র ওষুধ যে কমিউনিজম এ কথাও বলা হয়েছে। পুঁজিবাদীর ব্যক্তিগত মুনাফার উদ্দেশ্যে যন্ত্রের অধিকতর উন্নয়ন ও ব্যবহার এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে সমাজে যে ভয়াবহ বেকারীর জন্ম —সে কথাও আগে আলোচিত। যদি ভারতবর্ষে পুঁজিবাদের প্রসার না ঘটত, তাহলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রশ্ন উপস্থিত হতো। ভারতবর্ষের ভয়াবহ দারিদ্র দূরীকরণ একটা গভীর সমস্যা। আমাদের দেশে, এই সমস্যার মুখোমুখি দু'ধরনের মানুষকে দেখা যায় ; ধন-সম্পদের জারজ-সন্তান, যারা আরাম আর ভোগবিলাসের মধ্যেই জীবনটা কাটিয়ে দেয় আর সেই সঙ্গে কমিউনিজম যে কী ভয়াবহ, দিন-রাত এই দুঃস্বপ্নই দেখে থাকে। এই শ্রেণীর মধ্যে যদিও কিছু কিছু উদারচেতা মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়, আশপাশের ঘোর দরিদ্রতা সাময়িকভাবে তাঁদের মনকে চিন্তা করতে বাধ্য করে, তবে কমিউনিজমকে তাঁরা একটি অসম্ভব আর অবাঞ্ছনীয় ব্যবস্থা বলে পাশ কাটিয়ে যান। আর যিনি, 'আমি সুখী তো জগৎ সুখী' বলে থাকেন, বোধ-বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও তাঁর কাছ থেকে সমাধানের কিছু আশা করাটাই অর্থহীন। তবে আরও একশ্রেণীর মানুষ আছেন, যাঁরা পরিস্থিতির ভয়াবহতাকে উপলব্ধি করতে পারেন এবং তাঁরও যে এই বিষয়ে কিছু করণীয় আছে, এই ব্যাপারে ওয়াকিবহাল। এদের মধ্যেও আবার দু'ধরনের মানুষ আছেন : কমিউনিস্ট, যে দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে আলোচ্য পুস্তকটি রচিত, আর এক ধরনের মানুষের বক্তব্য, "কেনই বা আমরা এই শয়তান যন্ত্রবাদকে দূরে সরিয়ে সেই পুরাতন যুগে ফিরে যাবো না ? যেখানে যন্ত্রের নামগন্ধ ছিল না, যে সময় প্রতিটি

গ্রামই এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ ছিল. কামার, তাঁতী, কৃষক সবাই স্বাধীন ভাবে সবুজ ক্ষেত আর শীতল উদ্যানে ঘেরা প্রকৃতির কোলে সুখে শান্তিতে জীবন কাটাত. তাঁদের নিকটবর্তী তপোবনে ঋষি আর মহাত্মাদের প্রশান্ত আশ্রম, যার আধ্যাত্মিক আনন্দ আর প্রেম শুধুমাত্র মানুষকে নয়, পশু পক্ষীকেও প্রভাবিত করত। যে যন্ত্র আমাদের সেই সোনার দুনিয়া ও সত্যযুগকে ছিনিয়ে নিয়েছে তাকে বর্জন করে চলো আবার আমরা সেখানেই ফিরে যাই।"

যদিও সেই 'স্বর্ণযুগ'-এর কৃতিত্ব, পিরামিড, চীনের প্রাচীর ইত্যাদির ইতিহাস যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা উপরিউক্ত ভাবুকতাপূর্ণ মনোহর চিত্রের তিন চতুর্থাংশই যে মিথ্যে, এ কথাই বলবেন। আর দাসযুগের সময় মানুষের মূল্য তো এই 'ঘোর কলিযুগে'র থেকেও কম ছিল। তবুও এই চিত্রকেই আমরা সাময়িকভাবে সত্য বলেই ধরে নিলাম। সন্দেহ নেই, যদি আমরা দু-তিন হাজার বছর আগে ফিরে যাই, তাহলে প্রথমেই দুটি সমস্যা অর্থাৎ যন্ত্রের প্রবর্তন এবং তার উন্নয়নজনিত সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পাবো। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ফেলে আসা সেই যুগে প্রত্যাবর্তনের রাস্তাটি কী আমাদের জন্য সত্যই খোলা? যন্ত্রের আবিষ্কার তো একজন মানুষের, এক-আধ ঘণ্টার বুদ্ধির ফসল নয়, এর সূচনা তো অনেক আগেই, চতুষ্পদ প্রাণী থেকে দ্বি-পদ হওয়া, সামনের দুটো পা অর্থাৎ হাত দিয়ে পাথর ছোঁড়া—এসবই তো মানবজাতির ক্রমবিকাশের ইতিহাস। এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নেই। সারাংশ এই যে, যখন থেকে মানুষ সভ্য হতে শিখল সেই মুহূর্ত থেকেই সে যান্ত্রিক প্রাণী, প্রভেদ শুধু মাত্র পরিমাণগত। যন্ত্রের বিকাশধারার প্রথম অধ্যায়কে তো আমাদের মিত্র মাথাতেই আনতে চান না। তাঁরা শুধু বোঝেন যে, হাত দিয়ে পরিচালিত কুমোরের চাকা, চরকা, কপিকল, রথ ইত্যাদি তো আর যন্ত্র নয়; বাষ্প, তেল অথবা বিজলি দ্বারা পরিচালিত যা কিছু তাই হচ্ছে যন্ত্র।

ঠিক আছে, আমাদের এই সমস্যাবহুল পরিস্থিতির মুখ্য কারণ, তেল বা বিজলি দ্বারা পরিচালিত যন্ত্রাদি সমাজ থেকে দূর করে দেওয়া হোক, এটাই তো আপনাদের চাহিদা? আপনারা কী বোঝেন না যে, এই যন্ত্র এবং তার মূল সিদ্ধান্তগুলির পেছনে আছে সেই সমস্ত বৈজ্ঞানিকের সারা জীবনের অক্লান্ত পরিশ্রম, যাঁদের মস্তিষ্ক শুধুমাত্র প্রকৃতির অজানা রহস্য উদঘাটনে ব্যস্ত এবং যখন নতুন কোনো আবিষ্কার হয়, আবিষ্কর্তার কাছে তার চেয়ে আনন্দের আর কী বা থাকতে পারে। এবং এই ধরনের অনুসন্ধিৎসাকে যদি আপনি অনুচিত বলে মনে করেন তাহলে নয় আপনার হুকুমে, আগুনের সেই ভয়ঙ্কর ঝলসানিতে জ্বলতে আর জাঁতাকলে পেষাই-এর সেই দুশো-বছর আগেকার যুগে ফিরতেও রাজী। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত এই সমস্ত কিছু কিছু ঝামেলাবাজ আর শয়তানের কারখানা (!) মগজের অস্তিত্ব থেকে

যাবে, ততদিন পর্যন্ত যন্ত্রের উদ্ভাবন রুখবেন কী ভাবে? সুতরাং আপনি যা মনে করেছিলেন অর্থাৎ পেছনে ফেরার পথ কিন্তু ততটা সুগম আর শান্তিপূর্ণ নয়, আশাকরি এটা এখন বুঝতে পারছেন। সমাজের স্বার্থেই এই পেছনে ফেরা, অতএব মগজওয়ালা মাথাগুলোকে কেটে ফেলা হোক—এই রায়ও নিশ্চয়ই আমাদের শান্তিভক্ত আর সত্যপথযাত্রীর মনঃপূত হবে না।

অবশ্য এইরকম বলতে পারেন, বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকদের প্রাণে হত্যার দরকার নেই। আমরা তাঁদের প্রাণে বাঁচতে দেবো কিন্তু তাঁদের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারাদি যাতে মানুষে ব্যবহার না করে, এইরকম একটা অবস্থার সৃষ্টি করব; তারপর তাঁদের আবিষ্কার ইত্যাদি কোনো কাজেই লাগছে না দেখে, তাঁরা নিজে থেকেই মগজ খাটানোর ব্যাপারটা ছেড়ে দেবেন। এই উপায়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমাজের এই মারাত্মক শত্রুর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। এবং এই পদ্ধতিতেও যদি কিছু কিছু পাগল বৈজ্ঞানিক, পরীক্ষা নিরীক্ষা বন্ধ না করেন, তাহলে ল্যাবরেটরী ইত্যাদি আনুষঙ্গিক অসুবিধায় তাঁর কাজকর্ম অসম্ভব না হলেও কঠিন তো হবেই। আর এই সমস্ত অসুবিধার মধ্য দিয়েও হঠাৎ যদি কিছু আবিষ্কৃত হয়ে পড়ে, তাহলে তা' শুধুমাত্র ম্যাজিক বা ভেল্‌কিবাজীর মতোন মনোরঞ্জনের সামগ্রীতে পরিণত হবে।

উপরিউক্ত চিন্তাধারার মানুষকে তো প্রথমেই এটা চিন্তা করতে হবে যে, এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ব্যবহারের ক্ষমতা কাদের দখলে আছে? নতুন নতুন আবিষ্কারের খোঁজে যাঁরা মুখিয়ে আছেন, তাঁরা হচ্ছেন ক্রোড়পতি সেই সমস্ত ব্যবসায়ী, যাদের বিমান আকাশপথে দৌড়ে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে; যাঁদের জাহাজ ৩০/৪০ হাজার টন মাল বোঝাই করে সমুদ্রপথে অনায়াসে একদেশ থেকে আর একদেশে পৌঁছচ্ছে, যাঁদের রেল-মোটরগাড়ী এবং অন্যান্য হাজারটা বস্তু আজকের জীবনযাত্রার পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যিক সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। আর এই সবকিছুর থেকে বড় ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, আজকের দুনিয়াটা শাসন এঁরাই করছেন, এই কারণেই শক্তি দিয়ে এঁদের কাবু করার নাগাল আপনি পাচ্ছেন না। আপনার তর্ক-বিতর্ক সাময়িকভাবে এঁদের মনোরঞ্জনের সামগ্রীতে পরিণত হবে। অবশ্যই এটা নির্ভর করছে—যদি আপনি গান্ধীজির ন্যায় মোহময় শব্দের সাহায্যে আপনার বক্তব্য পেশ করতে পারেন। আবার এমনটাও হতে পারে, শুধুমাত্র তর্কের খাতিরেই এঁদের মধ্যে কেউ কেউ আপনার তত্ত্বকে সসম্মানে মেনে নিলেন। ইংল্যাণ্ড-আমেরিকার গোলা-বারুদ তৈরীর কারখানাগুলি, যেখানে নিরস্ত্রীকরণ সভায় গলা ফাটিয়ে লেকচার দেনেওয়ালা রাজনীতিবিদ এবং তাঁদের আত্মীয় স্বজনের বিশাল পরিমাণ পুঁজি খাটছে—যখন মানুষ মারার অস্ত্র-শস্ত্র শুধুমাত্র দেশরক্ষার জন্য ব্যবহৃত না হয়ে, জাপান আর চীনের যুদ্ধাগ্নিতে আহুতি দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং রাষ্ট্রসভার পুনঃ পুনঃ বারণ

সত্ত্বেও যে অস্ত্র বিক্রয় বন্ধ করা সম্ভব হয় না, তখন কী আপনি আশা করেন —আপনার শুষ্ক উপদেশ বাণীতে মুগ্ধ হয়ে এই সমস্ত ব্যবসায়ীর দল, ছুঁচ থেকে শুরু করে জাহাজ তৈরীর কারখানাগুলি রাতারাতি বন্ধ করে দেবে ? আর তাঁদের ধন-সম্পত্তিতে লালিত-পালিত সেই সমস্ত দার্শনিক আর পুরোহিত সম্প্রদায় চুপচাপ থাকবে ?

যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার তো সব দেশের সরকারই করে থাকে। রেল, বিমান, জাহাজ গোলা-বারুদ, টেলিগ্রাফ, বেতার এসবই তো আজ তার কাছে জীবন-মরণের প্রশ্ন। যে পর্যন্ত এই সমস্ত যন্ত্রাদির ব্যবহার প্রতিবেশী দেশগুলি করবে, সে পর্যন্ত কোন দেশের কোন সরকার এগুলির ব্যবহার ছেড়ে থাকতে পারে ? চেঙ্গিস্ খান্ এর সৈন্যবাহিনী, কী ভাবে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে ড্যানিউব-এর তট পর্যন্ত পতাকা ওড়াতে পেরেছিল ? কারণ, বারুদের ব্যবহার। ভারতবর্ষে বাবর-এর বিজয়ের প্রধান কারণই ছিল কামান, যা ঐ সময় ভারতবর্ষে প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল। এশিয়ার বুকে ইউরোপের দেশগুলির প্রবল বিজয়ের প্রধান কারণই হচ্ছে, অধিক শক্তিশালী আর নতুন নতুন ধরনের অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবহার। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে ভারতবর্ষে বাঁশের তৈরী কেল্লাই আত্মরক্ষার্থে যথেষ্ট ছিল, কেন না তখন হাতিয়ার ছিল তীর-ধনুক। তারপর যেমন যেমন হাতিয়ারের শক্তি বাড়তে লাগল, তেমনই দুর্গের দেওয়ালও মোটা হতে লাগল, তোপ-কামানের শক্তি আরো বেড়ে যাওয়ার ফলে তৈরী হলো মিলিটারী ফোর্ট। কিন্তু আন্টওয়ার্প-এর ন্যায় সুদৃঢ়-অভেদ্য ফোর্ট জার্মান তোপের আঘাতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উড়ে গেলো। আজকালকার বিমান-যুগে, ঐ সমস্ত আধুনিক দুর্গও খুব একটা কাজের নয় বলে প্রমাণিত। ঠিক এইসময় যখন পৃথিবীর সমস্ত দেশগুলি সদ্য আবিষ্কৃত অস্ত্রাদিতে সজ্জিত হতে ব্যস্ত, তখন আপনার সু-মধুর বাণী কেই-বা শুনবে বলুন তো ?

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কোনো সুস্থ স্বাভাবিক বোধ-বুদ্ধি সম্পন্ন সরকারই আত্মরক্ষার্থে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামরিক মাহাত্ম্যপূর্ণ যন্ত্রাদির ব্যবহার ছেড়ে দিতে রাজী হবে না। আবার কোনো যন্ত্রই যে সামরিক মাহাত্ম্যপূর্ণ নয়, এ কথাও কেউ সঠিকভাবে বলতে পারেন না। ধরে নেওয়া যাক —কোনো দেশের সরকার রাতারাতি বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে যন্ত্রের ব্যবহারকে বয়কট করার সিদ্ধান্তে রাজী হয়ে গেলো কিন্তু তাতে অবস্থাটা কী দাঁড়াবে ? ঐ কঙ্গো-র কৃষ্ণকায় দেশবাসীর যা হয়েছে। কোনো একটা শক্তিশালী রাষ্ট্রের গোলাম হওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না। হয়তো সেই শক্তি, আপনার মতোন শ'খানেক আদর্শবাদীর আত্ম-শুদ্ধির জন্য অরণ্যে তপস্যা ইত্যাদির সুবিধা এনে দেবে। কিন্তু দেশের আপামর জনগণের সুখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা সবকিছু চিরতরে ভুলে যেতে হবে। কেন না তাঁদের মুক্তি যদি কখনো আসে, তা' আসবে বিজ্ঞানেরই সহায়তায় কিন্তু আপনি তো তার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছেন।

এইভাবেই কোনো সাধারণ বোধ-বুদ্ধিসম্পন্ন সরকারের পক্ষেই আত্ম-রক্ষার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আবশ্যিক সামগ্রী, সামরিকসঙ্গতিপন্ন যন্ত্রের ব্যবহার বর্জনে রাজী হওয়া সম্ভব নয়। যদি কোনো দেশের পার্লামেন্ট-এ কোনো সত্যপথযাত্রী, এইরকম কোনো আইন পেশ করেন যে, সামরিক প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি ব্যতীত অন্যান্য যন্ত্রাদির ব্যবহার বর্জন করা হোক—তাহলে সেই দেশের সরকারের পক্ষে অতি সহজেই বিনা বিরোধে এই আইন পাশ করিয়ে দেওয়া সম্ভব; কেন না সরকারের পক্ষে সহজেই প্রমাণ করা সম্ভব হবে যে, কোনো যন্ত্রই সামরিক প্রয়োজনের আওতার বাইরে নয়। তবে যদি আইন কানুন ছাপার ব্যাপারটাকে কাগজ-কালির বাজে খরচ বলে মনে করা হয় এবং রাষ্ট্রীয় মিতব্যয়িতার বিজ্ঞাপন হিসেবে এক খামকেই বারবার ব্যবহার করার পক্ষপাতী সরকার যদি ক্ষমতায় আসীন থাকে, তাহলে ঐ সত্যপথযাত্রী পার্লামেন্ট সদস্যরা অনেক ব্যাপারেই অনেক ঝামেলার সৃষ্টি অবশ্যই করতে পারেন।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে আপনার কথামতো সত্যযুগের দিকে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় অথবা তাঁদের সরকার, কারুরই যাওয়ার কোনো মাথাব্যথা নেই। তবে এটা অবশ্যই মানছি, যদি নাক কাটারও শিষ্য-সামন্ত পাওয়া যায়, তাহলে আপনার নিঃস্বার্থ শুদ্ধভাব-সঞ্জাত চিন্তাধারাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য কিছু লোকজনের সন্ধান অবশ্যই পাওয়া যাবে। আর যদি আপনার হাতে পয়সা থাকে, তাহলে তো কথাই নেই। শহরের বাইরে, গ্রামের কোলে আপনার চিন্তাধারার আদর্শে, উদ্যানসম্বলিত আশ্রম তো নিশ্চয়ই স্থাপিত হবে।

পেছনে ফেরার ব্যাপারটা যে কতখানি অবাস্তব এবং অসম্ভব, এই সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো। যন্ত্রাদি বর্জন করে পেছনে হাঁটবার অর্থ, আজকের যুগে প্রেস, খবরের কাগজ এবং জ্ঞানের প্রসারে যে সব যন্ত্রের বিশাল ভূমিকা আছে, তাকে বিসর্জন দেওয়া। এবং লেখাপড়ার জন্য আবার আগের মতোন তাল-পাতা ইত্যাদির ব্যবহার চালু করতে হবে, বই-পত্তরের অভাবে লেখা পড়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবেই মুখস্থ বিদ্যার ওপর নির্ভর করতে হবে। যেহেতু আগে অন্য কোনো উপায় ছিল না তাই মানুষ ঐ সমস্ত ব্যবহারে বাধ্য ছিল। কিন্তু আজ যখন এই সমস্ত সহজ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, তখন শুধুমাত্র মৌখিক উপদেশাবলীর অনুকূলে মানুষ আধুনিক পদ্ধতির ব্যবহার ছেড়ে দেবে, এই আশা করার অর্থ মূর্খের স্বর্গে বাস করা।

আপনার সত্যযুগীয় চিন্তা হয়তো যন্ত্রের ফলে উদ্ভূত বেকারী সমস্যা সমাধানে কিছুদিন পর্যন্ত সাহায্য করবে। তবে এটা নির্ভর করবে, আপনার তত্ত্বকে কতখানি সফলভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন, তার উপর। কিন্তু বেকারীর আরও একটা অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে—জনসংখ্যা বৃদ্ধি। পৃথিবীতে কয়েকটি শিল্প-প্রধান দেশ ছাড়া অন্যান্য দেশগুলিতে জনসংখ্যা খুবই ভয়াবহ গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৬১ সালের জন-গণনা অনুযায়ী ভারতবর্ষে

গত ১০ বছরে প্রায় ছ'কোটির মতোন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের অধিকাংশ জেলাতেই এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, জন প্রতি এক একর-এর এক চতুর্থাংশ চাষের জমি পাওয়া মুশকিল এবং সেখানে পতিত জমি বা জঙ্গলও এমন নেই যেখানে চাষ-আবাদ করা যাবে। আপনি বিহারের সাহারানপুর আর যুক্তপ্রদেশের গোরক্ষপুর-এর দিকে তাকালে দেখতে পাবেন, মাথাপিছু চাষ-আবাদের জমির পরিমাণ $\frac{1}{2}$ একরও নয়। সেখানকার লাখখানেক মানুষ তো কলকাতা অথবা অন্যান্য বড় শহরগুলিতে কল-কারখানায় কাজ করে ; তবুও ওখানকার মানুষের দরিদ্রতা অবর্ণণীয়। আপনার আকাঙ্ক্ষিত সত্যযুগে খাদ্য-পরিধেয় ইত্যাদি ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য জন প্রতি অন্তত দুই একর জমি দরকার এবং গো-চারণ ভূমি আর ঋষিদের তপোবনের ব্যবস্থা যদি করতে হয়, তাহলে জমির পরিমাণ আরো বাড়াতে হয়। কিন্তু এই জমি আসবে কোথা থেকে ? এবার দেখুন, জমির পরিমাণ বৃদ্ধি যদি নিতান্তই অসম্ভব হয়, তাহলে লোকজনের সংখ্যা কমাতে হয়। সাহারানপুর জেলার ২৪ লাখ লোকের বসতিকে কীভাবে ৫ লাখে আনা যায়, এমন কোনো রাস্তা কী আপনি বাতলাতে পারেন ? বোধহয়, ঐভাবে পরিবার-পরিকল্পনার সপক্ষে আপনি রায় দান করবেন না, আর হিংসার রাস্তা নিয়ে এই সমস্যা সমাধানের কোনো প্রশ্নই আসে না। আর যদি একবারের জন্য হৃদয়ে পাথর দিয়ে কোনো না কোনো উপায়ে জনসংখ্যা ৫ লাখেই নামিয়ে আনলেন, কিন্তু কয়েক পুরুষ বাদে সংখ্যাটা আগে যেখানে ছিল সেখানেই ফিরে যাবে না কি ?

শিল্প-প্রধান দেশগুলিতে জনসংখ্যাকে পরিকল্পনার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশগুলি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কমিউ-নিজম পরিবার পরিকল্পনাকে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে মনে করে, তাই এই বিষয়ে কমিউনিস্টদের খুব একটা চিন্তিত হওয়ার দরকার নেই। কিন্তু সত্য-যুগে প্রত্যাবর্তনকারীর পক্ষে এই সমস্যার সমাধান অসম্ভব। সংযম এবং ব্রহ্মচর্যের তত্ত্ব হয়ত এক-আধজনের পক্ষে লাভজনক হতে পারে ; কিন্তু সমাজে ব্যাপকভাবে এর প্রয়োগের ফলে নানা ধরনের গুপ্ত-অপরাধের সৃষ্টি তো অবশ্যই হবে। তবে আপনি বলতে পারেন, খানিকটা আমরা করব, আর বাকী যেটুকু থাকবে সেই ব্যাপারে ভগবান নিশ্চয়ই সহায়তা করবেন। একটা কাজ করুন না, আপনারা কিছুই না করে পুরোপুরিভাবে ভগবানের উপরেই নির্ভর করুন। এটাও ভেবে নিতে পারেন —কমিউনিস্টরা যা কিছু করছেন, তা' ভগবানই করছেন। ঈশ্বর বা ভগবান সম্পর্কে পরবর্তী একটা অধ্যায়ে আলোচনা করব, তাই এ সম্পর্কে এখন আলোচনা করছি না।

আশা করি, উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে পেছনে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারটা যে কতখানি অবাস্তব এবং অসম্ভব তা' প্রমাণিত হলো। সুতরাং যা কিছু সমস্যার সমাধানে এগিয়ে গিয়েই করতে হবে, পিছিয়ে গিয়ে নয়।

চতুর্থ অধ্যায়

আমাদের ভয়াবহ দারিদ্রের একমাত্র প্রতিষেধ কমিউনিজম

পিছনে ফিরে যাওয়া যে কেন অসম্ভব সে কথা আলোচনা করেছি তৃতীয় অধ্যায়ে। পেট যাদের খানাপিনায় বোঝাই থাকে, অফুরান যাদের আয়েসের সময়, তারা যখন হাতে কলম বাগিয়ে ধরেন —তাদের পক্ষেই সম্ভব ভারতবর্ষকে ভূ-স্বর্গ বানিয়ে তোলা। আর এমন একটা ছবি আঁকা তাদের বড়ই মনপসন্দ। শতেক রাজা-মহারাজা, জমিদার-জোতদার আর কিছু সংখ্যক পয়সাওলা লোকজনই যদি ভারতবর্ষ হয়, তবে অবশ্য বলবার কিছু থাকে না। বিদেশী এ হেন লোকজন অনেক রয়েছেন যাদের ধারণা ভারতবর্ষ মানেই রাজা-মহারাজা, বিপুল ঐশ্বর্য এবং চোখ-ধাঁধানো জাঁক-জমক। পরিতাপের ব্যাপার —এরা কেউ ভারতবর্ষকে স্ব-চক্ষে দেখেননি। আদতে ব্যাপারটা কি? ভূ-স্বর্গ দূর-কল্পনা। বেশীর ভাগ ভারতীয় কী নিদারুণ দারিদ্রে নিমজ্জিত, তা' সঠিকভাবে আঁচ করা বিদেশের লোকজনের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব। ইউরোপীয়দের দৃষ্টিতে "রুটি-মাখন দিয়ে জীবন ধারণ" নেহাৎই কোনোমতে দু'বেলা দু'মুঠো খেয়ে টিঁকে থাকা। ব্যাপারটা ভারতবর্ষের গরীবমানুষের স্বপ্নের ধারে কাছে আসে না। এখানকার গ্রামের গরীব মানুষ ফসল তুলবার মরশুমে মোটামুটি দু'বেলা খেতে পায়। আর বছরের অন্য সময় কিভাবে দিন গুজরান করে তা' বোঝা দুঃসাধ্য। বিহার ও (যুক্ত) উত্তর প্রদেশের লোকজনের দিকে তাকান —ফসল তুলবার পুরো সময় যদি বা তারা দু'বেলা আহারের সংস্থান করতে পারেন, কিন্তু বৈশাখের মাঝামাঝি পৌঁছুতেই তাদের অবস্থা কাহিল হতে শুরু করে। আষাঢ় মাসে তাদের শরীর শুকিয়ে একেবারে খটখটে হয়ে যায়। বর্ষা নামতেই কলমী শাক ইত্যাদি ও বুনো লতাপাতা হয় তাদের একমাত্র আহার্য। অবস্থার সামান্য হেরফের হয়, যদি কোনো বছরে আমের ফলন

হয় সুবিধের, তবে শুক্‌নো রুটির সংস্থান হয়ে যায়। যদি এইসব মানুষজনের "দারিদ্রের বারমাস্যা" রচনা করা যায় তবে বছরের দু-তিনটে মাস বাদ দিয়ে পুরোটাই হবে করুণ-কাহিনীতে ভরা-ভরতি। শহরের ফুটপাত ও রেল-ষ্টেশনগুলোয় হামেশাই এমন লোকজন দেখতে পাবেন যারা আপনার ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট খাবার, জঞ্জালস্তূপ ঘেঁটে —ডাস্টবিন থেকে এমন কি কুকুরের মুখ থেকে ছিনিয়ে খাচ্ছে। দেশের কোটি কোটি বেকারের কর্ম-সংস্থান করবার আগে আপনি, এদেরকে 'যতসব অ-কেজো', 'সমাজের আস্তাকুঁড়' জাতীয় অপবাদ দিতে পারেন না। ভাগ্যিস আমাদের দেশে শীত তেমন জাঁকিয়ে বসে না, নয়তো লাখখানেকের বেশী মানুষ শীতেই মরে যেত। পরনে কাপড় জোটাতে পারে ক'জন? লক্ষ লক্ষ মানুষ একটা ছেঁড়া ধুতি এবং তার সঙ্গে বড়জোর একটা গামছা নিয়ে দিব্যি আনন্দে কাটিয়ে দেয়। আর যদি পুরো দেহ ঢাকবার মতো একটা কাপড় জুটে যায়, তবে তো কেল্লা ফতে। আমাদের বহু শিক্ষিত-ভদ্র-বন্ধুজন —এদের ময়লা কাপড়ের দিকে তাকিয়ে নাক চেপে ধরেন। কিন্তু ঐ সব ভদ্র-সন্তানরা কি একটু ভেবে দেখবেন —কত কষ্টে, দু'বেলা খাবার জুটিয়ে দশআনার মতোন অর্থসঞ্চয় করে একখানা ধুতি কেনা যায়? এমন লোক —কাপড় সাফ করবার সাবান জোটাবে কি করে?

রোগ-ভোগ তো এদের কাছে সরাসরি মৃত্যুর পরোয়ানা। এ ব্যাপারে আমার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। একটি গ্রামের এক পরিবারকে দেখেছি শুধুমাত্র কুইনাইন আর মামুলি কিছু পথ্যের জোগাড় করতে না পারায় পুরো পরিবারটি দু-তিন বছরের মধ্যে শেষ হয়ে গেলো। এ ধরনের প্রচুর উদাহরণ ভারতবর্ষের প্রতিটি কোণেই পাওয়া যাবে।

এ তো গেলো জীবনধারণের জন্য একান্ত অনিবার্য আবশ্যকীয় বস্তুর কথা। প্রকৃত অর্থে মানুষ হওয়ার জন্য চাই শিক্ষা, কিন্তু সরকার গ্রামে গ্রামে স্কুল স্থাপনের কোনোরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না। বলেন, তহবিলে মোটেই টাকা-পয়সা নেই। এটাও কী আমাদের দরিদ্রতার যথেষ্ট উদাহরণ নয়? ধরে নেওয়া গেলো, অদূর ভবিষ্যতে গ্রামে-গ্রামে স্কুল খোলার ব্যবস্থা হলো, কিন্তু তাহলেও কী সবাই তাঁদের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে পারবেন? ছ-সাত বছরের শিশুদেরও গরু-বলদ চরিয়ে পেটের ভাত জোটাতে হয়, যদি সে স্কুলে যায় তাহলে তার খাওয়া-দাওয়া আর কাপড়-চোপড় আসবে কোথা থেকে?

সংক্ষেপে এটুকুই বলা যায়, আমাদের দরিদ্রতার তুলনা বোধহয় অন্য কোনো দেশের সঙ্গেই করা যায় না। আমাদের এখানকার সাধারণ মানুষ তো আর অন্য কোনো দেশ দেখেনি, তাই সে নিজেদের মধ্যে দরিদ্রতার তারতম্য খোঁজে, আর এ সব কপালের দোষ বলে সহ্য করে।

এই ভয়াবহ দরিদ্রতার কিছু কিছু কারণ সম্পর্কে পাঠক তো অনেক

কিছুই পড়েছেন কিংবা শুনেছেন। কিছু কিছু লোকজন তো সমস্ত দোষ বিদেশী শাসনের ওপর চাপিয়ে দিয়ে দায়িত্বের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে চান। তাঁরা মনে করেন, স্বরাজ হয়ে গেলেই সমস্ত সঙ্কটের পরিত্রাণ হবে। উদাহরণ হিসেবে অনেক স্বরাজপ্রাপ্ত দেশের কথাই বলা যেতে পারে, যেখানে পেটের জ্বালায় অনেক লোকজনই আত্মহত্যা করে। বিদেশী শাসন আর ব্যবসায়িক কারণে যে বিপুল ধনরাশি দেশের বাইরে চলে যায়, তা' ভারতের ৩৫ কোটি লোকের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করে দিলেও অবস্থার খুব একটা যে উন্নতি হবে তা' মোটেই নয়। অবশ্য স্বাধীন সরকার শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে যদি প্রভূত সাহায্য করে তাহলে অবস্থার কিছুটা উন্নতি নিশ্চয়ই হবে। তবুও আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই ইউরোপের উন্নত দেশগুলির দীনতম গরীবের চেয়েও খারাপ অবস্থায় থাকবে। আমাদের দরিদ্রতার যে কোনোরকম ওষুধই নেই, তা' মোটেই নয়। উৎপাদনের উপকরণগুলি থাকা সত্ত্বেও আমরা অপারগ, কেন না ঐ সমস্ত উপকরণের সঠিক ব্যবহারে আমরা অক্ষম। শ্রমই মানুষের সম্পদ। আমাদের দেশের ৩৫ কোটি মানুষের মধ্যে ২৮ কোটি মানুষ তো অবশ্যই কর্মক্ষম। এর মধ্যে স্বল্প-সংখ্যক মানুষ ধনী হওয়ার ফলে শ্রমের ব্যাপারটাকে তাঁরা অসম্মানজনক মনে করেন। শুধু তাই নয়, এঁদের তত্ত্বাবধান করা ও খিদমতগারির জন্যও আরো কিছু লোকজনের দরকার হয়। ঐ ধরনের ধনী ব্যক্তির নিজের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, অন্যের শ্রমকেও তো তারা চুরি করছে। কোনো পুঁজিবাদী দেশেই সবার কর্মসংস্থান সম্ভব নয়, মিল-মালিক আর জমিদারদের এক পরিমিত সংখ্যারই মজুরের প্রয়োজন, রাজা-মহারাজা আর শেঠ-সাহুকারদের খিদমতগারি তো উৎপাদক শ্রম নয়, কেন না ঐ কাজের দ্বারা মনুষ্যজীবনের প্রয়োজনীয় কোনো কিছুই উৎপাদিত হয় না। শ্রম এবং মজুরী পরস্পর মুখাপেক্ষী। যখন শ্রম —খাদ্য, পরিধেয় এবং আশ্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপাদন করে, তখনই শ্রমিক তার শ্রমের পরিবর্তে এবং উৎপাদনের ফল হিসেবে টাকা-পয়সা রূপে মজুরী পায়। যে পরিমাণে জীবনের উপযোগী বস্তুর উৎপাদন বৃদ্ধি হবে, সেই পরিমাণেই মজুরীর বৃদ্ধি হওয়া উচিত, কিন্তু পুঁজিবাদ তো সমস্ত কিছুই নির্ধারণ করে মুনাফার দিকে তাকিয়েই। মুনাফা অর্জনের পথে বাধা-বিপত্তির কথা আমি আগেই আলোচনা করেছি। যেহেতু একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের পক্ষে সকল ব্যক্তির শ্রমের ব্যবহার অসম্ভব সেহেতু পুঁজিবাদে শ্রমের অপব্যয় অবশ্যম্ভাবী। উদাহরণ হিসেবে একটি ঘটনার উল্লেখ করতে পারি ; ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসে বিহারের এক বিধ্বংসী ভূমিকম্পের কথা আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, শহর আর গ্রামের লাখখানেক

ঘড়-বাড়ি, যাতায়াতের রাস্তা, ব্রীজ ইত্যাদি সব কিছুই এতে ধ্বংস হয়ে যায়, এইরকমই অনুমান করা হয়েছে যে, এ সমস্ত পুনর্নির্মাণের জন্য আরো একটি যুগের অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু তা' হবে কেন ? বিহারে ইট, পাথর, কাঠ আর লোহার কি অভাব ? কাজ করার লোকজনের অভাব ? তা'তো মোটেই নয়। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাতেই প্রায় এক কোটি লোকের বসবাস, তার অর্ধেক লোকজন তো অবশ্যই কোনো না কোনো কাজ করতে পারে। মুঙ্গের-এর আশপাশে পাথরের পাহাড়, তরাই-এর সেগুন ইত্যাদি কাঠের জঙ্গলও খুব একটা দূরে নয়, আর ঝরিয়ার খনি অঞ্চলে তো অনেক কয়লা পড়ে আছে এবং সর্বোপরি টাটা-র লোহার কারখানাও তেমন খুব দূরে নয় —তাহলে কী কারণে বিধ্বস্ত বিহারের পুনরুজ্জীবনের জন্য আরো একটি যুগের প্রতীক্ষায় থাকতে হবে ? কারণ উপরিউক্ত প্রয়োজনীয় বস্তুগুলির মালিক রাষ্ট্র নয়। কয়েকজন ব্যক্তি বা পুঁজিপতি মুনাফা ব্যতীত ঐ বস্তু সমূহের ব্যবহারের আজ্ঞা প্রদানে রাজী নয়। শ্রমের মূল্য নির্ধারণ তো সে লাভের দিকে তাকিয়েই করে। যদি পঞ্চাশলাখ লোকের মজুরীর বিনিময়ে অধিক লাভের সম্ভাবনা থাকে, তবেই সে পুঁজি বিনিয়োগ করতে রাজী হবে, কিন্তু এখানে সেই সম্ভাবনা নেই তাই বিনিয়োগের প্রশ্নও নেই। এই পুঁজিপতিরা কখনোই বুঝবে না যে, এই বিনিয়োগের ফলাফলে —রাষ্ট্রীয় ধন-সম্পদই বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি, পুঁজিবাদ এবং মুনাফা ইত্যাদির ফলে বিহারের পুনরুজ্জীবনের জন্য এখনো বছরের পর বছর প্রতীক্ষায় থাকতে হবে।

যদি বিহারে আজ কমিউনিস্ট শাসন ব্যবস্থা থাকত তাহলে অবস্থাটা কী দাঁড়াত ? ভূমিকম্পের পরের সপ্তাহেই কর্মক্ষম ৫০ লাখ মানুষকে পুনর্নির্মাণের কাজে লাগানো হতো। যদি একজন মানুষ ৫০ চুবড়ি করে মাটি তুলতে পারে তাহলে একদিনেই ২৫ কোটি চুবড়ি মাটি সড়কে ফেলা সম্ভব। এইভাবে ক্ষেতে জমে যাওয়া জঞ্জাল এবং খালগুলিতে জমে যাওয়া বালি সাফ করতে আর কত সময় লাগবে ? বর্ষা শেষ হওয়ার আগেই যদি ৫০ লাখ লোক ঘর-বাড়ি এবং আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় জিনিস পত্তরের উৎপাদনে লেগে যায় তাহলে বিধ্বস্ত বিহার আগের থেকে অনেক বেশী সুন্দর, স্বাস্থ্যপ্রদ ঘর-বাড়ি, সড়ক, পুল ইত্যাদিতে সুসজ্জিত হতে কী এক-দেড় বছরের বেশী সময় লাগবে ? মজুরী ইত্যাদির জন্য টাকা-পয়সার প্রশ্ন ? জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য সব কিছুই তো বিহারে উৎপন্ন হয় সুতরাং এগুলির বিনিময় মোটেই খুব একটা অসুবিধের ব্যাপার নয়। সমাজবাদী জনগণের সরকার প্রতিদিনই মাথাপিছু এক টাকা মজুরী হিসেবে

দেবে, যা তার কাজের উপযুক্ত মজুরী এবং যার দ্বারা সে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় বস্তু ক্রয় করতে পারে। বিশেষ দরকার মনে করলে, একবছরের জন্য খাদ্য, পরিধেয় ইত্যাদি বস্তু বিদেশ থেকে আমদানি করা হবে। যদি প্রতিবেশী রাষ্ট্র কমিউনিস্ট না হয় তাহলে বাজারে খানিকটা মন্দাবস্থা দেখা দেবে। পরে বিহার স্বাবলম্বী এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সাহায্য করতে পারবে।

কমিউনিজমের উদ্দেশ্যই হচ্ছে, সারা দেশ ও বিশ্বকে এক সম্মিলিত পরিবারের রূপদান এবং দেশের সমস্ত সম্পদকেই ঐ পরিবারের সম্পদে রূপান্তরিত করা। ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে যেখানে জীবনধারণের অপরিহার্য সমস্ত বস্তুই উৎপন্ন করা সম্ভব, সেখানে শুধু দরকার —বার্ষিক প্রয়োজনীয়তার সঠিক পরিমাপ করে, উৎপাদনের জন্য পরিবারের সবার মধ্যে সমভাবে কর্ম বণ্টন এবং উৎপাদিত বস্তুর প্রয়োজনানুসারে সম-বণ্টন।

প্রতিটি মানুষের খাদ্য, পরিধেয়, বাসস্থান, অসুস্থের পথ্য এবং শিশুর শিক্ষাব্যবস্থা হয়ে গেলেই মোটামুটি আর কী চাই। মুনাফা তো অন্যের পরিশ্রমের ফল আত্মসাতেরই নামান্তর, কমিউনিজম-এর অভিধানে এর কোনো স্থান নেই।

সুতরাং আমাদের দেশের এই ভয়াবহ দরিদ্রতাকে দূর করা একমাত্র কমিউনিস্ট ব্যবস্থাতেই সম্ভব, কারণ এই ব্যবস্থার দ্বারাই সবাইকে কর্মে নিয়োগ করা সম্ভব।

পঞ্চম অধ্যায়

আমাদের সামাজিক রোগ ও কমিউনিজম

কীভাবে ভারতবর্ষে প্রাক্-দ্রাবিড়ীয়, হাবসী, দ্রাবিড় এবং আর্য এই ৪ জাতির সংমিশ্রণ হয়েছিল তা ভূমিকাতেই সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। আজ থেকে ৩৫০০ বছর আগেই, আর্যদের আগমনের সঙ্গে শাদা-কালো অথবা আর্য-অনার্যের প্রশ্ন উঠেছিল এবং আর্যরা হয়েছিল বিজয়ী। নিজেদের সব ব্যাপারেই তারা ছিল গর্বিত। আর্যরা তো আর সাম্যবাদী ছিল না যে, বিজয়ী এবং বিজিতর ভেতর সব ভেদাভেদই দূর করবে! তাদের শারীরিক রঙ-রূপ সব কিছুই ছিল অনার্যদের থেকে ভিন্ন, তারা মোটেই চাইত না কালো, বেঁটে আর চ্যাপ্টা নাকের অনার্যদের সংসর্গে এসে, তাদের ফর্সা রঙ, টিকোলো নাক, লম্বা চেহারা ইত্যাদি নষ্ট হয়ে যাক। এই ভাবধারা সময়ে সময়ে উগ্ররূপ ধারণ করেছিল এবং এই কারণে ঐ অন্ধকারময় অতীতেও আমেরিকায় লেংচিঙ-এর ন্যায় রক্তের হোলি খেলা হয়েছিল। অপমান আর বিভেদের বিষাক্ত আবহাওয়া দূর করার উদ্দেশ্যে যখন এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও এত আন্দোলনের দরকার হয়, তাহলে ঐ সময়ে অবস্থাটা যে আরো মারাত্মক ছিল তা' অনুমান করা খুব সহজ। আর এ সম্বন্ধে তো আর্যদের প্রাচীন গ্রন্থগুলিতেই অনেক পরিচয় প্রমাণ দেওয়া আছে।

আর্যদের গর্বিত হওয়ার পেছনে কারণ, যেহেতু তারা ফর্সা, রূপবান এবং সর্বোপরি বিজয়ী। ভারতবর্ষেও এই রঙ আর বর্ণের প্রশ্ন ৩৫০০ বছরের প্রাচীন। সামাজিক বহিষ্কার ইত্যাদি কঠোর শাস্তির প্রচলন থাকা সত্ত্বেও প্রতিনিয়ত পাশাপাশি একসাথে থাকার ফলে রক্ত-সংমিশ্রণ রোখা সম্ভব হয়নি। বর্তমান আর্যদের যে কোনো উপজাতিকে দেখুন, তাদের অনেকেরই রঙ-রূপ,

আর্যদের রঙ-রূপের সঙ্গে অনেকটাই মিলবে। আবার অনার্য জাতির মধ্যে বহু স্ত্রী-পুরুষের দেখা পাওয়া যাবে, যাদের রঙ-রূপ আর্যদের মতোনই দাঁড়িয়েছে। এইভাবেই আজকাল বর্ণ (রঙ)-এর সঙ্করতা (সংমিশ্রণ) এমনই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, বর্ণভেদের পুরনো লক্ষণগুলি আজ আর নেই। আজ পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও এককালে বিজয়ী ছিলাম —এ ধরনের গর্বিত ভাবটা হাসির ব্যাপার। তবুও, ঐ গর্বিত ভাবটা থেকেই গেছে।

আর্য-অনার্য বিভেদ তো বহু প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে, পরবর্তী কালে আরো হাজারটা জাতির উদ্ভব হওয়ার ফলে অবস্থাটা আরো সঙ্কটজনক দাঁড়িয়েছে। প্রাচীন কালে আর্য জাতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিবাহ এবং অন্যান্য সামাজিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রটা অন্ততঃপক্ষে ছিল স্বাভাবিক, এই কারণে এই জাতিগুলির মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি খুব একটা ছিল না। কিন্তু আজকাল তো সব জাতিগুলিই এক একটা আলাদা স্বতন্ত্র সমাজে রূপান্তরিত। তাদের বিবাহ, জীবন-মৃত্যু সমস্ত কিছুই নিজেদের মধ্যে সীমিত, সে কারণেই অন্যান্য জাতিগুলির তুলনায় নিজের ক্ষুদ্র জাতি সমাজটাই তার কাছে প্রধান। তবুও জাত-পাত-এর ব্যাপারটা আগে এতটা ভয়ানক ছিল না। কিন্তু বিগত শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই নিজ নিজ জাতীয় সংগঠন ইত্যাদি স্থাপন করে অন্যান্য জাতি থেকে পৃথক হওয়ার গর্তটা আরো গভীরভাবে এরা খুঁড়লো, ফলে আজ সার্বজনীক সমাজ-জীবনে এক ঘৃণ্য পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। প্রাদেশিক থেকে শুরু করে জেলা ভিত্তিক এই ধরনের জাতীয় দলগুলিকেই দেখা যায়। যে দিকেই তাকাবেন, দেখবেন —ব্রাহ্মণ পার্টি (এর মধ্যে আবার কাশ্মিরী, মৈথিলী, কনৌজী ইত্যাদি), কায়স্থ পার্টি (এর মধ্যেও আবার মাথুর, শ্রীবাস্তব ইত্যাদি), রাজপুত পার্টি, ভূমিহার পার্টি ইত্যাদি নানা দল উপদলে আজ সার্বজনীক সমাজ বিভক্ত।

নিজ জাতির নামে শুধু যে এরা দৌড়ে আসে তাই নয়, প্রয়োজনে শাদাকে কালো এবং কালোকে শাদা প্রমাণ করতেও এরা বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। সবদিক থেকে যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও একজন ব্যক্তি প্রফেসারী কিংবা ডেপুটি কালেক্টরী পদ নাও পেতে পারে। আবার একেবারে অযোগ্য ব্যক্তিও তার কোনো উচ্চপদে কর্মরত জাত ভায়ের সুপারিশে ঐ পদে মনোনীত হতে পারে। শুধুমাত্র সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রেই নয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও এই ধরনের নোংরামির অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং পরীক্ষক যদি দেখেন যে, ছাত্রটি তার নিজ জাতের তাহলে পরীক্ষার খাতায় দরাজ

হাতে নম্বর দিতে তিনি ভালোইবাসেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তো এই ধরনের পক্ষপাতিত্বের ব্যাপারকে খুবই মামুলি বলে গণ্য করা হয়।

জাত-পাতের মতোই প্রাদেশিকতার ব্যাপারটাও ভারতবর্ষে এক অতি কুৎসিত রূপ ধারণ করেছে, এখানেও ঐ বিশ্রী পক্ষপাতিত্বের প্রকটন। কোনো একটা উচ্চপদে বসতে পারলেই হলো, তারপর যোগ্য-অযোগ্যের কোনোরকম বিচারের বালাই নেই। নিজের প্রদেশের লোকজনকে চাকুরীতে ঢোকাতে পারলেই হলো। জাতি-ভাই-এর মতোনই প্রদেশ-ভাই-এর জন্য যে কোনো ধরনের বেইমানী করা যেতে পারে। কোনো এক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সম্বন্ধে শোনা যায় যে, তিনি তাঁর প্রদেশ-ভাইকে একটু সামনের সারিতে আনার জন্য থিসিস পর্যন্ত নিজে লিখে দিয়েছেন। আবার এই ধরনের লোক-জনকে যদি খুব কাছ থেকে দেখেন তাহলে দেখবেন যে, এরা মোটেই খুব একটা খারাপ লোক নয়, বাস্তবিকই ভদ্র এবং অতি সজ্জন ব্যক্তি। তবুও এইসব নোংরা কাজকর্ম কেনই বা এরা করে? আসলে রাষ্ট্রের বিভাজন নীতিই এই সমস্ত নোংরামির জন্য দায়ী।

কাউন্সিলার ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড কিংবা মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনের সময় এই জাতি, প্রদেশ ইত্যাদি বিভেদ নীতি যে কতখানি মারাত্মক আর নোংরা রূপ ধারণ করে তা' আর বলার নয়। ধর্মীয় বিভেদ নীতি ইত্যাদি বিষয়ে পরে আলোচনা করবো, কিন্তু এই জাতি আর প্রাদেশিক ভেদাভেদ, ধর্ম সম্বন্ধীয় ভেদাভেদ থেকে আরো বেশী মারাত্মক।

কমিউনিজম ব্যতীত এই সমস্ত নোংরামী দূর করার অন্য কোনো রাস্তা নেই। প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায়, মুনাফা এবং প্রভুত্ব করার প্রতি সবার লোভ, আর একে চরিতার্থ করার জন্য সে যে কোনো মূল্য দিতেও প্রস্তুত। বিবাহ ইত্যাদি আত্মীয়তার ক্ষেত্রেও এই জাতি আর প্রাদেশিকতার দোহাই দিয়ে মানুষ নিজের স্বার্থের গোছাতে ব্যস্ত, এই আত্মীয়তার বন্ধনে সে কতখানি লাভবান হবে সেই অঙ্ক কষতেই ব্যস্ত, আর এটা এমনি লাভের ব্যাপার যে, অতি বড় বড় আদর্শবাদীও এই জায়গায় এসে পিছলে যান।

এ সবকিছুই ঘটছে এমন একটা সময়ে যখন প্রতিটি স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন ভারতবাসী অতি সহজেই বুঝতে পারছেন যে, তাঁর দেশকে পতিত ও পদদলিত করে রাখতে পারার প্রধান কারণ এই জাতিভেদের মতো অন্যায় আর নোংরা প্রথা, যার সাহায্যে একটি জাতি সত্তাকে অনেক অনেক টুকরো করে একেবারে দুর্বল করে দেওয়া হয়েছে। যাঁরা কমিউনিজম-এ বিশ্বাসী নন, সেই ধরনের লোকজনও এই ভয়াবহ সামাজিক রোগটিকে চিনতে

পেরেছেন, তাঁরাও বোঝেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই ভয়ানক রোগের হাত থেকে মুক্ত হতে না পারছি, ততক্ষণ স্বাধীনভাবে নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ নেই। এই জন্যই তাঁরা অচ্ছুতদার এবং জাত-পাত ভাঙবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন।

কেবল এই আন্দোলনের সাহায্যে রাষ্ট্রের একীকরণ সম্ভবপর নয়। জাতি আর প্রাদেশিক বিভেদ আজ শুধুমাত্র সামাজিক ক্ষেত্রেই আবদ্ধ নেই, আজ এর সঙ্গে আর্থিক বিভেদও সম্মিলিত। উঁচুজাতের কিছু বিবেচক লোকজন কেনই বা হঠাৎ অচ্ছুতদের উদ্ধারের জন্যে এইরকম উঠে পড়ে লেগেছেন? কেন না, এরা বোঝেন, শিক্ষার প্রসার আর বিদেশীদের সংসর্গে ঐ সমস্ত নীচু জাতের গরীব লোকজনদের মধ্যে জন্ম দিচ্ছে এক আত্মসম্মান বোধ। দীর্ঘ দিনের অপমান হয়তো এরা চিরকাল ধরে মুখ বুঝে বরদাস্ত নাও করতে পারে। কিন্তু উঁচুজাতের জন্য নির্দিষ্ট মন্দিরের দ্বার খুলে দিলে আর কুয়োতে নির্বিশেষে জল খাওয়ার অধিকার দিলেই যে, ঐ অসন্তোষ আর বিভেদ দূর হয়ে যাবে তা' মোটেই নয়। মন্দিরের দ্বার খুলে দেওয়ার চেয়েও অনেক কঠিন কাজ হচ্ছে, সমস্ত ধরনের কাজকর্মে অচ্ছুতদের প্রবেশের বাধাকে দূর করা। একজন চামার যদি কাপড়ের ব্যবসাতে নামে তাহলে তার লালবাতি জ্বালতে কী খুব বেশী সময় লাগবে? ফলের ব্যবসা কিংবা মিষ্টির দোকান খুললেও কী তার ঐ একই দুর্গতি হবে না? দার্জিলিং জেলার এক নীচু জাতির ডাক্তারের হাত থেকে ওষুধ নিতে অস্বীকার করতে করতে উঁচু জাতির লোকজনেরা এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করল যে, বেচারী ডাক্তার অবশেষে চাকরী ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। রোজগারের ক্ষেত্রে অচ্ছুতদের বহিষ্কার তো উঁচু জাতির লোকজনের কাছে লাভের প্রশ্ন, সুতরাং কোন সুবুদ্ধি বলে সে তার এই স্বার্থকে ছাড়বে? অচ্ছুতদের তো মন্দির আর শাস্ত্র ইত্যাদি ধার্মিক ক্ষেত্রে অবাধ প্রবেশাধিকার দেওয়া হলেই সমস্ত সমস্যা দুরীভূত হওয়া সম্ভব! কিন্তু এখানেও তাঁদের ঐ ফাঁদেই ফেলবার রাস্তা তৈরী করা হচ্ছে।

সুতরাং, বোঝা যাচ্ছে যে, এই সমস্ত সামাজিক বিভেদভাব আর্থিক জীবনেও এক বিরাট প্রভাব ফেলেছে, এর সাহায্যে দলিত জাতিগুলিকে আর্থিক দৃষ্টিতে দলিত রাখা হয়েছে। পুঁজিবাদ অনুসারে ব্যক্তিই আপন সম্পত্তির মালিক এবং নিজের ইচ্ছানুসারেই সেই সম্পত্তি ভোগ করার অধিকার তার আছে। কাজেই, আর্থিক ক্ষেত্রে কোনো অনুশাসনেই সে তার অচ্ছুত ভাইকে অগ্রগামী হওয়ার সুযোগ প্রদানে রাজী হবে না।

এই সামাজিক রোগ, একমাত্র কমিউনিস্ট শাসন-ব্যবস্থাতেই দূর হওয়া সম্ভব। কমিউনিস্ট ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত আর্থিক মুনাফার প্রশ্ন নেই এবং বিশেষ করে কোনোরকম আর্থিক লাভের আশা ব্যতীত কে-ই বা আর মান প্রতিষ্ঠার জন্য উঠে পড়ে লাগবে? জাতীয় বন্ধন আর আভিজাত্যের বড়াই কে করে? যার কাছে অর্থ আছে। ধন-সম্পত্তির বলেই সে অন্যের সম্পত্তির ওপর নিজের প্রভাব ফেলে। কমিউনিস্ট ব্যবস্থায় তো ধন-সম্পদ ব্যক্তির আয়ত্তে থাকবে না, সুতরাং শেঠ পুনমচাঁদ আর মঙ্গল বেনিয়া অথবা মহারাজা চৌপটনাম অথবা জগুয়া রাজপুত-এর চিন্তা-বুদ্ধির সঠিক মূল্যায়নও সম্ভব, কেন না এই সমাজ-ব্যবস্থায় একজনের যোগ্যতার মূল্যায়ন সঠিকভাবেই ব্যক্তির যোগ্যতার উপরেই নির্ভরশীল। এটা সবাই জানে যে, বর্তমান সমাজে একজন ব্যক্তির যোগ্যতার মাপকাঠি হচ্ছে তার ধন-দৌলত। বিদ্যা, বুদ্ধি অথবা বিনয় কোনো কিছুই প্রয়োজনীয় নয়, কারণ এই সমাজে জাত-পাতের মতোন নোংরামি নির্বিঘ্নে চলে আসছে। এই সমস্ত জাত-পাত পন্থী ধনী লোকজনদের হাত থেকে ধন-সম্পদ কেড়ে নেওয়ার অর্থ তার ধনের প্রভাবকে বিনষ্ট করা। এর পরই সমাজে বিদ্যা-বুদ্ধি সম্বলিত চিন্তাশক্তি নিরপেক্ষ-ভাবে বিকাশিত হবে এবং ছোট ছোট জাতিগুলি ভেঙ্গে দিয়ে এক বিশাল জাতি নির্মাণের সাফল্য অনিবার্যভাবেই সম্ভব হবে। তখন সমাজে সমভাব বিরাজমান হওয়ার ফলে এক কায়স্থ তরুণ আর ব্রাহ্মণ তরুণীর বিবাহকে কোনো শক্তিই রুখতে পারবে না। আসলে সমস্যাটি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সামাজিক বিভেদকে শক্তিশালী করার পিছনে আছে আর্থিক স্বার্থ, একবার এই আর্থিক স্বার্থকে হটিয়ে দিন, জাত-পাতের এই বিশাল ইমারত ভেঙ্গে চুরমার হতে মোটেই খুব একটা সময় লাগবে না। অন্যান্য যে কোনো সংস্কারপন্থী আন্দোলনই হচ্ছে, রোগের মূল শিকড়ে প্রবেশ না করে ডালপালা ধরে নাড়াচাড়া করা। এর ফলে চিরকাল ধরে শুধু আন্দোলনই চলবে কিন্তু কোনো দিনই সাফল্য লাভ ঘটবে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কমিউনিজম এবং সুস্থ সন্তান

আমাদের সরকার দেশবাসীর সু-স্বাস্থ্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, এর জন্য হাজার হাজার চিকিৎসক নিযুক্ত, এই উদ্দেশ্যেই শহরগুলিতে মিউনিসিপ্যালিটি—যার কাজ রাস্তা সাফাই, বিদ্যুৎ এবং জল সরবরাহ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা। এই সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটি, যারা রাস্তা সাফাই, বিদ্যুৎ, জলের ব্যবস্থা ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত, এরা অধিকাংশ কাজ ঠিকাদার মারফতে করান, ফলে কাজগুলিও মুনাফার সামগ্রীতে পরিণত হয়। অনেকেই আছেন, যাঁদের বক্তব্য—একটি কমিউনিস্ট সমাজ-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয়করণ ইত্যাদির দ্বারা কাজকর্মগুলি সুব্যবস্থিত রীতিতে সম্পাদিত হওয়া সম্ভব নয়। তাঁদের সামনে নজীর হিসেবে—লণ্ডন, প্যারিস্ ইত্যাদি বৃহৎ মিউনিসিপ্যালিটি-গুলিই যথেষ্ট উদাহরণ, যদিও এই সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটিতে জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ কিংবা রাস্তা সাফাই ইত্যাদি কাজকর্ম আংশিকভাবেই রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়েছে। চিকিৎসা, সাফাই ইত্যাদির জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়, তার উদ্দেশ্য যাতে দেশবাসী সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়, মারাত্মক রোগ-গুলির থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকে। কিন্তু সমাজে সবচেয়ে মারাত্মক রোগ তো বংশানুক্রমিক রোগ, যার হাত থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায়—সুস্থ এবং নীরোগ সন্তানের জন্মদান। দৃষ্টান্ত হিসেবে কুষ্ঠরোগকে ধরতে পারেন, রোগ ভোগ শুধুমাত্র একপুরুষের ওপর দিয়ে নয়, উত্তর পুরুষেও এই রোগ ধাওয়া করে। অর্থাৎ কুষ্ঠরোগ একটি বংশানুক্রমিক রোগ। এই রোগের দ্বারা আক্রান্ত একজন মানুষ সকলের দৃষ্টিতে ঘৃণিত হিসেবে পরিগণিত হয়, একজন কুষ্ঠরোগাক্রান্ত মানুষ রোগের প্রারম্ভিক অবস্থায় আশপাশের মানুষজনের মধ্যে

রোগের বীজাণু ছড়ায় এবং একজন কুষ্ঠরোগীর সন্তান অবশ্যই কুষ্ঠরোগী হয়। যদি কোনো কারণে দ্বিতীয় পুরুষ রোগাক্রান্ত না হয়, তাহলে তৃতীয় পুরুষে এই রোগের ছায়া অবশ্যম্ভাবী। কুষ্ঠরোগ সম্বন্ধীয় বই-পত্তর, মেডিক্যাল জার্নাল ইত্যাদি দেখলেই বুঝতে পারবেন যে, পৃথিবীতে এই রোগের প্রকোপ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারতবর্ষে বাঁকুড়া ইত্যাদি জেলায় এই রোগবৃদ্ধির গতি খুবই মারাত্মক, চম্পারণ-এর একটি গ্রামে আগে পাঁচ-ছ'টি কুষ্ঠরোগী ছিল, পরে রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পেতে গোটা গ্রামটিই কুষ্ঠরোগীর গ্রামে পরিণত হয়েছে।

এই রোগের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় উদ্ভাবনের জন্য কতবছর ধরেই চিকিৎসকেরা চেষ্টা করছেন। অবশ্য মনুষ্যজাতিকে এই রাক্ষসের কবল থেকে মুক্ত করবার পথ আবিষ্কার হলেও, তার প্রয়োগ বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় সম্ভব নয়। কারণ, পুঁজিবাদ শুধু নাম কা ওয়াস্তে অরাজকতা আর অব্যবস্থার বিরোধী, কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং সম্পত্তির অপব্যবহারের খোলা অধিকার এই সমাজ-ব্যবস্থায় আছে, বস্তুত পুঁজিবাদ তো এসব কিছুরই পৃষ্ঠপোষক। কুষ্ঠরোগের প্রতি রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গী কখনোই এমন হওয়া উচিত নয় যে, এই রোগের চিকিৎসা আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের দুঃসাধ্য। যদি একজন কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে মনুষ্য-বসতির বাইরে কোথাও বসবাসের ব্যবস্থা করা হয় এবং রোগীর সন্তান-সন্ততি জন্মদানের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়, তাহলে আশপাশের লোকজনের মধ্যে রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা এবং পরবর্তী পুরুষেও রোগ থাওয়ার সম্ভাবনাটাও থাকে না। কিন্তু এই সমস্ত কাজ একমাত্র কমিউনিস্ট রাষ্ট্রেই সু-শৃঙ্খল এবং কড়া পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে। রোগের কারণগুলির যদি অনুসন্ধান করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, বংশানুক্রমিক সম্ভাবনার পরই সবচেয়ে প্রধান কারণ হচ্ছে—বেশ্যালয়। যদি ধন-সম্পদের প্রভুত্ব, ব্যক্তির কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয় তাহলে এই বেশ্যালয়গুলি কী কায়েমভাবে থাকা সম্ভব? একজন ব্যক্তির নিকট যখন দেওয়ার মতোন উদ্বৃত্ত ধন-সম্পদ থাকে তখনই সে গুপ্তভাবে অথবা খোলাখুলি-ভাবে বেশ্যাবাড়িতে যেতে পারে। কামুকতার চেয়ে ধনের প্রতি লোভেই একজন বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করে এবং ধনের প্রতি লোভবশতঃই সে কুষ্ঠ ও অন্যান্য যৌনরোগগুলির জননীতে পরিণত হয় আর ঐ লোভের ফলেই সে যে কোনো-ভাবে বহু পুরুষের কাম-বাসনা পরিতৃপ্ত করতে বাধ্য হয়। কমিউনিজমে ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্থান নেই, তাই ব্যক্তিগত সম্পত্তির বদ-উপযোগেরও সম্ভাবনা নেই। কার্যত কমিউনিস্ট সমাজ-ব্যবস্থা বেশ্যালয়গুলির পরম

শত্রু। এইভাবেই কমিউনিস্ট সমাজে কুষ্ঠ এবং অন্যান্য গুপ্তরোগগুলিকে রোখা সম্ভব।

যদিও ধর্মের ধ্বজাধারীরা বেশ্যালয়গুলির চরম বিরোধী কিন্তু এদের বিরোধটা প্রায় পুরোপুরিভাবেই লোক দেখানো। এদের মধ্যে অনেকেই পূজাস্থলে বেশ্যার অস্তিত্বকে একটি বিশেষ জরুরী বলে বিবেচনা করেন, আর এদের মধ্যে কতজনের স্বর্গ-রচনা তো বেশ্যা ব্যতীত অসম্ভব, উর্বশী, অপ্সরা আর দেবদাসীরা যাদের চিন্তায় সবিশেষ জরুরী, তারা কীভাবে বেশ্যাবৃত্তি উঠে যাক—এটা চাইবেন? পুঁজিবাদ আর ব্যক্তিগত সম্পত্তি যে কীভাবে রাষ্ট্রের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক আর ঘৃণিত এই সমস্ত রোগগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করে, তার উদাহরণ স্বরূপ আমাদের দেশের রাজা-মহারাজা আর ধনী সম্প্রদায়ের দিকে একটু তাকালেই বোঝা যায়। এই সমস্ত লোকজনের কাছে বেশ্যা তো খাওয়া-দাওয়ার মতোনই একটি আবশ্যকীয় সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। রাজ-দরবারের পোষা রক্ষিতারা যে কোনো অবস্থাতেই নিয়মিত বেতন পেয়ে থাকে, যদি অন্যান্য রাজকর্মচারীদের বেতন ছ'মাসের ওপরেও বাকি পড়ে, সে ভি আচ্ছা! কিন্তু রক্ষিতাদের খোর-পোষের ব্যাপারে তো আর কোনো রকম কিপ্টেমী চলতে পারে না! রাজ-দরবারের থেকে প্রাপ্ত ঐ খোর-পোষ তো শুধু বেশ্যার ক্ষেত্রেই নয়, আরো অন্যান্য সাধারণ মানুষের কাছেও গুপ্তরোগ প্রচারের সহায়ক হয়ে দাঁড়ায়।

সুতরাং এটা এতক্ষণে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, কুষ্ঠরোগের এই মারাত্মক সমস্যা—যার দ্বারা সমগ্র মানব জীবন বিকৃত হতে চলেছে, তা' একমাত্র কমিউনিস্ট সমাজ-ব্যবস্থাতেই দূর হতে পারে। ধনের উপযোগ আর সন্তানের অবাধ উৎপাদন—এই দুটি ব্যাপারে ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতা দেওয়ার ফলেই জাতির মধ্যে দুরারোগ্য ব্যাধি, রাজরোগ আর ঘৃণ্য রোগের বৃদ্ধি। বর্তমান অবস্থায় যদি কোনো পুঁজিবাদী সরকার এই রোগগুলির হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে আইন-কানুনও তৈরী করে, তাহলেও তার প্রয়োগ শুধুমাত্র গরীব মানুষের ওপরেই হওয়া সম্ভব। ধনী শুধুমাত্র নিজধনের বলেই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আইনের আওতার বাইরে থাকতে পারে অথবা আইনের কব্জায় কখনো কখনো আসে না। কুষ্ঠরোগের প্রারম্ভিক অবস্থায় যখন একজন কুষ্ঠরোগীকে বীভৎস দেখায় না, অথচ সেই সময়েই রোগের বীবাণু সবচেয়ে বেশী ছড়ায়—সেই সময়েই একজন ধনী কুষ্ঠরোগী সহজেই আইনের আওতার বাইরে থাকতে পারে, আর একজন প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ধনী কুষ্ঠরোগী তো শেষ সময় পর্যন্ত অবাধভাবে সভা-সমাজ আর সব জায়গাতেই ঘুরে বেড়ায়। এই রকম লোকজন যে ঘৃণার পাত্রে পরিণত হোক, তা' মোটেই কাম্য নয়, তাঁদের

যন্ত্রণার উপশম এবং যতদুর সম্ভব সুখী জীবন প্রদান, রাষ্ট্রের কর্তব্য। কিন্তু তাঁর মতো হাজারটা রোগীর জন্মদানের স্বাধীনতা দেওয়াটা কখনোই তাঁদের প্রতি সঠিক সহানুভূতি প্রদর্শনের নিদর্শন নয়। কুষ্ঠরোগ ছাড়া আরো অনেক রোগ আছে, যেগুলির হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় যদিও এখনো পর্যন্ত অসম্পূর্ণ, তথাপি সন্ততি নিরোধ এবং পৃথকীকরণ দ্বারা এই রোগগুলির সংক্রমণের হাত থেকে পুরোপুরি বাঁচা যায়। যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগকে উদাহরণ স্বরূপ ধরা যেতে পারে, এই রোগের আক্রমণে পুরো পরিবারই সাফ হয়ে যেতে দেখা গেছে। এই রোগগুলিও বংশানুক্রমিক এবং সংক্রামক ব্যাধি। বর্তমান অবস্থায় এসব কিছু দেখে এবং জেনেও আমরা কিছু করতে অপারগ, কেন না সব অবস্থাতেই আমাদের কাছে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অতিশয় পবিত্র বস্তু! একটা ঘরে আগুন লেগে গাঁ সাফ হয়ে যাক, তবুও প্রতিবেশীর ঘরে আগুন লাগিয়ে হোলি খেলার স্বাধীনতা তো বন্ধ হতে পারে না!

দৈহিক রোগ ব্যতীত মানসিক রোগ সম্বন্ধেও অধিকাংশ চিকিৎসাবিদের রায় যে, মানসিক রোগও মূলত পৈত্রিক সূত্রেই আসে। বস্তুত আর্থিক বৈষম্য এবং পৈত্রিক রোগের প্রভাব যদি সমাজ থেকে দূর করে দেওয়া যায়, তাহলে জেলখানাগুলিও খালি হয়ে যাবে। একটি হিসেবে দেখা গেছে যে, অপরাধীর মধ্যে শতকরা নব্বই ভাগ আর্থিক চাপে পড়ে অপরাধী হয়, আর বাকি দশ ভাগের মধ্যেও সবাই মানসিকভাবে স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন অথবা তাৎক্ষণিকভাবে মানসিক ভারসাম্যতা হারিয়ে অপরাধী হয়। বর্তমানে ইংল্যাণ্ড-এর ন্যায় কিছু সরকার এই ধরনের ব্যক্তিদের জন্য সন্তান-নিরোধ আইন চালু করার কথা চিন্তা করছেন; কিন্তু এটা কী আপনি আশা করেন যে, ধনী এবং পয়সাওয়ালা লোকজনের ওপরেও এই আইন সমভাবে প্রয়োগ হবে? মানসিক রোগে যারা ভোগেন, তার মধ্যে অধিকাংশ তো এই সমস্ত লোকজনই।

পশুরা যাতে সু-সন্তান প্রসব করে, এই সম্বন্ধে বিগত একটি শতাব্দী ধরে নানা গবেষণা চলছে এবং এই ব্যাপারে বিশাল সাফল্য হয়েছে। বৈজ্ঞানিকদের গবেষণা তো এই পর্যায়ে পৌঁছেছে যে গর্ভাবস্থাতেই সন্তানের রং ইত্যাদি অনেক কিছুই সঠিকভাবে বলে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু বিগত শতাব্দী যাবৎ মানবজাতির অবস্থা কী দাঁড়িয়েছে? স্বাস্থ্য এবং অপরাধ সম্বন্ধীয় রিপোর্টগুলি অনুধাবন করলেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মানবজাতির শারীরিক এবং মানসিক অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে চলেছে।

কিছু হাসপাতাল আর জেলখানা বৃদ্ধি ছাড়া আর কী-ই বা হয়েছে?

এতে কী রোগের মূল কারণগুলি দূর হওয়া সম্ভব ? মানবজাতির উন্নতিকল্পে অন্যতম প্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু হচ্ছে, সু-সন্তান প্রসব এবং এটা করতে গিয়ে যা কিছু বাধা বিপত্তি তা' নির্দ্বিধায় সরিয়ে ফেলতে হবে। কিন্তু আজকের সমাজের শিরচূড়ামণি পুঁজিবাদী এবং তাদের পা-চাটা ধর্মের ঠিকেদারেরা কী এইসব প্রয়োগ এবং এই ব্যাপাবে স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করার সুযোগ দেবেন ? এরা তো এই কথাই বলবেন —"এ সবই তো ঈশ্বরের লীলা। স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক তো ধর্মের একটি বিশেষ অঙ্গ, এই ব্যাপারে কারুরই মাথা গলানোব অধিকার নেই। মানুষ তো আর পশু নয় যে, সন্তান প্রসবের ব্যাপারেও বৈজ্ঞানিক গবেষণাদি আর তার প্রয়োগ চলবে ? স্ত্রী-পুরুষের এই কোমল সম্পর্ককে যদি এইভাবে উলঙ্গ করে দেওয়া হয়, তাহলে সমাজে লজ্জা ইত্যাদি বস্তু বলে আর কী-ই বা থাকবে ? এই কথাগুলি বলেই যে এরা চুপ করে যাবেন, তা' নয়, এর বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তিকেই প্রয়োগ করতে কোনো দ্বিধা করবেন না। কিন্তু এদের এই অন্ধ বিরোধে কী ভয়াবহ পরিস্থিতিব কিছুটাও লাঘব হবে ? ভয়াবহতা তো ক্রমশই বেড়ে চলেছে এবং চলবে। যতদিন পর্যন্ত স্বয়ং মানবসমাজ এই ব্যাপারে দল বেঁধে এগিয়ে না আসবে, ততদিন পর্যন্ত এই রোগগুলির হাত থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই। মানব-সমাজকে এটা ভালোভাবে বুঝতে হবে যে, স্ত্রী-পুরুষের সংযোগেব ক্ষেত্রে দু'টি প্রশ্ন জড়িত; প্রথমত কামের পরিতৃপ্তি এবং দ্বিতীয়ত সন্তানেব উৎপত্তি। প্রথমটির ব্যাপারে আপনি নিজের খুশী মতোন যা ইচ্ছে কবলেও, দ্বিতীয়টিব সঙ্গে যেহেতু মানবসমাজ এবং আগত শিশু এই দু-এরই সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, তাই আপান যা খুশী তাই করতে পারেন না। বর্তমানে বিজ্ঞান তো এমন সব উপায় আবিষ্কার করেছে, যাতে সমস্ত ধরনের ইন্দ্রিয় সুখ বজায় রেখেও সন্তান উৎপাদনকে রোখা যায়। শরীর এবং মানসিক দুর্বলতা জনিত কারণে, সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির এই ধরনের জেদের কী অধিকার আছে ? আর এই ধরনের জেদকেই বা সমাজ কেন প্রশ্রয় দেবে ? যদি কারণগুলি বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলেও দেখা যাবে যে, এই ধরনের জেদেব পিছনেও ব্যক্তির স্বার্থ লুকিয়ে আছে। ব্যক্তির বার্ধক্য এবং রোগ ভোগের সময় দেখাশোনা এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তৈরী —এইসব কারণেই এই জেদ। কমিউনিস্ট সমাজে, রোগভোগের সময় এবং বার্ধক্যে তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের, আর ব্যক্তিগত সম্পত্তির তো কোনো প্রশ্নই নেই; সুতরাং এই সমাজে উপরিউক্ত কারণে সন্তান উৎপাদনের আগ্রহ থাকা অসম্ভব।

সপ্তম অধ্যায়

ধর্ম-ঈশ্বর এবং কমিউনিজম

ধর্ম অথবা সাম্প্রদায়িকতার স্বরূপটি কী? মানবজাতির শৈশব অবস্থার কিছু মানসিক দুর্বলতা এবং তার থেকে উৎপন্ন বিশ্বাস সমূহই হচ্ছে ধর্ম। যদি এর থেকে অধিক কিছু হয়, তাহলে তা' হচ্ছে—পুরোহিত আর শাসকদের তৈরী ধোঁকাবাজী, যার সাহায্যে তারা তাদের পোষা ভেড়াগুলিকে নিজ কব্জার মধ্যে আটকে রাখতেন। মানুষের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অদ্যাবধি ধর্মের বিভিন্ন অংশের পরিবর্তন হয়েছে, অনেক নাম পাল্টেছে, কিন্তু মূল অংশের কোনোরকম পরিবর্তনই হয়নি। যেমনটি ৫ হাজার বছর পূর্বেও ছিল, আজও ধর্ম—হাজার হাজার অন্ধ বিশ্বাসের পালক আর মানুষের মানসিক দাসত্বের সমর্থক। সূত্র একই, কেবল ভাষা বদলেছে। সেই ভূত-প্রেতওয়ালা ওঝা আর গুণীন, যাদের দেখলে আজকালকার শিক্ষিত শ্রেণী নাক সিঁটকোয়, কিন্তু সেই একই বস্তু যখন নতুন সাজে সজ্জিত হয়ে থিয়োসফিক্ ইত্যাদি গালভারি শব্দের সঙ্গে সায়েন্স তক্‌মা জুড়ে দিয়ে উপস্থাপিত করা হয়, তখন বহু বাঘা বাঘা চিন্তা-বুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষিত লোকজনই বিচার-বিবেচনা, বোধ-বুদ্ধি সব হারিয়ে ফেলেন।

যদি আপনি সিদ্ধ যোগের ইতিহাস এবং এর অতীত ও বর্তমান নেতাদের জীবনী মন দিয়ে পড়েন, তাহলেই বুঝতে পারবেন যে, সিদ্ধ যোগের পয়লা সারিতে হয় পাকা ধূর্ত অথবা বদ্ধ পাগলই পৌঁছতে পারে। ভারতবর্ষেও এই ধরনের সিদ্ধির চরমে উপনীত মহাপুরুষেরা অতীতেও ছিলেন এবং এখনো আছেন। এদের আচার-আচরণ ইত্যাদি একটু মন দিয়ে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন, এগুলো রাস্‌পুটিন্-এরই অল্পবিস্তর ছোট-বড় সংস্করণ।

কিছুদিন আগেও এক পবিত্র ধর্ম নগরীতে এক পরম ত্যাগী মহাপুরুষ বাস করতেন, এর স্থানের এমনই মাহাত্ম্য ছিল যে, মানুষ শুধু একবার তার জায়গাতে পৌঁছতে পারলেই হলো, তারপরই সবাই একবাক্যে স্বীকার করে নিতো যে, সত্যিই ইনি একজন সিদ্ধ-মহাপুরুষ। কিন্তু পরে ঘটনাটি কি দাঁড়াল? স্থানীয় লোকজনেরা ঐ মহাত্মারই রক্ষিতার দুই পুত্রের দিকে আঙ্গুল তুলে বলত —"মহাত্মার কী অপার মহিমা, শিষ্যদের দান ধ্যানের চোটে এই ছেলে দুটোর বড়লোক হওয়া কে আটকাবে!" এইরকম আর এক মহাত্মা অল্প কিছুদিন আগে মারা গেছেন, একে ভক্তবৃন্দ ভগবানেরই এক সাক্ষাৎ অবতার মনে করত, এর বিচিত্র বেশভূষা, আচার ব্যবহারে ভক্তবৃন্দের ভক্তিরস একেবারে উথলে পড়ত —এরই বা ভিতরের জীবনটা কী ছিল? এই মহাত্মাটি আগে যেখানে বসবাস করতেন সেখানে এক চাকরানীর সঙ্গে আশনাই-মহব্বত করে এক কেলেঙ্কারী ঘটিয়ে স্থানীয় জনসাধারণের হাতে মারধোর খেয়ে তারই মতোন আর এক মহাত্মার আশ্রয়ে পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন। এই ধরনের আরো শ'খানেক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারি। এইসব দেখে শুনে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কে সংশয় জাগে। ঐ সমস্ত ধূর্ত সাধু-পুরুষদের কথা না হয় বাদই দিলাম, এদের জীবনের মূল ব্রতই তো মানুষ ঠকিয়ে ঘি-রুটি খাওয়া। এইসব সিদ্ধ যোগীদের মধ্যে কেউ কেউ ধোঁকাবাজীর চেয়ে বেশী যদি কিছু জানেন, তা' হচ্ছে সম্মোহন ইত্যাদি কিছু মানসিক শক্তি, যার বলে এরা অনেক কিছুই উল্টোপাল্টা প্রচার করেন।

ধর্ম এবং ঈশ্বরের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। ঈশ্বর কী? এই সম্পর্কে বলা যায় যে, মানবজীবনের শৈশব অবস্থার ভয়ভীত অন্তঃকরণের কাল্পনিক সৃষ্টির এক বিকাশিত রূপ। মানুষ যখন বন্যাবস্থায় ছিল, যখন তার বুদ্ধির বিকাশ একটি সাধারণ শিশুর ন্যায় ছিল —তখন সে অন্ধকার, অপরিচিত স্থান ইত্যাদি এইসমস্ত কিছুকেই ভয় পেত। বিদ্যুৎ, আগুন ইত্যাদি শক্তিশালী পদার্থ তো তার কাছে ছিল আরো ভয়ের বস্তু, আর এইগুলিকেই সে দেবতা বলে কল্পনা করে নিলো। সেই যুগের বীর পুরুষেরাও মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে ঐ দেবমণ্ডলীতে সামিল হলো। প্রতিটি জাতিরই এই ধরনের বহু দেবতা ছিল, যাদের প্রভাব প্রতিপত্তি এবং প্রাধান্য নিয়ে জাতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগেই থাকত। এই ধরনের ঝগড়া এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার অস্তিত্ব জাতিগুলির নিজেদের মধ্যেও ছিল। পরবর্তীকালে মানবসমাজে সামন্ত এবং নৃপতিদের প্রভাবে ধীরে ধীরে 'সংসার নির্মাতা' এক ঈশ্বরের সৃষ্টি হলো এবং মানবজাতির মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের

গুণাবলীতে আরো অনেক কিছুই সংযোজিত হলো। এইভাবেই ঈশ্বরের উৎপত্তি। বস্তুত ঈশ্বর মানুষেরই মানস-পুত্র। এটা অনস্বীকার্য যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব —হোক না এর ভিত্তি কাল্পনিক, তথাপি এই ঈশ্বর বিশ্বাসের বলেই কত লোক পেয়েছিল আশা-ভরসা। কিন্তু এই কারণেই মানুষকে সহ্য করতে হয়েছিল বহু যাতনা আর লাঞ্ছনা। একেশ্বরবাদী ধর্মের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বহু দেবতায় বিশ্বাসী ধর্ম হাজার গুণ উদার, এদের দেব-দেবতারা সংখ্যায় অনেক থাকার ফলেই শ্রেণী নির্বিশেষে মানুষের সমাবেশ সহজেই হতে পেরেছিল। কিন্তু একেশ্বরবাদী ধর্মে, স্বল্প-সংখ্যক কিছু মানুষের একান্ত আপনার ঈশ্বর, যে সকল মানুষের হাতে পড়ে বিপন্ন হোক তা' মোটেই কাম্য নয়, এই রকমই তারা স্থির করেছিল। বিগত দু'হাজার বছরের একেশ্বরবাদী ধর্মের ইতিহাসে দেখতে পাবেন যে —সভ্যতা, কলা, বিদ্যা, বিচার স্বাতন্ত্র্য এবং সর্বোপরি মানুষের প্রাণ সব কিছুরই সবচেয়ে প্রধান শত্রু ছিল ধর্ম। ধর্মের আগুনে পুড়েছিল হাজার হাজার পাঠাগার আর কোটি কোটি বই। সৌন্দর্য সৃষ্টির বাস্তব রূপ —ভাস্কর্য, কত সুন্দর সুন্দর মূর্তি, স্থাপত্য, চিত্রকলা ইত্যাদি অনেক কিছুই বিনষ্ট করেছে, ঐ ধর্ম। হাজার হাজার বিদ্যান্বেষী বিদ্বানদের প্রাণে মেরে স্বাতন্ত্র্য বিচারের গলা টিপে মেরেছে ঐ ধর্ম। মানুষের মানসিক প্রগতির ধারাকে শুধু এক হাজার বছর ধরে আটকেই রাখেনি, উপরন্তু পূর্বপ্রাপ্ত সাফল্যের বহু কিছুই বিনষ্ট করেছে, ঐ ধর্ম। আর কোটি কোটি নির্দোষ নারী-পুরুষ এবং শিশুদের হত্যা? এসব কিছুই তো ছিল ধর্ম প্রচারের এক প্রধান হাতিয়ার। যে দেশেই এরা গিয়েছে, সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে আগুন আর তলোয়ার। প্রথমে তো এদের ফাঁসে ফেঁসে যাওয়া জাতিগুলি আফিমের মতো নেশায় ছিল আচ্ছন্ন, তাঁরা এটা খেয়াল করেননি যে, তাঁদের জাতীয় সংস্কৃতি, জাতীয় ধারা ইত্যাদি সবকিছুই বিনষ্ট হতে চলেছে। পরে যখন নেশার আচ্ছন্নতা কাটল, দেখলেন তাঁদের পূর্বার্জিত সাফল্য-কৃতিত্বগুলি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। জার্মান জাতির মধ্যেও খ্রীষ্টানদের একেশ্বরবাদের প্রবেশ তরবারির জোরে। ঐ সময়, পুরনো ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে জার্মান জাতির ব্যক্তিত্বকেও শেষ করে দেওয়া জরুরী মনে করা হয়েছিল। ধ্বংস করা হয়েছিল জার্মান লিপি, খুঁজে খুঁজে তাঁদের সাহিত্যকে পোড়ানো হয়েছিল। মন্দিরগুলিকে ভেঙ্গে দিয়েই খ্রীষ্টানরা ক্ষান্ত হয়নি, লাখ লাখ বিশাল ওক্ বৃক্ষকে কেটে সাফ করে দেওয়া হয়েছিল, পাছে না আবার ওক্ বৃক্ষকে পূজা করে তাঁরা ধর্মভ্রষ্ট হন! একেশ্বরবাদীদের এই ধরনের কার্যকলাপ শুধু এশিয়ার বুকেই নয়, আমেরিকার মায়া আর ওজো-র ন্যায় প্রাচীন সভ্যতার সংহারের মূলেও একেশ্বরবাদ।

ঈশ্বরের নামে যুগের পর যুগ, বছরের পর বছর এই ধরনের ভয়ঙ্কর অত্যাচার আর রক্তের নদী বইতে দেখেও যদি স্বয়ং ঈশ্বর আবির্ভূত না হন, তবে ঈশ্বরের অস্তিত্বহীনতার এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে ?

এটা অনেকেই বলবেন —ধর্ম আর ঈশ্বর এখন আগেকার ন্যায় ভয়াবহ রূপে নেই। কিন্তু সত্যিই কী তাই? সত্যি সত্যিই কী ঈশ্বরের বিষ দাঁত ভেঙে দেওয়া সম্ভব হয়েছে? অন্তত ভারতবর্ষ তো এখনো ধর্মের আঘাতে জর্জরিত, ধর্মান্ধ লোকগুলি খুন-খারাবী করেই চলেছে। আপনি বলবেন —এটা তো ধর্মের দোষ নয়, এ তো আধিপত্য এবং ধন-দৌলতের জন্যই হচ্ছে। খাঁটি কথা। একেশ্বরবাদীদের প্রতিটি বৃহৎ যুদ্ধের কারণগুলি যদি খতিয়ে দেখা হয়, তবে বোঝা যাবে যে, এর কারণ হচ্ছে —আধিপত্য এবং ধন-সম্পদের প্রতি লোভ। বস্তুত আধিপত্য আর ধন-সম্পদের প্রতি লোভ যদিও ধর্মের মূল, তথাপি অত্যন্ত চাতুরীর সঙ্গে মূল ব্যাপারটা চাপা দিয়ে সৌম্য এবং মোহময় শব্দের মোড়কে জনগণের সামনে ধর্ম উপস্থাপিত। আপনি যেভাবেই ধর্মের নোংরামীকে সাফ করার চেষ্টা করুন, শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতর করে ফেলুন —ধর্ম চিরকালই পুরাতনের পূজারী এবং ভবিষ্যতের যে কোনো প্রগতির বিরোধী. ভক্তি আর শ্রদ্ধার নামে ধর্ম আমাদের গলাতে ফাঁস পরানোরই চেষ্টা করে যাবে। আমাদের এই সমাজ-জীবনে প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে, আর এই পরিবর্তনের এমনই ধারা যে, অতীত চিরকালের জন্যই অতীত হয়ে যাচ্ছে এবং অতীত কখনোই বর্তমানের রূপ ধারণ করতে পারে না। এই পরিস্থিতিতে স্থিরতাবাদী ধর্ম কখনোই মানবজাতির প্রগতির সহায়ক হতে পারে না। দুনিয়ার এগিয়ে চলার গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদেরও চলতে হবে, কিন্তু ধর্ম আর ঈশ্বর সর্বদাই আমাদের গতিকে রুখবার চেষ্টা করে। আমরা যদি চলার পথে থমকে দাঁড়াই, তাহলে কী সংসারের গতির চাকা আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে? সামাজিক বৈষম্য লোপ, নিষ্কর্মা আর অনাহুত সন্তান নিরোধ, আর্থিক সমস্যাবলীর নতুনভাবে সমাধান —এ সমস্ত ব্যাপারেই যথাসাধ্য বিরোধিতা করে ধর্ম; আমাদের সমস্যাকে আরো গভীরে নিয়ে যাওয়া এবং প্রগতির বিরোধিতা —এ সবই তো ধর্মের পবিত্র কর্তব্য।

আপনি বলবেন —আপনি তো বিগত শতাব্দীর কথা বলছেন, তখন বড় বড় বহু বৈজ্ঞানিকই বিধর্মী ছিলেন, আর এখন তো কত প্রভূতযশা বৈজ্ঞানিকই সিধে রাস্তার পথিক এবং ধর্ম আর ঈশ্বরের প্রতি অকুণ্ঠ আস্থা জ্ঞাপন করেছেন। যদি আপনি ভিতরের রহস্য না জানেন, তাহলে আপনার এই ধরনের ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক, কিন্তু সত্যিই বেচারা বিজ্ঞানের এই ব্যাপারে কোনো দোষই নেই।

আজকের দুনিয়াটা তো সোজাসুজি দুটি শিবিরে বিভক্ত—একদিকে আছেন, যাঁরা ব্যক্তিগত আর্থিক স্বার্থকে সর্বদা অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষপাতী অর্থাৎ জেনে অথবা না জেনে, প্রকট রূপে অথবা অপ্রকট রূপে তাঁরা পুঁজিবাদের প্রতিই আস্থা জ্ঞাপন করেছেন; অপরদিকে আছেন, যাঁরা সমাজের কল্যাণ চান, আর সেই জন্যই কমিউনিজমের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। বিগত শতাব্দীতে নিশ্চয়ই এই ধরনের বৈজ্ঞানিক ছিলেন, যিনি ব্যক্তিগত আর্থিক স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষপাতী হওয়া সত্ত্বেও ধর্মের বিরুদ্ধে স্পষ্ট মতামত জানাতে দ্বিধা বোধ করেননি। কারণ, ঐ সময় কমিউনিজম-এর তত্ত্ব বাস্তবায়িত হয়নি, কমিউনিজমের সাফল্য সম্পর্কে প্রত্যয় গড়ে উঠেনি, কিন্তু আজ তো কমিউনিজম প্রমাণিত সত্য, এখন আর কমিউনিজমের তত্ত্বকে কিছু বিকৃত মস্তিষ্কের মগজী-মেহনৎ বলা যায় না। এবং এই কারণেই কমিউনিজমের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদ নানা ধরনের ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে, ভয় আর প্রলোভন দেখিয়ে বহু দুর্বল চরিত্রের বিজ্ঞানীদের তাদের পক্ষে নিয়ে গেছে। লেখকের ইংল্যাণ্ড প্রবাসকালে একজন প্রথিতযশা ব্যক্তি, নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত এক বৈজ্ঞানিক সম্পর্কে বলেছিলেন, "জানেন কী, অমুক মহাশয় কেন ধর্ম আর মিথ্যে বিশ্বাসের সপক্ষে প্রচারে খুব উঠে পড়ে লেগেছেন? এঁর বৈজ্ঞানিক মস্তিষ্কটির বারোটা বেজে গেছে। ইনি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন, সেই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে আপনি একভাবে অমুক ক্রোড়পতিরও বলতে পারেন, আর এই বৈজ্ঞানিক মহাশয় যেন তেন প্রকারেণ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকে একটি পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করেন।" অবশ্য আমি এটা মোটেই বলছি না যে, ধর্মবিশ্বাসী সব বৈজ্ঞানিকই এই প্রকৃতির। অনেকেই স্বয়ং পুঁজিপতি, তাই পুঁজির রক্ষার্থে মহান্ অস্ত্র ধর্মের পক্ষ গ্রহণ করেছেন, আবার অনেকেই আছেন, যাঁরা শ্রমজীবীর কঠিন জীবন সম্পর্কে অবহিত কিন্তু তাঁদের সমর্থনে সরাসরি যোগদানে ভীত। আবার কয়েকজন আছেন, তাঁরা যখন দেখেছেন—অতীতের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত মন নতুন চিন্তাধারাকে গ্রহণ করতে অসমর্থ, তখন তাঁরা একেবারে সোজাসুজি অপর শিবিরে অর্থাৎ নতুনের দলে যোগ দিয়েছেন। মানুষের আয়ুর প্রথম ৪০/৫০ বছরের আবহাওয়া এই রকমই ছিল যে, তখন অনায়াসে পারস্পরিক মত আর চিন্তার আদান-প্রদান সম্ভব ছিল, পরে গোধূলির কুয়াশায় তো কেবল অতীতের স্মৃতি, পুরাতন জিনিসই তার নজরে এল।

এইভাবেই আজ সারা দুনিয়ার বিচার ধারা দুটি শিবিরে ভাগ হয়ে গেছে; এই পরিস্থিতিতে কোনো মতামতই অন্ধভাবে আঁকড়ে ধরে চলা উচিত নয়।

আপনাকে আপনার বুদ্ধি আর চিন্তার স্বাধীনতা বজায় রাখতে হবে এবং বিচার বুদ্ধিকেই অন্তিম নির্ণায়ক বলে মানতে হবে।

ঈশ্বরের উৎপত্তি সম্পর্কে আমি আগেই আলোচনা করেছি, এখানে তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে তর্কের ঝড় তুলতে চাই না; কিন্তু এটা অবশ্যই বলব, ঈশ্বরকে মেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটাও মেনে নিতে হবে যে, সমাজে ঈশ্বরের ন্যায় একজন রাজা অথবা ঐ ধরনের কর্তা-স্থানীয় একজনের অবশ্যই থাকা উচিত, বিগত সহস্র শতাব্দী যাবৎ রাজারা স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবেই শাসন চালিয়েছেন। কমিউনিজম চায়, সমাজে সমস্ত প্রকারের ক্ষমতার অধিকারী হবে জনগণ। এইভাবেও জগৎ-সংসারের সমস্ত শক্তি কোনো শক্তিশালী ঈশ্বরের হাতে না সঁপে, প্রকৃতিতেই সমাবিষ্ট বলে বিবেচনা করে। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসবোধ, আমাদের বিভিন্ন কাজকর্মে বাধার সৃষ্টি করে। ঈশ্বর-চিন্তা এই শিক্ষাই দেয় যে, আমরা কোনো কিছুই স্বাধীনভাবে করবার মালিক নই। এই কারণেই বিভিন্ন ধর্ম,সন্তান নিরোধের ঘোরতর বিরোধী. কেন না ঈশ্বরের কাজকর্মে দখল নেওয়ার কোনো অধিকারই মানুষের নেই, যদি সত্যি সত্যিই জনসংখ্যা হ্রাস ঈশ্বরের কাম্য হয়, তাহলে তা' ঈশ্বরের কাছে মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়। গত বছরে আমি বেলুচিস্থান গিয়েছিলাম। পাহাড়ী জায়গা। ঘাস আর গাছ-পালার ছিটে ফোঁটা কোথাও নেই। ইচ্ছে অনুযায়ী ক্ষেত-খামারী করার মতোন সুযোগও সেখানে নেই। যাওয়ার পথে রাস্তায় একটি গ্রামে থেমেছিলাম, গ্রামবাসীদের দরিদ্রতার বর্ণনা সাধ্যাতীত। জিজ্ঞেস করে জানলাম, পঞ্চাশ বছর আগেও গ্রামে স্রেফ ৫টি পরিবারের বসবাস ছিল, আর এখন পরিবারের সংখ্যা ২০। স্থানীয় লোকজন কয়েক শতাব্দী আগেও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল এবং তাদের ধর্মভাই তিব্বতীদের মতোনই বহুপতি প্রথাকে মানতো। তিব্বতে, সমস্ত ভাইয়েরই একটি স্ত্রী হওয়ার পেছনে কারণটি হচ্ছে—জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভয়াবহতা থেকে রক্ষা পাওয়া। কিন্তু যখন এরা মুসলমান ধর্মে রূপান্তরিত হলো, তখন খোদার ওপর ভরসা রেখে বাচ্চার পর বাচ্চা পয়দা করতে লাগল। যখন আমার সঙ্গী জার্মান বন্ধুটি প্রশ্ন করলেন—"তোমাদের এখানে ক্ষেত-খামারীর এত অসুবিধে, বেঁচে থাকাটাই যখন এইরকম কষ্টের ব্যাপার, তাহলে কেনই বা এত শিশুর জন্ম দাও?" উত্তর মিলল—"যিনি (অর্থাৎ খোদা) শিশুদের এই জগৎ সংসারে পাঠান, তিনি কী এদের সামলাবেন না?" আমার বন্ধুটি বললেন—"হ্যাঁ, তিনি যদি না'ও সামলান, তবে অসুখ-বিসুখ, মহামারী, আকাল তো নিশ্চয়ই সামলাবে।" লাসা-র এক মুসলমান সহৃদয় ব্যক্তি, তাঁর বিশ্বাস এইভাবে ব্যক্ত করেছিলেন—"আমাদের ধর্ম অনুসারে, যদি মা-বাপের

অনেকগুলি সন্তান হয়, তাহলে আর হজ করার দরকার নেই।" হিন্দুরাও তো বলে —"অপুত্রস্য গতির্নাস্তি"।

এইভাবে আপনি যতই দেখবেন, ততই বুঝতে পারবেন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব আমাদের সকল প্রগতির পথেই বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মানসিক দাসত্বের এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় শিকল। শোষকশ্রেণীর কাছেও এটি একটি বিশাল অস্ত্র, কেন না, এর ভরসাতেই সে বলে —"ধনী আর গরীব, সবই তো তাঁর সৃষ্টি," "তিনি যা কিছু করেন, তা' মঙ্গলের জন্যই করেন," "তাঁর মর্জির ওপরই নিজেকে ছেড়ে দাও," "কে জানে? এই ইহজগতের কষ্টমৃত্যুর পর তিনি আপনার জন্য কত কী আনন্দের রেখে দিয়েছেন," "তিনিই যন্ত্র-চালকের ন্যায় সমস্ত প্রাণীকে চালাচ্ছেন," "মানুষ তো তাঁর হাতের পুতুল।" এই চিন্তাধারা কী আমাদের ভবিষ্যতের মালিক বানিয়ে দেবে?

আপনি নিশ্চয়ই এই তর্ক বাধাবেন না —যদি ঈশ্বর না-ই থাকেন, তাহলে এই জগৎ-সংসারটা সৃষ্টি করলেন কে? নিশ্চয়ই! সমস্ত কিছু সৃষ্টির জন্যই কী সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন আছে? যদি তা'ই হয়, তাহলে ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তা কে? যদি তিনি স্বয়ম্ভূ হন, তাহলে এই ব্যাখ্যাই প্রকৃতি সম্পর্কে কেনই বা মানবো না?

আপনাকে অবশ্যই এটা খেয়াল রাখতে হবে যে, পুঁজিবাদীর কাছে ঈশ্বর ভীষণ প্রয়োজনীয়। যদি ঈশ্বরের চিন্তার অস্তিত্ব আগে থেকেই না থাকত, তাহলে তো আজ নিজ প্রয়োজনেই পুঁজিবাদ ঈশ্বরের আবিষ্কর্তা হতো। এই কারণেই শোষক-শ্রেণীর প্রতিপালিত বহু দুর্বলচিত্ত বুদ্ধিজীবী আর বৈজ্ঞানিকেরা, ধর্ম এবং ঈশ্বরের সমর্থক।

যদি ভারতবর্ষের আলোকে দেখা হয়, তাহলে তো যতদিন ধর্ম আর ঈশ্বর থাকবেন, ততদিন শান্তি আর স্বাধীনতার স্বপ্ন —দূর অস্ত।

অষ্টম অধ্যায়

নারী-স্বাধীনতা এবং কমিউনিজম

সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই অধিকাংশ পুরুষেরা পরাধীনতার মধ্য দিয়েই জীবন কাটাচ্ছে, কিন্তু তুলনামূলকভাবে সমাজে নারীজাতির অবস্থা আরো সঙ্গীন। "গরু, ভেড়া, শূদ্র আর নারী, এগুলি সব চরাতেই হয়"—এটি তো আজ সর্বমান্য প্রবাদে পরিণত। "নারীজাতি কোনোভাবেই স্বাধীনতার উপযুক্ত নয়"—(পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে। পুত্র রক্ষতি বার্ধক্যে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি)—সুতরাং, তাদের তো দাসত্বের কবচ দিয়েই দেওয়া হয়েছে। কয়েক শতাব্দী আগেও ইওরোপের খৃষ্টান ধর্মযাজকেরা, "নারীদের মধ্যে আত্মা নেই,"—এই কথাটি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন। হিন্দুধর্মে, স্ত্রী স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী বলে স্বীকৃত এবং স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একই চিতায় 'অর্ধাঙ্গ' স্ত্রীকেও জীবন্ত অবস্থায় পুড়িয়ে মারা হতো, বিগত শতাব্দীতেও প্রতি-বছর হাজার হাজার বিধবা নারীকে ভারতবর্ষের বুকে এইভাবে মরতে দেখা গেছে। কিন্তু এই নিয়মের প্রয়োগ, অন্য অর্ধাঙ্গ স্বামীর প্রতি কখনোই করা হয়নি! বস্তুত প্রত্যেক দেশেই পুরুষের জন্য নারীর থেকে ভিন্ন আইন এবং ব্যবস্থা প্রচলিত।

হাজার হাজার বছর ধরে নারীদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের এক আবহাওয়া গড়ে তোলা হয়েছে। ধর্ম, আচার, সমাজ সব বিষয়েই নারীর জন্য পুরুষ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন নিয়ম তৈরী করা হয়েছে। যাতে তার সঠিক বিচার-বিশ্লেষণ শক্তি জাগ্রত না হয়, এই উদ্দেশ্যে ছোটবেলা থেকেই তার ভেতর বিভিন্ন প্রকারের ধার্মিক নিয়ম, আচার-বিচার ইত্যাদি ঢুকিয়ে দিয়ে এক 'ধার্মিক-কট্টর'-এ পরিণত করা হয়েছে। এবং আজ পর্যন্ত অনেক দেশেই নারীকে শিক্ষা থেকে

সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। পর্দা-প্রথার মতোন অসহনীয় প্রথাকেও এদের জন্য বিশেষভাবে তৈরী করা হয়েছে এবং ধর্ম ও বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের সাহায্যে এই প্রথাকে জোরদার করে তুলেছে। সবচেয়ে মারাত্মক গোলামীর শিকল, আর্থিক পরাধীনতার শিকল তো তার পায়ে পরানোই রয়েছে। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে বিগত শতাব্দী থেকেই নারী-স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু হয়েছে এবং কিছুদিন যাবৎ ভারতবর্ষেও এই আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছে। তথাপি যেভাবে নারী স্বাধীনতার কথা বলা হচ্ছে, সেইভাবে কী সত্যিই এই আন্দোলন সাফল্যের মুখ দেখতে পাবে? স্বাধীনতা—স্বাধীনতা বলে চিৎকার করলেই স্বাধীনতা পাওয়া যায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে আর্থিকভাবে পরাধীন থাকছে, যতক্ষণ পর্যন্ত বিবাহই তার জীবন নির্বাহের পেশা থাকবে—ততক্ষণ এই আন্দোলন ব্যর্থ হতে বাধ্য। আর্থিক স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে, যাতে জীবিকার জন্য নারীকে অন্যের মুখাপেক্ষী হতে না হয়। ভারতবর্ষে তো সামাজিক পক্ষপাতিত্ব এবং অত্যাচারের ইচ্ছা থাকার ফলে, সুযোগ থাকা স্বত্ত্বেও নারীকে এই স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতেও এই ব্যাপারে খুব একটা স্বাধীনতা নেই। ফ্যাসিষ্ট জার্মানীতে তো আইন করে নারীর চাকরী করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে, যুক্তি—বিবাহের মতো একটা পেশা তো নারীর আছেই, আবার একই সঙ্গে দুটি পেশা কেন তার জন্য থাকবে?

যদি নারী স্বয়ং রুজি-রোজগারে অংশ গ্রহণ করে; খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদির জন্য পুরুষের কাছে হাত পাততে না হয়; প্রসবকালে, রোগে এবং বৃদ্ধ বয়সে স্বামী এবং পুত্রের মুখাপেক্ষী না হতে হয়; তবেই সে আর্থিকভাবে স্বাধীন হতে পারে। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় কী এটা সম্ভব? এতে শঙ্কা নেই যে, পুঁজিপতি তার কারখানায় নারীকে কাজ দেয় এবং এই বলে গর্ব করে—আমরা প্রাচীন কালের পক্ষপাতকে হটিয়ে দিয়ে নারীদের স্বাধীনভাবে রুজি রোজগারের সুযোগ করে দিতে চাই। কিন্তু এটা তো তাদের একটা চাল, তারা শিশু আর নারীকে এই জন্যই কাজে নেয় যে, তাদের মজুরীর হার পুরুষ অপেক্ষা কম। ইউরোপের দেশগুলিতে, কোনো একটি কাজের জন্য পুরুষ যদি তিনটাকা মজুরী পায়, তাহলে ঐ একই কাজের জন্য নারী পাবে দেড়টাকা। এইভাবেই অধিক সংখ্যায় নারী শ্রম ব্যবহারের ফলে পুরুষেরা বেকার হয়। আমরা আগেই আলোচনা করেছি, কীভাবে পুঁজিপতি নিজস্বার্থে কোটি কোটি মানুষকে বেকারে পরিণত করে। কিছু সংখ্যক নারীকে কাজে নেওয়ার উদ্দেশ্য, শ্রমের অধিকাংশই লুণ্ঠন করা।

একমাত্র কমিউনিস্ট সমাজ-ব্যবস্থাতেই নারীজাতির প্রকৃত স্বাধীনতা-প্রাপ্তি

সম্ভব। কমিউনিজম চায়, সমাজের সর্বক্ষেত্রে নারীর সমান অধিকার এবং শুধু তাই নয়, এই ব্যবস্থা আর্থিকভাবেও তাকে সর্বাঙ্গীন স্বাধীন করে তুলতে চায়। প্রতিটি নারী যাতে নিজের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করতে পারে, এই চিন্তাধারা কমিউনিজমেই আছে এবং এইভাবেই তাদের পুরুষের সমকক্ষ হওয়ার সুযোগ থাকবে। কমিউনিস্ট সমাজ-ব্যবস্থায় যন্ত্রের ব্যবহার অধিক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে হয় না। যাতে মানব-জীবনের উপযোগী সামগ্রী দ্রুত ও সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় এবং জীবনের প্রকৃত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া যায়, কমিউনিজম তারই সুযোগ করে দিতে চায়। এই ব্যবস্থায় অফিস-কাছারী থেকে শুরু করে সেনা-বিভাগ পর্যন্ত সব জায়গাতেই নারীর অবাধ প্রবেশাধিকারের উদ্দেশ্য কখনোই শ্রমের অধিক লুণ্ঠনের জন্য নয়। এর উদ্দেশ্য, নারীজাতির পূর্ণ স্বাধীনতা এবং তার বিকাশ। সমাজবাদী দেশই (যদিও আদর্শে পৌঁছতে আরো অনেক দেরী আছে) উপবিউক্ত আলোচনার জীবন্ত উদাহরণ। সেখানে নারীজাতিকে পুরুষের সমান কাজকর্ম এবং বেতন পাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। প্রসবের পূর্বে এবং পরে দুর্বল অবস্থায় তিনমাস সবেতন ছুটির আইন চালু করা হয়েছে, এইভাবেই তার রোগের এবং অসমর্থতার সময় রাষ্ট্র তার সম্পূর্ণ ভরণ-পোষণের ভার নেয়। এই ব্যবস্থা শুধু পুঁজিবাদের হাতের বাইরেই নয়, এই ব্যবস্থা গ্রহণের কিছু কালের মধ্যেই তার নাভিশ্বাস উঠতে পারে; কোনো রকম কাজ না করিয়েই পুরো বেতন—এই চিন্তা তো একমাত্র তার কাছে মৃত্যুশয্যার চিন্তা।

অনেকেই বলবেন—"এই ধরনের আর্থিক-স্বাধীনতা যদি নারীকে দেওয়া হয়, তাহলে তো আর সংসারে পারিবারিক সুখ বলে কিছু থাকবে না। মাতা পিতার প্রতি সন্তানের পবিত্র কর্তব্য, শ্রদ্ধা এ সবই তো অতীতের কথায় পরিণত হবে। স্ত্রী-পুরুষের সামাজিক জীবনে ঘটবে এক ভয়াবহ বিপ্লব, আর মানব-জীবন পরিণত হবে পশুজীবনে"। —এইসব কথাবার্তা তো তাঁরাই বলেন যাঁদের অভিধানে নারীর ব্যক্তিত্ব বলে কোনো শব্দ নেই, এঁরা তো সব কিছু জেনে-শুনেই এই ধরনের কথাবার্তা বলেন। বাস্তবিকভাবেই এঁদের চাহিদা, নারীর উপর পুরুষের সীমাতিক্রান্ত আধিপত্য এবং এই উদ্দেশ্যে যদি নারীকে ছাগলের মতোন বলি দেওয়া হয়, তাতেও এঁদের আপত্তি নেই। কমিউনিস্টরা 'মানব-জীবন' এবং 'পশু-জীবন'—ইত্যাদি শব্দে ভীত নয়, কেন না তাঁরা জানেন, পুঁজিবাদী সমাজে যে পরিমাণ পশু-জীবন আছে, তার এক শতাংশও কমিউনিস্ট সমাজ-ব্যবস্থায় প্রবেশের সম্ভাবনা নেই। শুধু ধন-সম্পদের জোরেই ধনীরা কী সমাজে রোজ লাখ লাখ নারীর ওপর কাম-বাসনা চরিতার্থ

করছে না ? যত সব ধর্ম-ধুরন্ধর, সদাচারের ঢাক পেটানো রাজা-মহারাজা, বাদশাহ, নবাবদের যৌন-জীবন এবং হারেম —ঐ পশু-জীবনের সবথেকে বড় আড্ডাখানা নয়! 'সদাচার'-এর ঢাক পেটানেওয়ালা ঐ সমস্ত সদাচারীদের অন্দরের জীবনের নোংরামী তো পুতিগন্ধময় আবর্জনার মতো, স্রেফ শ্বেতশুভ্র চাদরে আচ্ছাদিত —কাউকে এইভাবে গালাগালি দেওয়া বোধ হয় ঠিক নয়, যদিও এইসব গালাগালির প্রতিবাদের ক্ষমতা পুঁজিবাদের পোষা দাসগুলো আর শিষ্য দলেরও নেই।

কমিউনিজম চায় —নারী, পুরুষ এবং সমাজে কেউ কাউকে ধোঁকা এবং প্রবঞ্চনা না করুক। কিন্তু কমিউনিজম এটাও জানে যে, প্রকৃত প্রেম এক পক্ষকে পঙ্গু বানিয়ে, কিংবা টাকা পয়সা দিয়ে কিনে, অথবা ইচ্ছা-বিরুদ্ধ সমাজ বা ব্যক্তিকে ভয় দেখিয়ে সম্ভব নয়। বাস্তবিক প্রেমের স্থান তো কমিউনিস্ট সমাজ-ব্যবস্থাতেই সম্ভব; কেন না সেখানে প্রলোভন আর বলাৎকারের সমাবেশ নেই।

এইভাবেই নারী-স্বাধীনতা একমাত্র কমিউনিস্ট সমাজ-ব্যবস্থাতেই সম্ভব, কেন না এই সমাজে সমস্ত স্বাধীনতার জননী আর্থিক-স্বাধীনতা নারীকে দেওয়া হয়, ফলে সে স্বাধীনতার বাধাগুলিকে অর্থাৎ ধর্ম, ঈশ্বর, সমাজ কোনো কিছুকেই পরোয়া করে না। এই সমাজে নারীর কাছে বিবাহ কখনোই জীবন-নির্বাহের পেশা হয়ে দাঁড়ায় না। তারা বুঝতে পারে যোগ্যতার প্রশ্নে নারী কোনো অংশেই পুরুষের থেকে কম নয়। 'আদর্শ-মাতা', 'নারীর পবিত্র কর্তব্য', 'পতিব্রত ধর্ম' —ইত্যাদি শব্দের জালে সে আর আবদ্ধ থাকে না।

নবম অধ্যায়

হিটলার, মুসোলিনী এবং কমিউনিজম

যন্ত্রের ফলে উদ্ভূত মানব-জীবনের বর্তমান সমস্যাবলী সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে, এবং এই সমস্যাবলীর সমাধান যে কমিউনিস্ট সমাজ ব্যবস্থাতেই একমাত্র সম্ভব, সে কথাও বলা হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত পুঁজিবাদীদের দৃষ্টিতে কমিউনিজম একটি কাল্পনিক-স্বপ্ন বলেই বিবেচিত ছিল, সেই কারণেই কমিউনিজমের তত্ত্ব একটি মস্তিষ্কের ব্যায়াম এবং হাসি-ঠাট্টার বস্তু ইত্যাদি বিবেচনা করে কমিউনিজমের প্রতি সে গভীরভাবে মনোযোগ দেয়নি। কিন্তু যখন পৃথিবীর বুকে এর বাস্তব প্রয়োগ ঘটতে দেখল, অতিশয় সম্পন্ন একটি দেশে সমাজবাদী জীবন গড়ে উঠতে দেখল, তখন পুঁজিবাদ পরিস্থিতিকে গভীরভাবে মূল্য দিতে শুরু করল এবং আত্মরক্ষার্থে এক নতুন রূপ ধারণ করল। ইটালীতে মুসোলিনীর ফ্যাসিবাদ আর জার্মানীতে নাৎসী-বাদই হচ্ছে পুরনো পুঁজিবাদের নবতম রূপ। এটা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে পড়ল যে, সব দেশেই কমিউনিজমকে রোখবার জন্য পুঁজিবাদকে এই ধরনের কোনো রাস্তা অবশ্যই ধরতে হবে। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে, বিগত শতাব্দী যাবং পুঁজিবাদের সম্পর্কে এতই বদনাম রটে গেছে যে, স্বয়ং পুঁজি-পতিও ঐ নামে ইতস্তত বোধ করে। এই জন্যই মুসোলিনী বলে—"ফ্যাসিবাদ পুঁজিবাদের দাস নয়।" হিটলার তার দলের নাম দিয়েছে 'নাৎসী' অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় সমাজবাদী দল। এই কারণেই এই মতবাদের সমর্থকেরা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে বলেন—"আমাদের মতবাদকে আপনি পুঁজিবাদ বলতে পারেন না। বর্তমান সমস্যাবলীর সমাধান যেমনভাবে সমাজবাদ পেশ করছে, আমরাও ঐ ধরনের এক সমাধান পেশ করছি।" আচ্ছা! তাহলে দেখাই যাক, যন্ত্র আর

পুঁজিবাদ থেকে উদ্ভূত আমাদের সমস্যাগুলির সমাধান এরা কতটা করতে পারে? আমরা এই সমস্যাগুলিকে সোজাসুজি দু'ভাগে ভাগ করতে পারি, প্রথমত, দেশের আভ্যন্তরীণ বেকারী —জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা এবং দ্বিতীয়ত, সমাজ-জীবনের মাথার ওপর সর্বদা লটকে থাকা ভয়াবহ যুদ্ধের তরবারি। ফ্যাসিবাদ এবং নাৎসীবাদ উভয়েই যুদ্ধের পরম ভক্ত, এদের চিন্তায় যুদ্ধ ব্যাপারটা হচ্ছে, মানবজাতির হিতার্থে অত্যন্ত আবশ্যকীয় এবং পবিত্র বস্তু। মুসোলিনীর ফ্যাসিবাদ সর্বোপরি জাতীয়তাবাদী, তার কাছে ইটালি জাতি এবং তার স্বার্থই সর্বাধিক মূল্য পায়। কোনো একটা সময়, মুসোলিনী নিজেই জার্মানীর নাৎসীবাদের অন্যতম সমর্থক এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং নাৎসীবাদকে ফ্যাসিবাদেরই জার্মান সংস্করণ বলে গর্ব বোধ করতেন। কিন্তু যখন জার্মানীতে নাৎসীবাদ অধিকার গ্রহণ করল এবং একজাতি একভাষার আওয়াজ তুলে অষ্ট্রিয়াকে নিজ অধিকারে আনতে চাইল, তখন মুসোলিনীর মাথাটা খারাপ হওয়ার উপক্রম হলো। ইটালীর পত্র-পত্রিকাগুলি নাৎসীদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগল। এবং যখন নাৎসীরা অষ্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার ডলফসকে হত্যা করল, তখন তো মুসোলিনীর বিরোধীতাটা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল। এটা ছিল অনিবার্য, কেন না ফ্যাসিবাদ আর নাৎসীবাদ উভয়েই জাতীয়তাবাদকে সর্বোপরি বলে শুধু মানেই না, উপরন্তু অন্যান্য জাতিগুলির বিনাশ অথবা দাসত্বের দ্বারা যে কোনো উপায়েই নিজ রাষ্ট্রের বিস্তার এবং দখল করতে চায়। ফ্যাসিবাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল, ইটালীর জনসংখ্যাকে প্রচণ্ড গতিতে বৃদ্ধি করা, এবং শুধুমাত্র কৃষ্ণকায় জাতিগুলিকেই নয়, যুগোশ্লাভিয়া ইত্যাদি প্রতিবেশী দেশ এবং জাতিগুলির অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করে নিজ রাজ্যের বিস্তার। এদের ইচ্ছা তো তখনই পরিপূর্ণ হতে পারে, যখন পৃথিবীর সমস্ত জাতিগুলি ইটালীয়ান জাতির জন্য ভূ-মণ্ডলটাই খালি করে দেবে। সুতরাং এভাবেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যুদ্ধকে অক্ষয় আর অমর রাখবার জন্য এটাই সর্বোত্তম রাস্তা। যুদ্ধ তো এখন আর শখের ব্যাপার নয়, এখন বিজ্ঞান তাকে এমনই ভয়াবহ করে তুলেছে যে, সমস্ত জাতিগুলির এবং সভ্যতার বিলোপ সাধনে যুদ্ধই যথেষ্ট।

বৈদেশিক নীতি এবং পৃথিবীর দেশগুলির সঙ্গে চালচলনে নাৎসীবাদের রূপ ফ্যাসিবাদের চেয়ে অনেক সুস্পষ্ট। হিটলার তার বই, 'আমার যুদ্ধ'-এ লিখেছেন—"সত্যি কথা তো এটাই, শান্তির প্রকৃত আদর্শ সেই দিনই বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব, যে দিন মানুষ এই ইহসমাজের প্রতিটি ইঞ্চি জয়লাভ করতে সমর্থ হবে এবং একমাত্র মালিক হতে পারবে..." (পৃঃ ৩১৫), "রাষ্ট্রের আন্তরিক উদ্দেশ্য তো এটাই হওয়া উচিত, যেন সে দৃপ্ত তেজের সঙ্গে তলোয়ার

চালাতে পারে, এবং এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা করা উচিত, যাতে সে ভালোভাবে এবং খুবই ভালোভাবে চালাতে পারে ...” (পৃঃ ৬৮৯), “যে সন্ধি বা মিত্রতা যুদ্ধের আলোকে না হয়, তা ব্যর্থ হতে বাধ্য..., পৃঃ ৭৪৯)।”

নাৎসীবাদ তো উগ্র জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে আরো একধাপ এগিয়ে আছে। তার দৃষ্টিতে শুদ্ধ আর্য অর্থাৎ পিতা-মাতার ক্ষেত্রে কয়েক পুরুষে অন্য কোনো জাতির সংস্পর্শে জাত রক্ত-মিশ্রণ হয়নি, এমন হওয়াটা একান্তই জরুরী ব্যাপার এবং তার অভিধানে জার্মানী ব্যতীত অন্য কোনো দেশেই, এমন কী ইওরোপের দেশগুলিতেও শুদ্ধ আর্য-র অস্তিত্ব নেই। এরা শুধুমাত্র অন্যান্য জাতির সঙ্গে বিবাহ এবং অন্যান্য আত্মীয়তার কোনো সম্পর্কই ছিন্ন করতে চায় না, উপরন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী বসবাসকারী জার্মান ইহুদীদের দেশ থেকে বিতাড়িত করে এক জঘন্য চিন্তার পরিচয় জ্ঞাপন করেছে। নাৎসীবাদও জার্মান জাতির জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে এক পবিত্র কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা করে। বিবাহেচ্ছু লোকজনদের সরকারী তহবিল থেকে দেওয়া হয় শত শত টাকার উপহার। যতক্ষণ বিশ্বশান্তির প্রশ্ন থাকছে—ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদ এরা উভয়েই মানবজাতির সবচেয়ে প্রধান শত্রু বলে গণ্য হবে।

নিজ নিজ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই দুই মতবাদের কিরূপ প্রয়োগ করা হয়েছে, এইবার তার দিকে একটু তাকানো যাক। এই দুই মতবাদই কায়েম রাখতে চায়; শোষক আর শোষিতের সম্পর্ক, লুঠেরা আর লুন্ঠিতের সম্পর্ক অর্থাৎ পুঁজিপতি আর শ্রমজীবীর সম্পর্ক। যখন কমিউনিজম-এর বিজয় পতাকা আকাশে পত্‌পত্‌ করে উড়ছে, তখন ভীতত্রস্ত পুঁজিপতিরাই টাকার থলি নিয়ে হিটলার আর মুসোলিনীকে সফল করতে উদ্যোগী হয়েছিল। শ্রমজীবীদের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সংস্থাগুলির চিতার ছাই-এ প্রতিষ্ঠিত, পুঁজিপতির ধন-দৌলতে পোষা ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদ, পুঁজিবাদ ব্যতীত আর কী হতে পারে?

আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, পুঁজিবাদে একমাত্র ব্যক্তিগত মুনাফার উদ্দেশ্যেই যন্ত্রের ব্যবহার হয়, কিন্তু কমিউনিজম-এ রাষ্ট্রের প্রয়োজনে যন্ত্রের ব্যবহার করা হয়। নাৎসীবাদ কখনোই শোষক আর শোষিতশ্রেণীর বিভেদ দূর করতে চায় না, উপরন্তু বৃদ্ধি করতে চায়। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে হিটলার তার নিজের দলের দু'শো জন মানুষকে হত্যা করেছে, এরা নাকি চিন্তার ক্ষেত্রে একটু আধটু কমিউনিস্ট ঘেঁষা ছিল।

যেহেতু নাৎসীবাদ মনে করে নারীজাতির একমাত্র পেশা বিবাহ, তাই নারীর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে আর্থিক-স্বাধীনতা এবং স্বতন্ত্র জীবিকা উপার্জন, এই উপায়েই তারা বেকার সমস্যা সমাধান করতে চায়। এরা

ঘোষণা করেছে —নারীজাতির স্থান কারখানা অথবা অফিস-কাছারীতে নয়, তাদের প্রকৃত স্থান গৃহে গৃহিণীরূপে এবং মাতারূপে। বহু সংগ্রামের পর শতাব্দী কালের অর্জিত নারীজাতির স্বতন্ত্রতার অধিকার কলমের এক খোঁচায় এরা ছিনিয়ে নিতে চায়।

যে কোনো প্রগতিবিরোধী দলের কাছেই ধর্ম এবং ঈশ্বরের দোহাই এক বিশেষ লোভনীয় এবং লাভজনক বস্তু, এই দুই মতবাদের ক্ষেত্রেই এই কথা প্রযোজ্য। হিটলারের শাসনে তো ছাত্র-ছাত্রীদের এই প্রার্থনা করতে বাধ্য করা হয় —"হে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর! আমাদের পবিত্র শাস্ত্রগুলিকে জয়যুক্ত করো। আমাদের আশীর্বাদ করো এবং আমাদের বলে দাও যে, আমরা স্বাধীনতার অধিকারী। হে ঈশ্বর! আমাদের পবিত্র শাস্ত্রগুলির বিজয় গৌরব দাও।" পোপ্-এর হুকুমনামার মতো হিটলারও হুকুমনামা পেশ করে, কার্ল মার্কস্-এর লেখাই নয়, ডারউইন-এর বিবর্তনবাদও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা থেকে বাদ দিয়েছে।

ফ্যাসিবাদ আর নাৎসীবাদ দুই মতবাদই প্রগতিবিরোধী, গতির চাকাকে উল্টোদিকে নিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী, নারী, শ্রমজীবী এবং পরাধীন জাতিগুলির স্বাধীনতার ঘোর শত্রু এবং যুদ্ধাগ্নি সদা সর্বদা বজায় রাখার পক্ষপাতী। যেখানে যন্ত্রের প্রয়োগ ব্যক্তিগত মুনাফার উদ্দেশ্যেই হয় এবং যেখানে শোষকশ্রেণীর অবস্থান অনিবার্য, সেখানে বেকারী সমস্যা সমাধানের কোনো আশা রাখাটাই অন্যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চার বছরের ইতিহাসের মধ্য দিয়েই ফ্যাসিবাদ আর নাৎসীবাদের আসল চেহারাটা সকলের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

যাতে সমাজবাদী রুশ দেশের সঙ্গে এরা যুদ্ধে মেতে ওঠে, তাই ইংল্যাণ্ডের স্বার্থান্ধ পুঁজিপতিরা নানাভাবে এদের মদত জুগিয়েছিল। কিন্তু ঘটনাটা একটু অন্য ধরনের ঘটল, তারা প্রথমেই এদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অবশেষে দশ বছরের সমস্ত পরিকল্পনা এবং ষড়যন্ত্রকে ভুলে গিয়ে পুঁজিপতি দেশগুলির মধ্যে ইংল্যাণ্ড আর আমেরিকাকে নিজের প্রাণ বাঁচাবার তাগিদেই সোভিয়েট রাশিয়ার সংগে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হতে হলো।

দশম অধ্যায়

কমিউনিজম এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা

কমিউনিজম কী চায়? ১ শোষক এবং শোষিতের পার্থক্য ঘুচিয়ে উৎপাদনের সামগ্রী (যন্ত্র, কাঁচামাল ও জমি) এবং উৎপাদিত বস্তুর মালিকানা ব্যক্তিকে নয়, সমাজকে দেওয়া; ২] যোগ্যতানুসারে সকলকে দিয়েই কাজ করানো; ৩] যন্ত্রের সাহায্যে জীবন-নির্বাহের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উৎপাদনের ফলে প্রাপ্ত অবকাশ এবং মানসিক বিকাশের জন্য অবসর ইত্যাদির সমবণ্টন।

উপরিউক্ত ১নং ও ২নং প্রকরণ দেখে অনেকেই বলে ওঠেন: (ক) আহ্! তাহলে তো ব্যক্তি স্বাধীনতার পরম শত্রু হচ্ছে কমিউনিজম। কমিউনিজমের নিকট ব্যক্তি যন্ত্রেরই সমতুল, ফলে সমাজের হাতের পুতুল ছাড়া ব্যক্তি আর কিছুই নয়।

(খ) মানসিকভাবে সবার যোগ্যতা সমান নয়, এইভাবে একটা লাঠি নিয়েই সবাইকে হাঁকালে তো বিশেষ প্রতিভার হত্যা করা হবে এবং মনুষ্য সমাজ, ঐ সমস্ত প্রতিভাবানদের সেবা থেকে বঞ্চিত হবে।

(গ) ৩নং প্রকরণে এ'ও বলা হয়েছে, সমস্ত শ্রমেরই পারিতোষিক সমান। 'সব ধানই আউস ধান ?' 'মুড়ি-মুড়কীর সমান দর'—এ রকম হলে কেউ কী আর অধিক মূল্যবান শ্রম এবং অধিক যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করবে? অরণ্যে সব বৃক্ষই তো সমান হয় না! দেবদারুর মতোন শ' শ' ফুট উঁচু গাছ এবং তৃণসম ছোট গাছও হয়। যদি প্রকৃতি সবাইকে সমান খাদ্য, সমান হাওয়া জল-রৌদ্র দিত, তাহলে অরণ্য জগতে এই অসামঞ্জস্য কী থাকত? সুতরাং, প্রতিভা এবং যোগ্যতার প্রশ্নে কমিউনিস্ট ভাবনা-চিন্তা সামাজিকভাবে হানি কারক।

(ঘ) এটা মোটেই সম্ভব নয় যে, মানুষ অচেতন বস্তুর মতোই একঘেয়ে

নিয়মতান্ত্রিক জীবনে আবদ্ধ হবে। চেতনার অর্থই হচ্ছে স্বতন্ত্র বিচার, এই স্বাধীনতার ফলেই মানুষ চারুকলা, সুসাহিত্য এবং বিজ্ঞানের নির্মাণে সফল হয়েছে।

(ঞ) কমিউনিস্টদের মধ্যে মানব প্রকৃতির জ্ঞান মোটেই নেই, তা' না হলে এইরকম হাওয়ার উপর দুর্গ নির্মাণের চেষ্টা করে? মানুষের মধ্যে সকলের যোগ্যতা সমান নয়, হুকুম চালানোরও এক বিশেষ ক্ষমতা ও যোগ্যতা থাকা দরকার। অধিকাংশ মানুষেরই ঐ যোগ্যতা নেই, তারা শুধু পারে অনুগামী হতে, হুকুম তামিল করাই এদের যোগ্যতা। কমিউনিজম তো আর কোনো যাদু-মন্ত্রের ব্যাপার নয় যে, রাতারাতি মানুষের নৈসর্গিক চরিত্রকে বদলে দেবে।

(চ) ব্যক্তির ন্যায় পৃথিবীর জাতিগু'লর মধ্যেও বিভিন্ন জলবায়ু, মানসিক এবং দৈহিক ইত্যাদি তারতম্যগত কারণে যোগ্যতার পার্থক্য হয়, এদের মধ্যে অনেকেই শুধুমাত্র শাসিত হওয়ার যোগ্য, কখনোই শাসক হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। বাঘ আর বাদুরকে একই ধরনের বানানোর চেষ্টা করাটা কী পাগলামী নয়?

(ছ) পুঁজিপতি তো শোষক নয়। বস্তুর উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমিকের ন্যায় সে'ও উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করে। যদি শ্রমিক কায়িক পরিশ্রম করে, তাহলে পুঁজিপতি সংগঠন, অনুশাসন এবং একত্রীকরণ ও বণ্টন ইত্যাদি মহত্ব-পূর্ণ কাজগুলি সম্পাদন করে।

(জ) সংস্কৃতি এবং কলা-র সংরক্ষণ এবং বিজ্ঞানের প্রচারে কী পুঁজিপতি আর রাজা-মহারাজাদের একটি বিশেষ ভূমিকা নেই? তাহলে ঐ শ্রেণীর অস্তিত্ব বিলোপ সাধন কী সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে না?

এই সমস্ত সমালোচনার উত্তরে কমিউনিস্টদের বক্তব্য :

(ক) কমিউনিস্ট সমাজ-ব্যবস্থায়, ব্যক্তি স্বাধীনতার অস্তিত্ব পুঁজিবাদ অপেক্ষা অনেক বেশী। এটা বলার আগে আমাদের দেখতে হবে, পুঁজিবাদীরা যে ব্যক্তি স্বাধীনতার ঢাক পেটায়, তার আসল চেহারাটা কী এবং ঐ স্বাধীনতা ক'জনের ভাগ্যেই বা জোটে? অষ্টম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি যে, সমস্ত স্বাধীনতার জননী হচ্ছে আর্থিক-স্বাধীনতা, ঐ আর্থিক-স্বাধীনতা কতজন পেয়েছে? স্রেফ কী তারাই পায়নি, যাদের কাছে ধন-সম্পদ আছে অর্থাৎ যারা পুঁজিপতি? হাজারটা মজুরকে তারা ক্রয় করতে পারে ঠিক দাস-এর মতো নয় বোধহয় তার চেয়েও খারাপভাবে। দাসদের জন্য তো তার মালিক সব সময়েই খাদ্য-বস্ত্রের যোগান দিতে বাধ্য ছিল, কেন না এটা না করলে তার পেছনে লগ্নীকৃত পুঁজির ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু মজুরের জন্য?

যতক্ষণ পর্যন্ত সে স্বাস্থ্যের অধিকারী, ততক্ষণই সে কর্মের অধিকারী এবং যে পর্যন্ত সে স্বাস্থ্যের অধিকারী, তাবৎকালই তার কাছ থেকে প্রাপ্ত শ্রমের একটি অংশ মজুরী হিসেবে দিয়ে তার কাছ থেকে কাজ নেওয়া যেতে পারে। যদি বাজার মন্দা হয় তাহলে তাকে মজুরী দেওয়াটা লোকসান এবং তখনই কারখানার দরজায় তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। যার স্বার্থে শ্রমিক তার ঘরবাড়ী ছেড়েছে এবং যে তার হাত থেকে হাতিয়ার ছিনিয়ে নিয়েছে, সেই পুঁজিপতির স্বার্থেই সে অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যে মালিক শ্রমিকের সুস্থ সবল অবস্থায় প্রতিটি রক্তবিন্দু শুষে নিয়েছে এবং যখনই সেই শ্রমিক রোগের কবলে পড়ে অথবা বার্ধক্যে অসমর্থ হয়, তৎক্ষণাৎ তাকে জবাব দেওয়ার স্বতন্ত্র অধিকার মালিকের থাকে। হাজার হাজার শ্রমিক ও তাদের পরিবার এতে কী ধরনের ব্যক্তি স্বাধীনতার স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করছে! আপনি হয়ত তাকে এই কারণে স্বাধীন বলতে পারেন, চোখ-কান খুলে আত্মহত্যার অধিকার তো সে পাচ্ছে! খুঁজলে এই ধরনের স্বাধীন মানুষ অনেকই পাওয়া যাবে।

আপনি কী বলতে পারেন, সমাজে কোন বস্তু অথবা ব্যক্তিকে ক্রয় করতে পুঁজিপতির বাকী আছে? সংবাদপত্রগুলির কাছে কী আপনি স্বাধীন বিচার-ধারা আশা করেন? ইংল্যাণ্ড এবং অন্যান্য দেশের ক্রোড়পতি সংবাদপত্র মালিকেরা কী সাংবাদিক দুনিয়াটাকে নিজের হাতের পুতুল বানিয়ে রাখেনি? কিছুকাল আগে পর্যন্ত সংবাদপত্রগুলির কিছুটা স্বাধীনতা ছিল কিন্তু এখন তো এরা পুরোপুরিভাবে পুঁজিপতির গোলামে পরিণত হয়েছে। ভারতবর্ষেও যে সব সংবাদপত্র স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বিচারধারা প্রচার করে নিজের নিজের ভিত মজবুত করেছিল, তারাও প্রতিষ্ঠালাভের সঙ্গে সঙ্গেই রাস্তা পালটাতে খুব একটা দেরী করেনি। অল্পকালের মধ্যেই দেখা যাবে যে, এখানকার পত্রিকাগুলিও পুঁজিপতির কুক্ষিগত হবে এবং পুঁজিবাদের সপক্ষে প্রচারকার্যকে আপন পবিত্র কর্তব্য বলে বিবেচনা করবে। যেহেতু মুনাফার সম্ভাবনা অল্প এবং লগ্নীকৃত পুঁজির ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা এখনো বর্তমান, তাই এখনো আমাদের এখানে পুঁজিপতিদের নজর সংবাদপত্র জগতের ওপর পড়েনি। যেখানে সংবাদপত্রগুলির মূল আমদানি পুঁজিপতিদের দেওয়া বিজ্ঞাপন, সেখানে কতদূর পর্যন্তই বা স্বাধীন বিচারধারা বজায় রাখার সম্ভাবনা থাকে? অবশ্য ভারতীয় পুঁজিপতিরা সংবাদপত্র এবং প্রেস-এর ওপর প্রভাব এবং অধিকার স্থাপনের ব্যাপারে অনেকটাই অগ্রসর হয়েছেন।

বর্তমান জগতে লেখক আর কবিদের কী পুঁজিপতিরা কিনে রাখেননি। এমন লেখক আর কবির সংখ্যা খুবই অল্প, যাঁরা নিজের কলম আর প্রতিভাকে

বেচে দেননি। অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে এবং তাই সমাজে কিছু কিছু প্রতিভাবান লেখক-কবিও আছেন, যাঁরা নিজেদেরকে বিকিয়ে দেননি।

আর রাজনীতিবিদ! এরা তো পুঁজিপতির খাস ক্রীতদাস। এদের দিকে একটু খোলা চোখে তাকালে আপনিও বুঝতে পারবেন। সব দেশেই মন্ত্রী মণ্ডলীতে শিল্প-কারখানার মালিক, ব্যাঙ্ক মালিক এবং সংবাদপত্র-প্রেসের মালিকদের ভীড়। যেহেতু রাজনীতিই আজকের দুনিয়াতে শক্তির উৎস, তাই এর পুরোপুরি সুযোগ গ্রহণ করাকে পুঁজিপতিরা অবশ্য কর্তব্য বিবেচনা করে। পুঁজিপতি দেশগুলির পার্লামেন্ট নির্বাচন তো টাকা পয়সার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। নির্বাচনে ভোটদাতারের সম্মতি আদায়ের ক্ষেত্রে পুঁজি একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে; যুবশক্তি, সংবাদপত্র এ সবই তো ক্রয়যোগ্য এবং জীপ, এরোপ্লেন, রেল ইত্যাদির পিছনে জলের মতোই টাকা পয়সা খরচ হয়। এইরকম এক পরিস্থিতিতে যাঁর কাছে টাকা পয়সা নেই, সে শুধুমাত্র যোগ্যতা, ত্যাগ আর সেবাকে মূলধন করে নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারে? আজ গ্রামের অশিক্ষিত অজ্ঞান মানুষেরাও জানেন যে, টাকা পয়সা না ছড়িয়ে কেউ ভোট যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে না। 'গণতান্ত্রিক' পার্টিগুলির কাছে এই নির্বাচন, ভোটদান ইত্যাদিকেই তো ব্যক্তি স্বাধীনতার নমুনা হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে একজন মানুষের হাতে অজস্র ধনরাশির জমায়েত এবং অপর দিকে হাজার হাজার মানুষ দরিদ্র এবং আশ্রয়হীন, সেখানে ভোট ক্রয় বিক্রয় ব্যতীত নির্বাচন অসম্ভব।

আচ্ছা! পণ্ডিত, মৌলবী এবং পাদরী —এঁরা কী সবাই ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকারী? এঁদের অস্তিত্বও পুঁজিপতির কৃপার উপর নির্ভরশীল। এঁদের বিশাল বিশাল মন্দির, গীর্জা, মসজিদ, লম্বা ধুতি, জোব্বা —এ সবই তো পুঁজিপতির দান। ব্যক্তি স্বাধীনতার অস্তিত্বহীনতা সবচেয়ে কম যদি কোথাও থাকে, তাহলে তা হচ্ছে —এই ধর্মীয় দালাল এবং তাঁদের সংস্থাগুলিতে।

দেশীয় রাজাদের প্রজার কাছে ব্যক্তি স্বাধীনতা শব্দটি একেবারেই অবান্তর। তাঁদের জাত, ইজ্জত, সম্পদ সবই তো 'অন্নদাতা' প্রভুর হাতের মুঠোয়। আপনি প্রচণ্ড শক্তিশালী মশাল নিয়ে সমাজের আঁতিপাঁতি খুঁজলেও ব্যক্তি স্বাধীনতা বলে কোনো কিছু পুঁজিবাদী দেশগুলিতে খুঁজে পাবেন না, পুঁজিবাদী দেশের কাছে এটা একটা অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয় শব্দ। স্বাধীনতা যদি কারুর থাকে, তবে তা' মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণীর জন্য। সেই উল্টোপাল্টা ভারী ভারী কথার জাল বুনে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা, আর বোকা-সোকা সাধারণ মানুষ! "আরে ভাই! কাকে তোর কান নিয়ে গেলো" —বললেই,

যথাস্থানে কানটি আছে কিনা, তা' যাচাই না করেই কাকের পেছনে দৌড়লো! এদের তো এটা বোঝা উচিত, যখন দুনিয়ার সবচেয়ে বৃহৎ শক্তি ধন-সম্পদ, স্বল্প-সংখ্যক মানুষের হস্তগত এবং তাই দিয়ে সে ছোট-বড় সব ধরনের মানুষকে কিনতে পারে, আর কেনা মানুষ কী কখনো স্বাধীন হয়?

তাহলে বুঝতে পারছেন, আপনার 'ব্যক্তি স্বাধীনতা' বস্তুটি ধোঁকাবাজী ছাড়া আর কিছুই নয়। কমিউনিস্ট সমাজ-ব্যবস্থায় ধন-সম্পদ ব্যক্তির হাতে থাকে না, এবং আর্থিক দৃষ্টিতে আপামর জনসাধারণ একই সীমারেখায় আসে, সেই জন্যই একমাত্র ব্যক্তি স্বাধীনতার সহায়ক হচ্ছে কমিউনিস্ট সমাজ-ব্যবস্থা।

(খ) কমিউনিজম সমস্ত ধরনের যোগ্যতাকে বিকাশিত এবং সাফল্য লাভের সুযোগ দেয়। আপনাদের আগেই বলেছি যে, দোষটা পুঁজিবাদের, এই সমাজে দরিদ্র পিতা-মাতার সন্তান যত প্রতিভাবান হোক না কেন, অঙ্কুরেই বিনষ্ট হতে বাধ্য।

(গ) কমিউনিজম মনে করে, সমাজের কাছে সব ধরনের শ্রমেরই মূল্য আছে। যোগ্যতা, প্রতিভা এবং সামাজিক স্বার্থে সম্পাদিত কাজকর্মকে মুদ্রা মূল্যে পরিমাপের পক্ষপাতী কমিউনিজম নয়। প্রতিভাবানেরাই স্বয়ং নিজেকে তুচ্ছ মনে করেন। অবশ্যই এই সমাজ ব্যবস্থা প্রতিভাবানকে অধিক শ্রদ্ধা ও সম্মান দিয়ে পুরস্কৃত করার বিরোধী নয়, এই প্রতিভাবানেরা তো কর্মসাফল্যে এবং কৃতিত্বে নিজে কৃতার্থ বোধ করেন। পৃথিবীতে বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কারের সুবিধা তো পুঁজিপতিরাই ভোগ করেন, তথাপি বিজ্ঞানের খোঁজে হাসতে হাসতে প্রাণ বিসর্জনে অকুণ্ঠিত বৈজ্ঞানিকরা কোন পারিতোষিকের লোভে এমনটি করতে পারেন? বস্তুত প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাবানেরা মানবজাতির সেবায় সদা সর্বদা প্রস্তুত এবং কোনো পুরস্কারেরই এঁরা তোয়াক্কা করেন না। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিভাবানদের কাজে সহায়তা এবং শ্রদ্ধা ও সম্মান দ্বারা পৃষ্ঠপোষকতা করা যেতে পারে।

(ঘ) কমিউনিজম কখনোই অচেতন বস্তুর ন্যায় নিয়মতান্ত্রিকতায় মানুষকে বাঁধতে চায় না। উপরন্তু পুঁজিবাদের জেলখানায় জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আবদ্ধ অসংখ্য মানুষকে তার আর্থিক শিকল থেকে মুক্ত করতে চায়। কলুর বলদের ন্যায় সারা জীবন পেটের জন্য ঘুরে বেড়ানো মানুষকেও কমিউনিজম —'চারু-কলা, সুসাহিত্য, বিজ্ঞানের নির্মাণে' হাজার গুণ অধিক সুযোগ দেয়।

(ঙ) যদি অগ্রগামী মানুষ এবং অনুগামী মানুষ সবাই মা-এর দুধ পান করেই বড় হয়, তাহলে কোথায় তার পেছনে কমিউনিজম লাঠি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়? কমিউনিস্ট সমাজ-ব্যবস্থা তো এইটুকুই চায় যে, ব্যক্তির যোগ্যতা এবং

একাদশ অধ্যায়

যান্ত্রিক উৎপাদনের ফলে কমিউনিস্ট সমাজে মানুষের অবকাশ

বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ, জীবনের প্রয়োজনীয় সকল সামগ্রীর-উৎপাদনে সম্পূর্ণরূপে যন্ত্রের ব্যবহারের পক্ষপাতী। কমিউনিস্ট রাষ্ট্র, বস্তু উৎপাদন সময়ের সাশ্রয় কল্পে চায়, উৎপাদন যন্ত্রের উত্তরোত্তর উন্নয়ন। এমনও হতে পারে, যখন দেখা যাবে সমাজের সমস্ত কর্মক্ষম মানুষের দৈনিক এক ঘণ্টার পরিশ্রমই, তার নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু —খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, রাস্তা, বিদ্যালয়, নাট্যমঞ্চ, বাগান ইত্যাদি উৎপাদনের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত। এই পরিস্থিতিতে নিদ্রার জন্যে আট ঘণ্টা সময় রেখেও বাকা পনেরো ঘণ্টা সময়কে সে কীভাবে কাজে লাগাবে? কাজ না থাকার ফলে বেকার মানুষের মতো সব ব্যাপারেই সে ঝগড়া-ঝাঁটি অথবা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে না? এর দ্বারা কী ভবিষ্যতের সুখ-শান্তির স্বপ্ন ভঙ্গ হবে না?

এই ধরনের প্রশ্নে আমি খুব আশ্চর্য বোধ করি। যে সমস্ত মানুষ উপদেশ বাণী বিতরণ করতেন —'মনুষ্য জীবন শুধুমাত্র খাদ্যের জন্যই নয়, পশুও তো নিজ খাদ্য আহরণে সদাব্যস্ত!' অথচ এই সমস্ত মানুষেরই স্বর্গ-কল্পনা —'যেখানে মানুষের সকল প্রকার চাহিদা মেটানোই সম্ভব, আর অফুরন্ত অবসর, কাজ একেবারে নেই বললেই চলে', এখন তাঁরাই এই ধরনের প্রশ্ন তুলেছেন। সম্ভবত এটাও তাঁরা মনে করছেন, কমিউনিস্টরা ঘোর অধার্মিক, ধর্ম-কর্ম, পূজা-পাঠ কিছুই তো তাঁরা মানেন না, তাহলে অবকাশ যাপনের জন্য রইল কী? এর উত্তরে বলতে পারি —মহাশয়! ধর্মীয় পূজা-পাঠকে না মেনেও কমিউনিজম অন্যান্য অনেক কাজকর্মের কথাই বলতে পারে। কমিউনিজম মানুষের করণীয় কাজকর্মকে দু'ভাগে ভাগ করে: [১] যা সকলেরই অবশ্য করণীয়; [২] যা করার ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীনতা আছে। মানসিক এবং শারীরিক যোগ্যতা অনুসারে

প্রতিটি মানুষকেই জীবন ধারণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তুর উৎপাদনে অংশ-গ্রহণ করতে হবে। যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদনের দ্বারা কর্মসময়কে কমিয়ে এক ঘণ্টা করার অর্থ, অনিবার্য কার্যের জন্য স্রেফ একঘণ্টা সময় বরাদ্দ করা। ব্যক্তি স্বাধীনতার পূজারীদের তো এই ব্যবস্থায় আনন্দিতই হওয়া উচিত। বাকী পনেরো ঘণ্টা অবকাশের জন্য আপনার খুব একটা চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। ঐ অবকাশের সময়ে মানুষ রুচি অনুসারে সাহিত্য, সঙ্গীত অথবা কলার সাধনা করতে পারে অথবা এর রসাস্বাদন করতে পারে, স্বাস্থ্যচর্চা আর খেলাধূলা এবং দেশ-বিদেশ ভ্রমণও করতে পারে। দেশ-বিদেশ ভ্রমণ মনকে প্রফুল্ল রাখে এবং জ্ঞানের বৃদ্ধি ঘটায়। মনুষ্য, পশু, পক্ষী এবং আরো ছোট বড় জন্তু জানোয়ারের মনো-বিজ্ঞানের অনুসন্ধান এবং অধ্যয়নও মানুষ করতে পারে, দর্শন এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানেও সে অংশ নিতে পারে। চিকিৎসা-সংক্রান্ত বহু অমীমাংসিত প্রশ্নের সমাধানেও মানুষ অংশ গ্রহণ করতে পারে। ভ্রমণ, ক্রীড়া আর নাট্যচর্চা তো এমনই বিষয়, যাতে মানুষ যত ইচ্ছা সময় ব্যয় করতে পারে। এটা কী আপনি বলতে পারেন যে, ঐ সময় প্রাকৃতিক উপদ্রব অর্থাৎ বন্যা, খরা, ভূমিকম্প ইত্যাদি একেবারেই ঘটবে না? এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটলেই পুনর্নিমাণের কাজে মানুষের সমগ্র শক্তির প্রয়োগ একান্ত প্রয়োজনীয়। সূচনার সঙ্গে সঙ্গেই এক জায়গার মানুষকে অন্য জায়গায় সাহায্য আর সহায়তার কাজে দৌড়তে হবে, কেন না ঐ সময় সমগ্র মানব-সমাজ একই পরিবারের অন্তর্গত হবে।

বর্তমানে অধিকাংশ মানুষই সদা-সর্বদা কাজ-কর্মের চাকায় পিষে থাকার ফলে কলা এবং সাহিত্য সৃষ্টি বা উপভোগের আনন্দ থেকে বঞ্চিত, আর যে সব মুষ্টিমেয় মানুষ এই সময় পায়, তারা ধনীর সন্তুষ্টি সাধনে এমনই সৃষ্টি করে, যাতে অন্যান্য মানুষের শরীর এবং মন বিকৃত হতে বাধ্য। অবকাশ এবং প্রতিভার দ্বার সকলের জন্যে উন্মুক্ত হয়ে গেলে মানুষ পৃথিবীর প্রতিটি কোণই সুন্দর করে তুলবে। যে কলা-র আনন্দ বর্তমানে কিছু গোণাগুণতি মানুষেরই ভাগ্যের বস্তু, ঐ সময় তা সার্বজনিক হয়ে যাবে। শিক্ষা এবং সংস্কৃতির সীমাও, ঐ সময় আজকের চেয়ে অনেক অনেক বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে কতটুকুই বা অবকাশ মানুষ পায়? বহু প্রতিভাই সময়ের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। ঐ সময়েই মানুষ স্বাধীনভাবে অবকাশ এবং প্রতিভার সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম হবে। যে স্বর্গকল্পনাকে সামনে রেখে ধর্মের ধ্বজাধারী পুরোহিত সম্প্রদায় তার মূর্খ অনুগামীদের ভুলিয়ে রাখে, সেই কল্পনার মিথ্যের স্বর্গের চেয়ে আরো অনেকগুণ অধিক সুন্দর, সুখময় এবং তৃপ্তিময় সমাজ তখন বাস্তবে রূপায়িত হবে।

আপনি তো আমার উপরোক্ত আলোচনাকে যতসব অবাস্তব আর কল্পনার

রাজ্যে বিচরণ বলে আখ্যা দেবেন, কিন্তু সত্যি করে বলুন তো আপনার প্রশ্ন-গুলিও কী সেই ধরনের নয় ?

কমিউনিজমের পতাকাতলে জমায়েত হয়ে মানুষের সুপ্ত শক্তি আগুন হয়ে কী করতে পারে, তা' জানতে হলে সমাজবাদী রাষ্ট্রের দিকে একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, তাহলেই সঠিক বিষয়গুলি অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন। যদিও আভ্যন্তরীণ বিরোধীশক্তি এখনো পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়নি এবং বহির্বিশ্বে তো তার বিরুদ্ধে এক গভীর ষড়যন্ত্রে এখনো বাজার গরম হয়ে আছে, তথাপি একদা অত্যন্ত পিছিয়ে থাকা দেশ আজ ভূগর্ভ থেকে তৈল উত্তোলনে আর লোহার উৎপাদনে বিশ্বে সর্ব-প্রথম স্থান অধিকার করেছে, বিদ্যুৎ-উৎপাদনের ক্ষেত্রেও তার ঐ স্থান অধিকার করতে খুব একটা বিলম্ব হবে না। বিজ্ঞানের খোঁজেও এই দেশ আজ অনেক এগিয়ে গেছে। মনো-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও পাভ্‌লভ্‌-এর ন্যায় অনুসন্ধান সাফল্য লাভ করেছে, বার্ট্রাণ্ড রাসেল-এর মতে পাভ্‌লভ্‌ হচ্ছেন, পৃথিবীর সাতজন প্রতিভা-বানের একজন। হৃদ স্পন্দন বন্ধ হয়ে মৃত মানুষকে সাময়িকভাবে পুনরুজ্জীবিত করার আবিষ্কারও এখানে হয়েছে, অন্যান্য অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রেও আজ এই দেশ অনেক এগিয়ে গেছে। সাহিত্য এবং নাট্যকলার ক্ষেত্রেও আজ সে বিশ্বে প্রথম সারিতে আছে। সেখানে প্রতিটি শিশুরই শিক্ষা শুধু আবশ্যিকই নয়, উপরন্তু মানসিক প্রবণতা ইত্যাদি পরীক্ষা করে তার শিক্ষা প্রদানের সুব্যবস্থা এই সমাজবাদী দেশে আছে এবং দেশের প্রতিটি কোণ থেকে খুঁজে এনে প্রতিভাশালীদের শিক্ষার সম্পূর্ণ সুযোগ এখানে বিদ্যমান। এইসব দেখে, আশা করাটা বোধ হয় খুব একটা অযৌক্তিক হবে না যে, কিছু দিনের মধ্যেই এই সমাজবাদী দেশ —বিজ্ঞান এবং তার আবিষ্কারের ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে যাবে।

সুতরাং যন্ত্রের অত্যধিক ব্যবহারের ফলে প্রাপ্ত অবকাশ, মোটেই খুব একটা সমস্যার কিছু নয়। তাই ভীত হয়ে মূল উদ্দেশ্য থেকে সরে আসার প্রশ্নটি অবান্তর। উপরোক্ত আলোচনা আমি সম্ভাব্য কাল্পনিক শঙ্কাগুলির সমাধানের উদ্দেশ্যেই করলাম। কমিউনিজম আজও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীন বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগে সমস্যার সমাধানের পক্ষপাতী এবং ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। হাজার হাজার বছর পরে. কী ধরনের সমস্যাবলী উপস্থিত হবে, তা' আমাদের অজানা। সুতরাং তাই নিয়ে এখন থেকেই মাথাব্যথা করে কী লাভ ? যে বিচার-বুদ্ধি স্বতন্ত্রতার ভিত এখন থেকেই গাঁথা হচ্ছে, তার সাহায্যেই এবং বিশেষ জ্ঞান ইত্যাদির উপর ভরসা করেই, ঐ সময়ের মানুষই তৎকালীন সমস্যার সমাধানে সক্ষম হবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

কমিউনিজমের ভবিষ্যত এবং তার শত্রু-মিত্র

মানবজাতির বিভিন্ন সমস্যাবলী সম্পর্কে অনেক কিছুই পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আলোচিত হয়েছে এবং এই সমস্যাবলী সমাধানের একমাত্র উপায় যে, কমিউনিজম তা'ও বলা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সমাজে কমিউনিজমই কী একমাত্র আবশ্যকীয় হয়ে দাঁড়াবে? এই প্রশ্নের উত্তরে সোজাসুজি এক কথায় 'হ্যাঁ' অথবা 'না' বলে দেওয়া যায় না।

[১] সমাজে এই বিশাল সংখ্যক মানুষের বেকার অবস্থায় অনাহারে মৃত্যু-বরণ; [২] প্রতি দশ-বারো বছর অন্তর বাজারের মন্দাবস্থার ফলে একদিকে মানুষের মৃত্যু এবং অপরদিকে লাখ লাখ মণ খাদ্য ও অন্যান্য বস্তু আগুনে জ্বালিয়ে বা সমুদ্রে ডুবিয়ে বিনষ্ট সাধন; [৩] বংশানুক্রমিক রোগ আর মানসিক দুর্বলতাকে হটিয়ে সমাজে সুস্থ সন্তানের জন্ম প্রদানে পদে পদে বাধা সৃষ্টি; [৪] ধনী-গরীব সবাইকেই ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার কারণে চিন্তিত থাকা —এই সমস্যাগুলি এবং আরো অন্যান্য নানা ধরনের সমস্যার সমাধান কমিউনিস্ট সমাজ-ব্যবস্থাতেই সম্ভব। দীর্ঘকালের সুরক্ষিত স্বার্থ রক্ষার্থে বলবান শক্তিগুলি কমিউনিজমের কট্টর বিরোধী, কিন্তু উপরোক্ত সমস্যাবলী তো আর কাল্পনিক-মনগড়া নয়, আর এই-সব সমস্যার তীব্র জ্বালা মাঝে মাঝেই মানুষকে বিছার কামড়ের মতো যন্ত্রণা-দায়ক হুল ফোটায়, এই কারণেই মানুষের বারংবার কমিউনিজমকে স্মরণ করাটা অনিবার্য, এবং এই থেকেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সমাজে কমিউনিস্ট সমাজ-ব্যবস্থা স্থাপন অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু পুঁজিপতি —বিদ্যা-বুদ্ধি, ধর্ম ও ঈশ্বরের রহস্যময় শক্তিতে অপরিসীম বলীয়ান। সে নিশ্চুপভাবে স্বীয় স্বার্থের ওপর দখলদারি বরদাস্ত করবে না, বুদ্ধি

এবং অস্ত্র দিয়েও আপ্রাণ বিরোধিতা পুঁজিবাদের তরফ থেকে অবশ্যই আসবে। কিন্তু তার প্রচেষ্টা তখনই সফল হবে, যখন সে :

[১] কিছু কিছু দেশকে চিরকালের তরে গোলাম বানিয়ে রাখতে পারবে এবং এই উপায়ে একটি স্থায়ী বাজার নিজের দখলে রাখতে সক্ষম হবে; [২] যদি পরাধীন দেশগুলির ব্যাপারে পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা হয় অর্থাৎ ঐ দেশগুলিকে নিজ নিজ কবজায় আনতে তারা পরস্পর অনাক্রমণ চুক্তি করে, এবং এর ফলে পরাধীন দেশগুলির স্বাধীনতা প্রাপ্তির সম্ভাবনা আর থাকবে না, উপরন্তু যাতে পুঁজিবাদী দেশগুলির পারস্পরিক বৈজ্ঞানিক যুদ্ধের সর্বনাশের সম্ভাবনাও থাকবে না; [৩] যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার রুখতে এবং যান্ত্রিক উৎপাদন জনিত কারণে বেকার মানুষদের, যুদ্ধ অথবা কোতল করে শেষ করতে পারে; [৪] যদি মানুষের জ্ঞান-পিপাসা এবং মনন-অন্বেষণের প্রবৃত্তি অতীতের কথা হয়ে দাঁড়ায় এবং স্বার্থপর প্রভুদের শাসনকে ধ্বংস করতে উন্মুখ বৈজ্ঞানিক আর দার্শনিকরা সমাজে বিরল হয়ে যান; [৫] যদি মানবজাতিতে আদর্শের কারণে মৃত্যুকে বাজী রাখতে পারেন, এই চরিত্রের সৎ-আদর্শবান মানুষজনের জন্মের সম্ভাবনা একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়; তবেই বলতে পারি যে, সমাজে কমিউনিস্ট সমাজ-ব্যবস্থা স্থাপন অসম্ভব।

কমিউনিস্ট সমাজ স্থাপনের সম্ভাব্যতার সপক্ষে ও বিপক্ষে, দুই তরফের যুক্তিগুলিই অলোচনা করা হলো এবং এই পর্যালোচনার ভিত্তিতে এটাই সুস্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায় যে, শীঘ্র কিংবা বিলম্বে, সমাজে কমিউনিজমের প্রাধান্য অবশ্যম্ভাবী। পুঁজিবাদের সিদ্ধান্ত কখনোই আদর্শের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে নেই, এটা দাঁড়িয়ে আছে স্বার্থের ভিত্তিতেই, সেই কারণেই পুঁজিবাদ সদা-সর্বদা সচেষ্ট থাকবে, যাতে কমিউনিজম কখনোই সফল না হতে পারে। তাঁদের জীবদ্দশায় তো আর কমিউনিস্ট সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হচ্ছে না, এটা মেনে নিয়েই তাঁরা সন্তুষ্ট, দুনিয়া জুড়ে যে উত্থান পতন চলছে, তাতে তাঁরা দেখছেন যে, বহু ধনীর দুলালকেই মেহনত করে আপন অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে, তথাপি তাঁরা নিজ সন্তানের বিষয়ে চিন্তা করেন না, নিজের জীবনটা সুখে আরামে কেটে গেলেই খুশী।

কিন্তু কমিউনিস্টদের সম্মুখে আছে এক আদর্শ, শুধু একটি দেশেই নয়, পৃথিবীর সমগ্র মনুষ্যজাতির চিরস্থায়ী সুখ আর শান্তি প্রতিষ্ঠার আদর্শ। এই করণেই বিলম্ব হলেও নিজের কর্তব্য থেকে সে বিচ্যুত হবে না, এবং বিলম্ব হওয়া না হওয়াটা সম্পূর্ণভাবেই কমিউনিস্টদের প্রচেষ্টা এবং উদ্যমের উপর নির্ভর করে। বিনা প্রচেষ্টা, বিনা স্বার্থত্যাগ, বিনা একতায় সমাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কমিউনিজম

প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে, এমনটা আশা করাই অন্যায় এবং কমিউনিজমের কর্মপরায়ণ সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিরোধী।

কমিউনিজমের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং যাঁরা সমাজে কমিউনিজমকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তাঁদের অবশ্যই —কে শত্রু এবং কে মিত্র, এটা জানতে হবে। মোটামুটি-ভাবে এর শত্রুশ্রেণীকে দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে, প্রথমত যারা সমস্ত কিছু জেনে শুনে শুধুমাত্র নিজস্বার্থেই কমিউনিজমের বিরোধিতা করেন; এবং দ্বিতীয়ত যারা অসম্পূর্ণ ধারণা এবং অজ্ঞানতাবশত বিরোধীসুলভ আচরণ করেন। প্রথম শ্রেণীতে: ১॥ পুঁজিপতি সর্বপ্রথম; ২॥ এবং তাদের ক্রীতদাস, চাকর বাকর আর ধর্মের ধ্বজাধারী পুরোহিত বর্গ; ৩॥ কমিউনিজমের বিরুদ্ধে মারাত্মক অস্ত্র, পুঁজিপতির সহায়ক ধর্ম আর ঈশ্বর; ৪॥ পুরাতন চিন্তাধারায় অভ্যস্ত লোকজন, যারা নতুনভাবে চিন্তা করার শক্তি হারিয়েছেন, এরাও বিরোধী।

দ্বিতীয় শ্রেণীর শত্রুর মধ্যে: ১॥ অন্ধ ভক্তি আর শ্রদ্ধা এবং তপস্যার প্রচারকদের প্রথমেই ধরা যেতে পারে, কেন না এঁরা মানুষের স্বাধীন বিচার শক্তিকে নষ্ট করে দেন; ২॥ উগ্র জাতীয়তাবাদ, কমিউনিজমের বিরুদ্ধ শক্তিগুলির অন্যতম, কেন না তারা শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য স্থাপনে বাধাই সঞ্চার করে না, উপরন্তু ঐ শ্রেণীর মধ্যে বৈরিতা আর বন্ধু হত্যার আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করা সত্ত্বেও কমিউনিজম আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী। জাতীয় সমাজ-বাদের শ্লোগান তো শুধুমাত্র অন্যের চোখে ধূলো দিয়ে নিজেদের নেতৃত্ব কায়েমের উদ্দেশ্যেই; ৩॥ পুরানো কথার বেসুরো রাগের আলাপন, ভবিষ্যতের প্রতিনিয়ত সর্বাত্মক প্রগতিতে অতীতকে আবিষ্কার, অথবা তার চেয়েও নিকৃষ্ট হিসেবে গ্রহণ করা, কথায় কথায় পুরানো পুঁথিপত্র আর রীতিনীতির দোহাই প্রদান —এই ধরনের মানসিক দাসত্বও কমিউনিজমের সূক্ষ্ম কিন্তু বলিষ্ঠ শত্রুদের মধ্যে অন্যতম।

শত্রুদের সম্পর্কে বলা শেষ করে, এবার কমিউনিজমের মূল-সংস্থাপক (ক্যাডার) এবং হিতাকাঙ্ক্ষীদের বিষয়ে আলোচনায় প্রবেশ করব। বর্তমান যুগে কমিউনিস্ট শব্দের মধ্যেই এক অদ্ভুত আকর্ষণ আছে, আবাল-বৃদ্ধ সবাই এই গ্রহে প্রবেশ করতে উৎসুক। বিগত একশো বছরের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে, কমিউনিজমের শত্রু অপেক্ষা ক্ষয় ক্ষতিটা সাধিত হয়েছে, এর অনভিজ্ঞ আর কাঁচা অনুরাগীদের দ্বারা। প্রথম মহাযুদ্ধের পর কিছু দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের নিশ্চিত সাফল্য কয়েক যুগের জন্য পিছিয়ে যাওয়ার কারণ এই ধরনের কিছু লোকজন। সেই কারণেই আমাদের কমিউনিজমের কাঁচা এবং পাকা অনুরাগীদের সঠিকভাবে চিনতে হবে।

কমিউনিজমের শব্দে আকৃষ্ট লোকজনদের মধ্যে অনেক ধনীর সন্তান আছেন,

যাঁদের যৌবনের নিরপেক্ষ বিচার ধারা, বন্ধনগুলিকে ছিঁড়ে এইদিকে টেনে আনে, তথাপি তাঁদের ঐ সময়ের সিদ্ধান্ত কাঁচাই থাকে, আর তাঁদের মধ্যে অনেকেই : ১॥ ফ্যাশনের জন্য ঝোঁকেন ; ২॥ কেউ কেউ রাতারাতি নেতা হওয়ার স্বপ্নে এই দিকে আসেন ; ৩॥ কারুর কারুর কাছে এটা বুদ্ধির ব্যায়ামের কাজ দেয়, আর এইভাবেই আসল কথাটা আর তাঁদের মনে বসতে পারে না। এই ধরনের লোকজন কর্মগতভাবে কমিউনিস্ট আন্দোলনে কিছুই যুক্ত করতে পারেন না, কারণ —(ক) নিজ নিজ ধনী আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদির চিন্তা মস্তিষ্কে থাকার ফলে কাজকর্মের গতি তীব্র এবং নিরপেক্ষ হতে পারে না ; (খ) নিজের আর্থিক ক্ষতি, উদ্দাম গতিতে এগিয়ে যাওয়ার পথে পিছুটান হয়ে দাঁড়ায় ; (গ) শব্দ নিয়ে ঝগড়া-ঝাঁটির দিকেই এঁদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, কারণ বাস্তব জীবনের আসল দুঃখ-কষ্ট সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা ; (ঘ) নিজে কখনো ঐ ধরনের দুঃখ-কষ্টের জীবন কাটাননি বলে গরীবের দুঃখ-কষ্ট সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা মাথায় আসে এবং তা' খুব সাময়িকভাবেই আসে ; (ঙ) এঁদের মধ্যে অনেকেই, জীবনের উচ্চশিখরে আরোহণের উদ্দেশ্যে কমিউনিজমকে সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করেন, এবং যখন তাঁর মতলবটা হাসিল হয়ে যায়, কোনো না কোনো ছলছুতো করে কেটে পড়েন।

ধনীর যুবক পুত্রের ন্যায় না হলেও তরুণ বুদ্ধিজীবীও কমিউনিজমের পাকা সহায়ক হওয়ার যোগ্যতা রাখেন না, কারণ সাধারণ শ্রেণীতে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও তথাকথিত বড় হওয়ার সম্পূর্ণ সুযোগ তাঁর আছে এবং বড় হওয়ার পর অতি সহজেই পুরানো আদর্শ জলাঞ্জলি দিতে আর সহকর্মীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতায় বা কৃতঘ্নতায় দ্বিধা বোধ করেন না। কমিউনিজমের বাস্তবিক সংস্থাপক আর সমর্থক স্বয়ং শ্রমজীবী মজদুর আর কিষাণই হতে পারেন, কেন না : ১॥ তার হীন দশা, অসহ্য দারিদ্র্য ইত্যাদি সদা-সর্বদা এক তীব্র জ্বালাকে জাগিয়ে রাখে; ২॥ এই যুদ্ধে সে নির্ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, কারণ হারানোর মতো কিছুই তার নেই। জয়লাভে চিরতরে স্বাধীনতা এবং পরাজয় হলেও আগামী যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ তো তার হাত থেকে পালিয়ে যাবে না ; ৩॥ প্রতিষ্ঠান অথবা কর্মগত দৃষ্টিতে শ্রমজীবী সম্প্রদায় সমাজে এক বিশাল শক্তি, বোধ-জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই পিছু হটবার নাম করে না ; ৪॥ শ্রমিকশ্রেণীকে সৃষ্টি করেছে ধনী পুঁজিপতি এবং শ্রমিক তাঁর শক্তি আর ক্ষমতার সাহায্যেই পুঁজিপতি শ্রেণীকে সমাজ থেকে উৎখাত করতে পারে।

উপরিউক্ত কারণগুলি সত্ত্বেও এই ধরনের কাঁচা অনুরাগীদের বহিষ্কার মোটেই কাম্য নয়। বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে ধারণাগুলি সম্বন্ধে যদি সজাগ দৃষ্টি থাকে, তাহলেই তাঁদের সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি দূর করা যেতে পারে। একটা সময় পর্যন্ত বুদ্ধি-

জীবীরা যথার্থভাবেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আসেন এবং অনেকেই চিরতরে এই পক্ষে থেকে যান, কমিউনিস্ট সমাজ স্থাপনের স্বার্থে তাঁদের সেবা ও আত্ম-ত্যাগকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। তথাপি সময়ে সময়ে কমিউনিজমের প্রতি তাঁদের বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি লক্ষ্য করে এইটুকুই বলা যায়, যেন কমিউনিস্ট আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীর উপর অত্যধিক জোর আর ভরসা না করা হয়। এর মূল ভরসা এবং কেন্দ্র তো একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীই হতে পারে। অন্যান্য বহুশ্রেণীর লোকজন আসবে এবং যাবে কিন্তু সমাজে কর্মীর অভাব হবে না। এবং এইভাবেই সাম্যবাদী যুদ্ধ ততদিন পর্যন্ত চলবে, যতদিন না সমাজে ধনী দরিদ্র, শোষক-শোষিতের বিভেদ দূর হবে। যখন শ্রেণীহীন মানব-সমাজ স্থাপিত হবে, তখন শুধুমাত্র বর্তমানের সমস্যাগুলিই দূর হবে না, উপরন্তু ঐসব সমস্যা থেকে উদ্ভূত নানা ধরনের চিন্তা এবং অবস্থাগুলি দূর হওয়ার ফলে মানব-জীবন আরো অনেক অনেক শান্তিময়, সুখময় এবং সন্তোষময় হবে। আর প্রাকৃতিক বিপদ-আপদের বিরুদ্ধে মানুষ অনেক প্রস্তুত হয়ে সংযম আর ধৈর্যের সঙ্গে মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে। মানুষের পারস্পরিক ব্যবহারের ক্ষেত্র তখন অনেক অধিক প্রেম, সহানুভূতি এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ হতে বাধ্য।

ভাবীকাল

(বাইসবীং সদী·)

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

সময়টা ১৯১৮ সালের এপ্রিল মাস। রাত্রির শেষ প্রহরে আধঘুম আধ-জাগরণের মতো এক অবস্থায় বিশ্ববন্ধুর এই ভ্রমণবৃত্তান্ত আমি যেন দেখতে পেয়েছিলাম। কয়েকদিনের মধ্যেই সমস্ত ব্যাপারটা আমি লিখে ফেলি। কিন্তু সময়াভাবে রচনাটিকে পরিমার্জিত পরিশীলিত করে তাকে প্রকাশযোগ্য রূপ দেওয়া তখন হয়ে ওঠেনি। লেখাটা ছিল আমার জনৈক বন্ধুর হেফাজতে এবং তিনি সেটি হারিয়ে ফেলেন। কিছুদিন অপেক্ষার পর ওটি ফিরে পাওয়ার আশা ত্যাগ করে, স্মৃতি থেকে যতটা সম্ভব, নতুনভাবে ঐ বিষয়টি নিয়ে লিখতে শুরু করি। ফেব্রুয়ারী ১৯২৪ সালে হাজারীবাগ জেলে বসে এই নতুন লেখাটি শেষ হয়। যেহেতু এই পাণ্ডুলিপিটি তৈরী হয় মূল রচনার সম্পূর্ণ স্মৃতি-নির্ভর অবস্থায় তাই বিষয়বস্তু মোটামুটি এক থাকলেও সঙ্গত কারণেই কিছু পার্থক্য ঘটে গেছে। কি উদ্দেশ্যে এই কাহিনী লিখেছিলাম এবং সেটা কতদূর সফল হয়েছে সে বিচারের ভার পাঠকদের হাতেই ছেড়ে দিলাম।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই সংস্করণে বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন না করলেও কিছুটা পুনর্লিখন করতে হয়েছে। এই বইটির বর্তমান সংস্করণের পূর্বে প্রকাশিত আমার লেখা 'সোভিয়েত ভূমি' পাঠকদের একটা বিষয় বুঝতে সাহায্য করবে বর্তমান পৃথিবী কোন পথে এগিয়ে চলেছে।

রা. স.

দীর্ঘ নিদ্রার অবসানে

কি অদ্ভুত পরিবর্তন! এখানে আগে তো এতো বিরাট বিরাট গাছ ছিল না, ছিল না ঐ বড় পাথরের চাঁইটাও—তবে ওটা এলো কোথা থেকে? মনে হচ্ছে সামনের পাহাড়ের চূড়া থেকে ওটা ভেঙে পড়েছে তবে আর একটা বড় পুরনো পাথরের টুকরো রাস্তা আটকে দেওয়ার ফলে ওটা বাগমতী নদীতে গিয়ে পড়েনি। কিন্তু ঐ বড় বড় গাছগুলোকে টপ্‌কিয়ে পাথরের চাঁইটা কি করে পাহাড় থেকে নামলো! মনে হচ্ছে পাথরের চাঁইটা খসে পড়বার পর ঐ গাছগুলোর জন্ম হয়েছে। তা'ছাড়া গাছগুলোর বয়স ১০০ বছরের বেশী এটাও বোঝা যাচ্ছে। আশ্চর্য, গাছগুলোর বয়স ১০০ হলে আমি কি এখানে ১০০ বছর আগে এসেছিলাম? মনে পড়ছে এখানে আমার আসার তারিখটি ১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। যদি তার পর থেকে ১০০ বছর কেটে গিয়ে থাকে তবে এখন তো ২০২৪ সাল!

এখান থেকে নামাও দেখছি মুস্কিল, হাত কয়েক নীচেই বাগমতী বয়ে চলেছে, আর সেই নদীর পাড়ে সেই পাথরের চাঁইটাও নেই যার ওপর দিয়ে আমি এখানে উঠে এসেছিলাম। দেখছি সেই পাথরের চাঁইটা নদীস্রোতে ক্রমাগত ক্ষয়ে গিয়ে একটা নালার মতো হয়ে গেছে। পাহাড়টা ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলাম, যেন প্রাচীন পাথরে যৌবনের ছোঁয়া লেগেছে—সবুজে সবুজে ভরে গেছে তার সারা দেহ। আর সেই পুরনো দিনের ছোট ঝর্ণাটি একটা ছোটখাট জলপ্রপাতে পরিণত হয়েছে। বাঃ! আশেপাশে আরও কয়েকটি ঝর্ণা নজরে পড়ল। তবে বাগমতীর কলধ্বনি সেই পুরনো শব্দেই বেজে চলেছে—আর সবই ঠিক্‌ঠাক্ আছে শুধু দু'একটি পাথরের টুক্‌রো এদিক-ওদিক সরে গেছে এই যা। নদীর পারে আমার পূর্বপরিচিত গাছটি অবশ্য দেখছি না আর একটু ভালো করে দেখার পর

মনে হচ্ছে আমার পূর্ব-পরিচিত বৃক্ষরাজির কোনোটিই বেঁচে নেই। এ সব দেখে মনে হলো, প্রকৃতির মধ্যেই যখন এত পরিবর্তন ঘটে গেছে তখন জনসমাজে না জানি কত অভিনবত্ব এসে গেছে! ভীষণ কৌতূহলী হয়ে উঠছিলাম। দেখতে ইচ্ছে হলো মানবসমাজে কি রূপান্তর ঘটে চলেছে। সামনের রাস্তাটা ভীমফেরী হয়ে গেছে এটা জানা ছিল। সেখানে নিশ্চয়ই কাউকে না কাউকে পাব, যাদের কাছ থেকে কিছুটা জানা যাবে।

এইসব সাত-পাঁচ ভেবে আমার বহুদিনের আশ্রয় পাহাড়ের গুহাটিকে বিদায় জানিয়ে নীচে নামতে শুরু করলাম। ৩৫-৩৬ হাত নীচে নামতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল তা'ছাড়া আমি এখন সম্পূর্ণ উলঙ্গ। কারণ বহুদিনের পুরনো পোষাক আমার গুহা-বাসের সময়ে সম্পূর্ণ জীর্ণ হয়ে আমাকে পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু আমাকে এখন মানুষের কাছে যেতে হবে সুতরাং কিছু একটা লজ্জা-নিবারণের ব্যবস্থা করতেই হয়। অগত্যা গাছের পাতা ছিঁড়ে জংলী লতা দিয়ে ঘুন্সী বানিয়ে একটা কাজ চলা মতো পরিধেয় বানিয়ে নিলাম। নদীর পাড় ধরে চলা শ্রেয় মনে হলো, কারণ পাহাড়ের কোল ঘেঁষে হাঁটা নিরাপদ মনে হচ্ছিল না। নদীর ধারে পৌঁছে স্নান করার ইচ্ছে জাগলো কারণ এদিকে বেলা যথেষ্ট বেড়েছে সেইসঙ্গে বেড়েছে রোদের তেজ —কিন্তু পাহাড়ী ঠাণ্ডাও সঙ্গ ছাড়ছে না। তবু নদীতে নেমে বেশ ভালোভাবে স্নান করলাম। স্নান করে উঠেছি এমন সময় চোখে পড়ল কয়েকটি পরিচিত ফলের গাছ। গাছ থেকে ফল পেড়ে তখনকার মতো ক্ষুধা মিটিয়ে আবার পথ চলা শুরু করলাম।

মনে পড়ছে, যখন এখানে আমি প্রথম এসেছিলাম তখনই আমার বয়স ছিল ষাট, চুলেও পাক ধরেছিল। এখন তো চুল শনের মতো শাদা আর দীর্ঘ উপবাসে শরীর কৃশ। তবুও প্রায় ঘণ্টা চার-পাচ মনের জোরে হাঁটছি এবং সম্ভবত ৬-৭ ক্রোশ রাস্তা অতিক্রম করেছি এমন সময় চোখে পড়ল মাথার ওপর বৈদ্যুতিক তারের লাইন। রোদ চমকাচ্ছিল তারে আর তাতেই বুঝলাম তারগুলো তামার তৈরী। আগে এদিকে কখনো বৈদ্যুতিক লাইন দেখিনি তাই মনে হলো, কাছে-পিঠে কোথাও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র আছে আর সেই বিদ্যুৎ পাঠানো হচ্ছে অন্য কোথাও। এ বার চোখে পড়ল ডালিম, কমলালেবু, কলা —এইসব ফলের বাগান। আরও প্রায় মাইল দুয়েক পথ হাঁটার পরও কোনো মানুষজনের সাক্ষাৎ পেলাম না। তবে বাগানের মধ্যে দিয়ে একটা পায়ে-চলা রাস্তা দেখতে পেলাম —মনে হলো এই রাস্তাটা দিয়ে এগিয়ে গেলে কোনো মানুষজনের সাক্ষাৎ মিলতে পারে। এই ভেবে নদীর পাড়ের রাস্তা ছেড়ে বাগানের মধ্যেকার রাস্তা ধরলাম এবং সারি-সারি কমলালেবু গাছের ছায়ার মধ্যে দিয়ে আমার চলা শুরু হলো। দেখলাম

প্রচুর লেবু ফলে রয়েছে আর ফলের আকৃতিও বেশ বড়। ফলভরা গাছগুলো দেখতে খুবই ভালো লাগছিল, ভাবলাম আর একটু এগিয়ে গেলে বাগানের মালি বা ঐ রকম কোনো একজনের সঙ্গে দেখা হবে যার কাছ থেকে গাছের বৃহদায়তন লেবুর ব্যাপারটা জানতে পারব। যতই এগিয়ে চলেছি ততই আমার ঔৎসুক্য বাড়ছে।

কমলালেবুর বাগান শেষ হতেই শুরু হলো আপেলের বাগান। নেপালের এই উপত্যকা অঞ্চলে এই ধরনের ফলের বাগান দেখে খুবই নতুন লাগছিল। আপেলের ফলনও প্রচুর, সমস্ত ডালপালা ভরে রয়েছে আর গাছগুলোও ধাপে ধাপে একদম পাহাড়ের মাথা পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। ওপর থেকে সহজে বৃষ্টির জল নামার জন্যে পাহাড়ের গায়ে জায়গায় জায়গায় নালা কাটা হয়েছে সেই সঙ্গে সর্বত্র জলসেচের জন্যে মোটা মোটা পাইপ বসানো আছে। দু'একটা সরু পাইপ দেখে মনে হলো সেগুলো বোধহয় পানীয় জলের জন্য। রাস্তা থেকে কিছুদূরে দু'একটা টিনের বাড়ি চোখে পড়ল কিন্তু আমি রাস্তা ছেড়ে সেদিকে গেলাম না, কারণ আমার মনে হচ্ছিল পথেই কারো-না-কারো সঙ্গে দেখা হবে।

আরো কিছুটা হাঁটার পর মানুষের গলার স্বর কানে এলো। এগিয়ে চলছি আর জন-কোলাহল স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। এ বার দেখতে পেলাম বেশ কিছু মেয়ে-পুরুষের জটলা। তাদের পরণে সুন্দর সব পোষাক আর সবাই উজ্জ্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী। ভাবলাম, ওরা বোধহয় সবাই নেপালের রাজপরিবারের লোক—অবসর বিনোদনের জন্যে এখানে এসেছে। পরক্ষণেই মনে হলো, আমার অনুমান ভুল। কারণ কিছু লোক গাছ থেকে ফল পাড়ছে আর অন্যেরা সেগুলো এক জায়গায় গাদা করছে। তা'ছাড়া রাজপরিবারের বিশ-গজী কাপড়ের পাজামা কোনো মহিলার পরণে নেই যদিও এদের চেহারা, পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার আচরণ রাজপরিবারের মানুষদের থেকে উন্নততর বলেই মনে হচ্ছিল। এখানে সকলেরই পোষাক এক ধরনের—প্যাণ্ট, জামা, হাতে দস্তানা, পায়ে জুতো মোজা। —এরা কারা? সেটা অবশ্য এদের সঙ্গে পরিচয়ের পরই বোঝা যাবে এই ভেবে আমি আর একটু এগিয়ে গেলাম। সকলেই কাজে ব্যস্ত থাকায় প্রথমে আমাকে কেউই দেখতে পায়নি। হঠাৎ একজনের চোখে পড়ে গেলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকলের দৃষ্টিতে আমার আবির্ভাব ধরা পড়ল। সবাই আমার দিকে এমন অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল যেন আমি কোনো অপরিচিত জীব। কেউ খুব মনোযোগ সহকারে আমার পাকা দাড়ি লক্ষ্য করছিল, কেউ বা অবাক হয়ে দেখছিল আমার পরণের পাতার পোষাকটি। ওদের মধ্যে একজন আমার কাছে এগিয়ে এলো—মনে হচ্ছে ওর কাছ থেকেই সব কিছু জানা যাবে।

লোকটি যদিও আমার দিকে এগিয়ে আসছে তবুও সব কিছু জানার কৌতূহলে আমি এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করছিলাম।

আপেল গ্রামের বাগান

লোকটি ধীরে ধীরে আমার কাছে এগিয়ে এসে 'স্বাগত' শব্দটি উচ্চারণ করে অভিবাদন জানাল এবং শব্দটি লোকটি একবার মাত্র উচ্চারণ করলেও আমার কানে তার স্বাগত সম্ভাষণ বারম্বার অনুরণিত হতে থাকে। এরপর আমাদের বাক্যালাপ শুরু হলো।

"আপনি কোত্থেকে আসছেন?"

"বিশেষ দূর থেকে নয়। কারণ সূর্যোদয়ের ঘণ্টা দুই পরে আমি আমার আস্তানা থেকে হাঁটতে আরম্ভ করেছিলাম।"

"এখন ···" চট করে লোকটি নিজের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, "তিনটে বেজে কুড়ি মিনিট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, একটা কথা, আমার জিজ্ঞাসার ধরনের মধ্যে যদি কোনো রকম ধৃষ্টতা প্রকাশ পেয়ে থাকে তবে আমায় মাপ করবেন। কারণ আপনাকে দেখার পর অনেকগুলো প্রশ্ন আমার মনে এসে ভীড় করছে।"

"যা বলবার নিঃসঙ্কোচে বলুন, কারণ আমার কৌতূহলও কিছু কম নয়। তা'ছাড়া যদিও আমার নিবাস এখান থেকে খুব দূরে নয় তবে মনে হচ্ছে বর্তমান সময়ের অনেক দূর থেকে আমি আসছি। আচ্ছা বলুন তো, আজ কোন তারিখ কোন সাল?"

"সন ১০০।"

"কোন সন?"

"সার্বভৌম। কিন্তু আপনি কোন সন জানতে চাইছিলেন?"

"খৃষ্টীয়।"

"ওঃ, তা'হলে এটা ২১২৪।"

"কি আশ্চর্য! আমি কি তা'হলে গুহার মধ্যে ২০০ বছর ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলাম? সেই জন্যেই সব জায়গায় অকল্পনীয় পরিবর্তন চোখে পড়ছে! আচ্ছা এ বার আপনার যা জিজ্ঞাস্য আছে বলুন।"

"আপনি ২০০ বছর একটা গুহায় ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন! কিন্তু আপনি গুহায় প্রথম যখন যান তখন আপনার বয়স কত ছিল?"

"ষাট বছর।"

"তা'হলে এখন আপনার বয়স হলো ২৬০ বছর —কিন্তু সে তো অনেক! আমার বয়স এখন ৬০। বুদ্ধপুরে ১০০ থেকে ১২০ বছর বয়সী কয়েকজন আছেন। কিন্তু আপনার মতো দীর্ঘজীবী যে কোনো মানুষ থাকতে পারে এটা আমার ধারণা ছিল না। এই ব্যাপারটা আমায় খুব অবাক করছে কিন্তু এখানে আমার সঙ্গী যাঁরা রয়েছেন তাঁরাও আমার মতো আপনার ব্যাপারে উৎসুক। খুব ভালো হয়, যদি আপনার কথাগুলো আমাদের সকলের সামনে বলেন। আর একটা কথা, আপনি যে ধরনের পোষাক পরে আছেন ওটা বড্ড সেকেলে। যদি কিছু মনে না করেন তবে আপনার জন্যে একপ্রস্থ পোষাক এনে দেবো?"

"কিছু মনে করার কারণ নেই। আমি নিজেও একটু ভদ্রস্থ পোষাকের প্রয়োজন অনুভব করছি।"

আমার কথা শেষ হতেই ভদ্রলোক 'অর্জুন অর্জুন' বলে একজনকে ডাকলেন এবং সে প্রায় দৌড়েই আমাদের কাছে এলো। যুবকটি হাসিমুখে আমাকে স্বাগত জানিয়ে আমার প্রশ্নকর্তাকে জিজ্ঞেস করলো, "কি ব্যাপার?"

"ওঁর জন্যে একটা ধুতি নিয়ে এস।"

"ঠিক আছে" —বলে অর্জুন দৌড়ে ফিরে গেলো এবং দু'মিনিটের মধ্যে একখানা পরিষ্কার ধুতি নিয়ে চলে এলো।

আমি ধুতি নিয়ে বললাম, "এরপর আমাদের অনেক আলোচনা হবে, তাই তার আগে আমাদের পরস্পরের মধ্যে পরিচয় পর্বটা শেষ হয়ে যাক। আমার নাম বিশ্ববন্ধু, আপনার নাম?"

"আমার নাম সুমেধ।"

"তা'হলে সুমেধ প্রথমে আপনার সহৃদয়তার জন্যে ধন্যবাদ।"

"নাঃ, এটা এমন কিছু ব্যাপার নয়। হ্যাঁ এখন আমাদের বিকেলের জলখাবারের সময় হয়েছে আর আপনিও পথশ্রমে ক্লান্ত এবং খিদে পাওয়াটাও খুব স্বাভাবিক। চলুন আমাদের সঙ্গে, কিছু খেয়ে নেওয়া যাক। তারপর আপনার কথা আমরা সব একসঙ্গে বসে শুনব।"

"সুমেধ, সত্যি বলছি আপনার সঙ্গে এই অল্প আলাপেই আমি মুগ্ধ। চলুন কোথায় নিয়ে যাবেন।"

সুমেধ আমাকে সঙ্গে নিয়ে একটি বাড়ির দিকে এগোতে লাগল। এমন সময় কামান গর্জনের মতো একটা আওয়াজ আমায় চমকে দিলো। সুমেধকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, ঐ শব্দটি জলযোগের সময় ঘোষণা করছে। দেখতেও পেলাম, কামান-গর্জনের পর এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে থাকা কর্মরত স্ত্রী-পুরুষরা কাজ বন্ধ রেখে এ বাড়িটির দিকেই চলে আসছে।

বাড়ির কাছে জলের কল অনেকগুলো রয়েছে, আবার স্নানের জন্য বেশ কয়েকটা পরিষ্কার বাথটব। বাড়িটিও যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন—তিন-চার খানা সাধারণ মাপের ঘরের সঙ্গে রয়েছে একটি বিরাট হল ঘর যেখানে দেড়শ'-দুশ' লোক একসঙ্গে বসতে পারে—ব্যবস্থা ভালোই। সারি সারি চেয়ার টেবিল পাতা। প্রত্যেক টেবিলে থালা ভর্তি নানা ধরনের ফল আর গ্লাস ভর্তি দুধ। প্রায় ১০০ জন ইতিমধ্যেই হল ঘরে এসে গেছে। আমার দেখে অবাক লাগল মেয়েরাও ছেলেদের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসছে। সুমেধ সকলকে ডেকে বলল, "বন্ধুগণ, আমাদের সঙ্গে যে অতিথি রয়েছেন তাঁকে দেখে সকলেই খুব কৌতূহলী হচ্ছেন, আর যে এঁর সঙ্গে দু'একটা কথা বলতে পেরেছে তার তো কৌতূহলের সীমা নেই। সে'জন্যেই আমি একা একা ওঁর সব কথা জেনে নিতে চাই না—এখন পর্যন্ত এইটুকুই জেনেছি আমাদের অতিথি বিশ্ববন্ধু মহাশয় আজ থেকে ২০০ বছর আগে এখান থেকে ১০-১২ ক্রোশ দূরে কোথাও এসেছিলেন এবং সেখানে এতদিন কাটিয়ে আজই এখানে এসে পৌঁচেছেন।"

এ পর্যন্ত শুনে সকলেই আরও বেশী কৌতূহলী হয়ে উঠল কিন্তু জলযোগের নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাবার আশঙ্কায় সবাই হাত-মুখ ধুয়ে খাবার টেবিলগুলিকে ঘিরে বসে পড়ল। বলা নিষ্প্রয়োজন, অর্জুন যখন আমার পরিধেয় বস্ত্র এখান থেকে নিয়ে যায় তখন আমার জন্যে জলযোগের ব্যবস্থাও করে গিয়েছিল। সুমেধ আমাকে একটি চেয়ারে বসিয়ে নিজেও আমার ঠিক পাশে বসলেন। ওঁর কাছেই একজন মহিলা বসেছিলেন, পরে জেনেছি উনি সুমেধের স্ত্রী সুমিত্রা। খাওয়া শুরু হলো।

আমি এক টুকরো আপেল মুখে দিলাম—এক অনাস্বাদিত মধুরতায় আমার মুখ ভরে উঠল। ভাবলাম, বহুকাল পরে এইসব জিনিস খাচ্ছি তাই এতো সুস্বাদু লাগছে; কিন্তু পরে জানতে পারলাম, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ করে এমন উৎকৃষ্ট স্বাদ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। আমাকে বেশীরকম ক্ষুধার্ত মনে করে কিছু বেশী ফল দেওয়া হয়েছিল যার মধ্যে কমলালেবুও ছিল। নেপালের কমলালেবু এর আগেও খেয়েছি কিন্তু সে জিনিস এমন মধুর ও সুস্বাদু ছিল না—এখন ফলের মধ্যে বীজের প্রায় চিহ্নই নেই শুধুই শাঁস। আঙুরের এক একটার আকৃতি কাশীর কুলের মতো।

সুমেধকে জিজ্ঞেস করলাম, "কোথাকার আঙুর এগুলো?"

"এখান থেকে চার ক্রোশ দূরে আঙুরের বাগান আছে।"

"তা'হলে এখন নেপালে আঙুরও ফলছে?"

"প্রচুর। এর চাষ শুরু হয়েছে প্রায় ১০০ বছর! সারা বিহার, উড়িষ্যা, অর্ধেক বাঙলাদেশ, কাশী এবং কোশলে তো এখান থেকেই আঙুর চালান যায়।"

ইতিমধ্যে জলযোগের পালা শেষ। সকলে হাত-মুখ ধুয়ে আর একটা ঘরে গিয়ে বসল। সুমেধ আমাকে একটা আরাম কেদারায় বসার ব্যবস্থা করে দিলেন। আমি মনে মনে ভাবছি, এরা বোধহয় সবাই আমাকে বিংশ শতাব্দীর জংলী ভাবছে —অনেকেই তো আমাকে পাতার পোষাক পরে এখানে আসতে দেখেছে। তা'ছাড়া কোনো পুরুষেরই দাড়ি-গোঁফ রাখার সখ এখানে দেখছি না, কিন্তু আমি তো একমুখ দাড়ির জঙ্গল নিয়ে বসে আছি।

আমি এদের সকলকেই বাগানে কাজ করতে দেখেছি তাই সবাইকে শ্রমিক ভেবে নিয়েছিলাম। ইচ্ছে হচ্ছিল খবর নিই, এ বাগানের মালিক কে বা কারা। কিন্তু প্রশ্ন করার মতো সাহস হচ্ছিল না।

বর্তমান জগৎ

"আপনার কথা শোনবার জন্যে আমরা সবাই খুব উদ্‌গ্রীব।"

"আপনাদের থেকেও আমি বেশী উদ্‌গ্রীব আপনাদের এবং বর্তমান সময়ের ব্যাপার-স্যাপার জানতে। সুমেধ, আমার কাহিনী খুব দীর্ঘ নয়। ঐ গুহায় অবস্থান করার আগে আমি বিহার প্রদেশের নালন্দায় থাকতাম। সে সময় ওখানে এক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল যেখানে আমি পড়তাম ও পড়াতাম।"

"ওঃ! আপনিই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই অধ্যাপক বিশ্ববন্ধু? সত্যি, আমরা কত সৌভাগ্যবান যে আপনার সঙ্গে আমাদের দেখা হলো। আমিও তিন থেকে কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছি। আর ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েই আপনার নামে যে বাড়িটি তৈরী হয়েছে সেখানে আপনার প্রস্তরমূর্তি দেখেছি।"

"তা'হলে আমার প্রিয় বিদ্যানিকেতনটি আজও জীবিত!"

"শুধু জীবিত বললে ভুল বলা হবে। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমপর্যায়ভুক্ত হবার মতো সারা দুনিয়ায় আর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম খুঁজে পাওয়া কঠিন। দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতি বিভাগগুলি তো অদ্বিতীয়।"

আমি যখন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব কাহিনী শুনছিলাম তখন আমার ভেতরে খুশীর জোয়ার শুরু হয়ে গেছে। অন্যদিকে শ্রোতারা আমার পূর্ব পরিচয় পেয়ে বেশ অভিভূত মনে হলো —তাদের চোখের ভাষায় বুঝতে পারছিলাম, শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার সঙ্গে তারা আমায় গ্রহণ করেছে। এতক্ষণে আমার কথা ওদের প্রায় সবটাই জানা হয়ে গেছে। এবার ওদের কথা জানবার জন্যে আমার কাহিনীর রামায়ণ একটু সংক্ষেপ করলাম :

"প্রায় ৬০ বছর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সেবা করার পর একটু উত্তরখণ্ডে বেড়াতে যাই। ঐ গুহা যা এখান থেকে ১২-১৩ ক্রোশ দূরে, সেখানে পৌঁছে আমি মূর্ছা যাই অথবা ঘুমিয়ে পড়ি —এমন একটা কিছু ঘটেছিল। আর আশ্চর্য এই, আজ পর্যন্ত অক্ষতভাবেই ঐ গুহার মধ্যে বেঁচে ছিলাম। ব্যস, সংক্ষেপে এই হলো আমার কাহিনী। এ বার আপনাদের কথা বলুন —আপনাদের জন্মভূমি কোথায়, আর আপনাদের ভাষাও তো নেপালী বলে মনে হচ্ছে না।"

"এখন নেপালী ভাষার প্রচলন খুব বেশী পাবেন না। তবে অবশ্য বই-এর দোকানে ঐ সম্পর্কে প্রচুর বই-পত্র পাবেন। এখন সারা ভারতে একটিই ভাষা। আর আমাদের সকলের জন্মস্থান এক জায়গাতেও নয়। আমার বাবা জন্মেছিলেন কাটমাণ্ডুতে কিন্তু লেখাপড়া শেখেন নালন্দায়। শিক্ষান্তে, তিনি গয়া জেলাকে তাঁর কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেন। আর আমার জন্ম ঐখানেই। এখনও আমার বাবা মা জীবিত এবং তাঁরা এখন হাজারীবাগ জেলায় বুদ্ধগ্রামে থাকেন। বাবার বয়স এখন ১০০ বছরেরও বেশী। আমার স্ত্রী সুমিত্রার (তাঁর পাশে বসা মহিলাটিকে দেখিয়ে) জন্ম কাশীতে কিন্তু এরও শিক্ষা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিয়ের পর আমরা দু'জনেই এখানে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কমরেড অর্জুনের জন্ম শ্রীলঙ্কার অনুরাধাপুরে, কিন্তু ওর যখন এক বছর বয়স তখন ওর মা-বাবা বুদ্ধগয়ায় বসবাস করতে চলে আসেন। তাই অর্জুনও নালন্দায় লেখাপড়া শিখেছে। কিন্তু ওর স্ত্রী প্রতিভা কাশ্মীরের মেয়ে ওখানেই ওর শিক্ষাদীক্ষা··· এভাবে আমাদের অন্যান্য কমরেডরা যাঁরা এখানে আছেন, তাঁদের জন্মস্থান, শিক্ষাক্ষেত্রর নাম-ঠিকানা শতাধিক এবং সমগ্র ভারত জুড়ে। আমাদের আপেল গ্রামের লোকসংখ্যা প্রায় ৫ হাজার ; তার মধ্যে প্রায় অর্ধেক অন্য জায়গার লোক। এর প্রধান কারণ হলো, এখনকার ছেলেমেয়েদের তিন বছর বয়সেই শিক্ষার্থী হিসাবে বিদ্যালয়ে পাঠাতে হয় এবং কুড়ি বছর বয়সে শিক্ষাক্রম শেষ করে তাদের খুব অল্পসংখ্যকই নিজেদের গ্রামে ফিরে যায়। যার যে রকম শিক্ষা বা কারিগরী বিদ্যায় যোগ্যতা সে সেই অনুযায়ী নিজের পছন্দমতো কর্মক্ষেত্র বেছে নেয়।"

"ওঃ এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝলাম। এখনকার সব কিছুর সঙ্গেই দেখছি আমাদের কালের সমাজ-ব্যবস্থার অনেক ফারাক ঘটে গেছে। আচ্ছা, এখন নেপালের রাজা কে?"

"নেপালের রাজা! এখন রাজা বলে কোনো জিনিসই নেই। তবে শব্দটা রয়ে গেছে বইপত্রে।"

"তা'হলে বাগানের মালিক কে?"

এখন তো সব জিনিসেরই মালিকানা রাষ্ট্রের —শুধু বাগান কেন, এই ঘর, চেয়ার-টেবিল সমবেত স্ত্রী-পুরুষ সকলেই রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি।"

"এই বিশাল রাষ্ট্র-ব্যবস্থা তা'হলে কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে?"

"আমাদের দ্বারা নির্বাচিত পঞ্চায়েতের মাধ্যমে। গ্রাম-জেলা-প্রদেশ-দেশ সর্বোপরি সারা বিশ্ব —সব কিছুর পরিচালনা ঐ একইভাবে হচ্ছে।"

"এখন কি গোটা দুনিয়া নিয়ে একটি মাত্র রাষ্ট্র?"

"হ্যাঁ, ঠিক তাই। আজ প্রায় ১০০ বছর হতে চলেছে যখন থেকে সমগ্র বিশ্ব এক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। ···আচ্ছা, তা'হলে এ বার আপনার অনুমতি নিয়ে আমাদের নিজেদের কাজে ফিরে যাই।"

সুমেধ ঘড়ি দেখে আবার বলল, "এখন চারটে বেজেছে। আমরা পাঁচটার সময় কাজ শেষ করে গ্রামে ফিরব। আর আপনিও আজকের রাতটা আমাদের গ্রামেই কাটাবেন। কিচ্ছু চিন্তা নেই, আমি এখনই আমাদের গ্রাম-প্রধানের কাছে আপনার খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

"ঠিক আছে, আপনারা আপনাদের কাজে ফিরে যান। আমি এখানেই বেশ আছি। আমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না।"

সুমেধ উঠে দাঁড়াতেই সকলে বাগানের দিকে রওনা হলো। সুমেধ ঘরের কোণে রাখা টেলিফোনের মতো একটা যন্ত্রের কাছে গেলো এবং মুহূর্তের মধ্যেই তার বাঞ্ছিত ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ ঘটল।

সুমেধ কিছুক্ষণ নিম্নস্বরে বাক্যালাপ চালিয়ে আমাকে বললে, "আমাদের গ্রাম-প্রধান দেবমিত্র আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান, আমি আমার কাজে চললাম—আপনি কথা বলুন।"

সুমেধ কাজে চলে গেলো। আমি উঠে সেই টেলিফোনটার কাছে গেলাম। কাছে যেতেই ঐ যন্ত্রের সঙ্গে সংলগ্ন একটা আয়নায় একজনের চেহারা ফুটে উঠল। আমি চমকে উঠলাম। কারণ ওটা আমার প্রতিবিম্ব তো নয়ই তা'ছাড়া ঘরে কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তিও নেই। আমি বিস্ময়-বিমূঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় আয়নায় যাঁকে দেখা যাচ্ছিল তাঁর ঠোঁট নড়ে উঠল।

"স্বাগতম! আমি দেবমিত্র। এইমাত্র কমরেড সুমেধ আমাকে আপনার আগমন-বার্তা জানাল। এখন আমার সর্বপ্রথম কর্তব্য হলো, আপনার ছবি ও খবর পাটনায় পাঠিয়ে দেওয়া। ওখান থেকে সন্ধ্যে ছ'টার মধ্যে আপনার ছবি ও খবর সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। আপনি আমাদের গ্রামে যখন এসে পৌঁছাবেন তখন আপনাকে স্বাগত জানাবার জন্যে আমি হাজির থাকব। তবে এখন আপনি ক্লান্ত তাই ঐ ঘরে বসেই কিছুটা সময় বিশ্রাম নিন।"

আমি অবাক-বিস্ময়ে দেবমিত্রের কথাগুলো শুনছিলাম। বিজ্ঞানের এই অগ্রগতি আমাকে ভীষণভাবে আলোড়িত করছিল।

বহুদিন বাদে দীর্ঘ পদযাত্রায় প্রচণ্ড ক্লান্তি অনুভব করছিলাম, শোবার বিছানার দিকে এগোচ্ছিলাম, হঠাৎ পাশে আর একটি ঘর চোখে পড়ল—সুন্দরভাবে সাজানো গোছানো একটি লাইব্রেরী। শরীরের ক্লান্তি ভুলে গিয়ে লাইব্রেরী ঘরে চলে এলাম। আলমারীগুলিতে বইগুলি সযত্নে সাজানো আবার কয়েকটি বই একটা টেবিলের ওপর রয়েছে। টেবিলের পাশে চেয়ারে গিয়ে বসলাম। একখানা বই হাতে নিয়ে দেখলাম বইটির ওজন স্বাভাবিকের তুলনায় কিছুটা বেশী। খুলে দেখি, বইটিতে কাগজের পরিবর্তে রূপালী ধাতুর পাত ব্যবহার করা হয়েছে। কৌতূহল হলো, দেখি কোথাকার ছাপা। দেখলাম নালন্দা প্রেসে ২০২৪ সালে ছাপা হয়েছে। হিসেব মতো বইটি ১০০ বছরের পুরনো, কিন্তু দেখলে মনে হবে এইমাত্র দপ্তরীখানা থেকে এসেছে। আর একটা বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ল, বইটির ধাতব পৃষ্ঠাগুলি খুবই পাতলা—এক ইঞ্চি উচ্চতায় প্রায় তিন হাজার পৃষ্ঠা। প্রতি পদক্ষেপে বর্তমান জগতের প্রতিটি ঘটনাই পরম বিস্ময়কর মনে হচ্ছিল। টেবিলের ওপর একটা ক্যাটলগ রয়েছে। দেখলাম, সাহিত্য, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ক প্রায় ২০০ বই আছে। তালিকা দেখে একটি বই খুঁজে বার করলাম। বইটির নাম 'সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের ইতিহাস'। বইটির ছাপা বাঁধাই যদিও আগের দেখা বইটির মতোই তবে ছাপা হয়েছে অতি সম্প্রতি। লেখক শ্রী বিশ্বামিত্র, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ইতিহাসের অধ্যাপক। আমার হাতে খুব বেশী সময় নেই যে দু'-আড়াই হাজার পৃষ্ঠার বইটি সম্পূর্ণ পড়ে নেব। তাই শর্টকাট করবার জন্যে বিষয়সূচীটিই আগে পড়ে নিতে লাগলাম। বিষয়-সূচীতে চোখ বুলিয়ে ১৯২৪ সালের পরবর্তী সময় সম্পর্কে যে ধারণা হলো তা মোটামুটি এইরকম :

বৃটেনের ছত্রছায়ায় ঐ শতাব্দীর চারের দশকে ভারতের স্বাধীনতা লাভ। নয়ের দশকে সংযুক্ত এশিয়া রাষ্ট্রের উদ্ভব, এশিয়া, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া সম্মিলিত জাতিগুলির এক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। আর তার কিছুকাল পরে ইউরোপীয় রাজ্যগুলি এই সংযুক্ত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। অবশেষে ২০২৪ খৃষ্টাব্দে সারা পৃথিবী এক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে চলে আসে। আমার কৌতূহল হচ্ছিল বর্তমান বিশ্ব রাষ্ট্রের প্রধান কে জানার জন্যে। বইটির শেষ অধ্যায়ে আধুনিক দুনিয়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের চিত্র, সংক্ষিপ্ত জীবনী, জন্মস্থান দেওয়া হয়েছে। দেখলাম বর্তমান বিশ্ব রাষ্ট্রের প্রধান যিনি তাঁর নাম শ্রীদত্ত এবং তিন বছরের জন্য নির্বাচিত বর্তমান রাষ্ট্রপতির জন্মভূমি ভারতবর্ষ। উনি শিক্ষা লাভ

করেছেন তক্ষশিলায় এখন ওঁর বয়স ৭৪। প্রধানমন্ত্রী ওহারা জাপানী। শিক্ষামন্ত্রী মনোলীন একজন রাশিয়ান মহিলা; স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডেভিড জন্মসূত্রে আমেরিকান—এইভাবে বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দপ্তর এবং মন্ত্রীদের নামগুলো পড়ে নিলাম কিন্তু কোনো প্রতিরক্ষা দপ্তর বা তার বিভাগীয় মন্ত্রীর নাম চোখে পড়ল না। ভাবলাম, কোনো একটা ভুলের জন্যে ঐ দপ্তর এবং মন্ত্রীর নামটি বাদ পড়ে গেছে। কারণ এ রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর খালি থাকতে পারে না। এরপর বিশ্ব রাষ্ট্রের অংশীদার বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র পরিচালকদের নামের তালিকা পড়তে শুরু করলাম কিন্তু সেখানেও কোনো দেশে প্রতিরক্ষা দপ্তর বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। হতাশ হয়ে গ্রন্থটির নির্দেশিকা (Index) অংশে এসে সৈন্য, প্রতিরক্ষা ···ইত্যাদি শব্দগুলির সাক্ষাৎ মিলল। উৎসাহের সঙ্গে নির্দেশিত পৃষ্ঠায় পৌছে জানতে পারলাম ২০২৪ খৃষ্টাব্দে বিশ্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে ঐ সব গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি ইতিহাসে আশ্রয় নিয়েছে—বর্তমান জগতে তাদের আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ইতিমধ্যে বোধহয় পাঁচটা বেজে গেছে, কারণ আমি দেখতে পাচ্ছিলাম সকলে কাজ সেরে এদিকেই ফিরে আসছে। সুমেধ আমাকে ওর সঙ্গে যেতে অনুরোধ করল।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে শুধুমাত্র দরজা বন্ধ করে দিয়ে সকলকে ফিরে যেতে দেখে আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "এখানে কেউ থাকবে না?"

"কি দরকার থাকার।"

"তা'হলে বাড়িতে তালা দিয়ে যান। জিনিসপত্র রয়েছে এতো।"

"অজানা-অচেনা লোক ভুল করে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে হাত দিয়ে যাতে দুর্ঘটনা ঘটাতে না পারে সেইজন্য যন্ত্রপাতির কারখানায় আমরা তালা লাগাই। কিন্তু এখানে বই ছুঁয়ে কেউ দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে বলে আমাদের ধারণা নেই। শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগে জিনিসপত্রের যাতে ক্ষতি না হয় সে'জন্যে দরজাটা শুধু বন্ধ করে দিলাম।"

"মেনে নিলাম, আপনাদের বর্তমান রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় কোনো কিছু চুরি যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু যদ্দুর আমার মনে পড়ছে এ অঞ্চলে আগে প্রচুর বানর ছিল। তারাও তো আপনাদের অনুপস্থিতিতে ঘরের জিনিসপত্র বা বাগানের ক্ষতি করতে পারে।"

"আপনি যা বলছেন সেটাও প্রায় শতাধিক বছর আগের এক উপদ্রব। আমিও বইতে পড়েছি, এ অঞ্চলে সবত্র প্রচুর বানর ছিল। সব থেকে বেশী ক্ষতি হতো ফসলের তাই সরকার থেকে উদ্যোগ নিয়ে মদ্দা আর মাদীগুলোকে দুটো আলাদা

জায়গায় রেখে দেওয়া হয়েছিল। ফলে বংশবৃদ্ধি তো ঘটলই না আর ২৫ বছরের মধ্যে বানরকুল অবলুপ্ত হয়ে গেলো।"

"তবে বানর-জাতীয় প্রাণী কি একেবারেই নেই?"

"কিছু আছে। প্রাণীবিদ্যার চর্চার জন্যে সংগ্রহশালায় রাখা। ওখানে প্রয়োজন মতো তাদের বংশবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। শুধু বানরের কথা বলছি কেন, পশু-জগতের অনেকগুলি প্রাণীরই ঐ দশা হয়েছে—এক সময় মানুষ বাধ্য হয়ে যাদের গৃহপালিত পশু হিসাবে রাখত।"

আমি একটু ভেবে বললাম, "তা'হলে কি কুকুর বেড়ালও গ্রামে নেই?"

"না। ওদের দ্বারা তো মানুষের কোনো উপকার হয় না।"

কথা বলতে বলতে আমরা রাস্তায় এসে পৌছালাম। কয়েকটি বিরাট মোটর গাড়ী আমাদের জন্যেই অপেক্ষায় ছিল। প্রত্যেকটিতে প্রায় কুড়ি জনের মতো বসবার সুবন্দোবস্ত। আমি গাড়ীতে উঠে সুমেধকে জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা আপনারা যে ফলগুলো গাছ থেকে পাড়ছিলেন সেগুলো কোথায় গেলো?"

"ও সব যখনই পাড়া হচ্ছে তখনই গাড়ীতে করে স্টেশন চলে যাচ্ছে। সেখান থেকে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত ট্রেনে চাহিদা মতো জায়গায় ফলগুলো চলে যাচ্ছে। আর এতক্ষণে সে-সব নির্দিষ্ট জায়গায় হয়তো পৌছেও গেছে।"

"আচ্ছা আপনাদের গ্রামে কেবল ফলেরই উৎপাদন হয়?"

"হ্যাঁ, শুধুই ফল। আবার ফলের মধ্যে আপেলই বেশী। আর সেইজন্যেই আমাদের গ্রামের নাম আপেল গ্রাম। আমাদের এখান থেকে মাইল পনেরো দূরে কমলালেবুর গ্রাম, আর বাগমতীর ওপারে কলাবাগান তো নিজের চোখেই দেখেছেন।"

"হ্যাঁ, সেটা চোখে পড়েছে।"

"ওটা কলাবাগান গ্রামের এলাকা। আমাদের গ্রামে তো দু'একটা কমলা-লেবুর গাছ আছে কিন্তু ওখানে শুধুই কলার ফলন ছাড়া আর কিছুই নেই। আপনি জলযোগের সময় যে কলা খেয়েছিলেন সেটা ওখানকার।"

"আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, সমস্ত ফলেই এক বিশেষ ধরনের স্বাদ আর আয়তনেও বেশ বড়—এর কি বিশেষ কোনো কারণ আছে?"

"নিশ্চয়ই। এখন উদ্ভিদ্‌বিদ্যা আপনাদের সময়ের থেকে অনেক উন্নত। তাই যে কোনো ফলে অতিরিক্ত স্বাদ বা গন্ধ যোগ করা অথবা আয়তনে বড় করা—এ সবই আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন।"

দু'পাশে আপেল গাছের বাগান ছাড়িয়ে আমাদের গাড়ী দ্রুতগতিতে গ্রামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। রাস্তা বেশ উঁচু-নীচু। কিন্তু রাস্তা এবং গাড়ী উভয়ের

এমনভাবে তৈরী যে দ্রুতগতিতে উঁচু-নীচু রাস্তায় কোনো ঝাঁকুনি লাগছে না। আমাদের ডানদিকে বাগমতী বাঁদিকে পাহাড়। সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে মনে হলো, আচ্ছা ফলের চাষ তো আর বারোমাস হয় না তখন এই লোকগুলো কি করে। কিছু শুধানোর আগেই চোখে পড়ল, কতকগুলি আপেল গাছে ছোট ছোট ফল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ঐ ছোট আপেলগুলি কি অন্য কোনো জাতের?"

"একই জাতের। এখন ছোট আছে আর দু'মাসের মধ্যে বড় হবে তখন রঙ ধরবে। আমাদের এখানে আপেলের ফলন বারোমাস।"

এইসব কথাবার্তা যখন হচ্ছিল তখন আমাদের গাড়ীটি একটি রেললাইন পার হলো। আমি জানতে চাইলাম, "এই রেলপথ কোথায় গিয়েছে?"

"এই লাইন চন্দ্রাগৌড়ী হয়ে কাঠমাণ্ডু গিয়েছে—সেখান থেকে আরও দূর দেশ পর্যন্ত।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "রেললাইন এত উঁচু পাহাড়ের ওপর দিয়ে গেছে! আমাদের আমলে মাল পরিবহনের জন্যে চন্দ্রাগৌড়ী পর্যন্ত বৈদ্যুতিক রোপওয়ে তৈরী হতে দেখেছিলাম।"

"এখন চন্দ্রাগৌড়ী, ফার্পিং ইত্যাদি অঞ্চলে কোনো বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় না। আমিও বইতে পড়েছি আগে চন্দ্রসামশের নামে নেপালে একজন রাজা ছিলেন যিনি ব্যক্তিগত সুবিধার জন্যে একটা বিদ্যুৎ-উৎপাদনের কারখানা স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু আজ প্রায় ১৫০ বছর হয়ে গেলো সে কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।"

"বন্ধ করে দেওয়া হলো কেন?"

"বন্ধ করে দেওয়ার কারণ-হলো, ঐ কারখানায় বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হতো পাহাড়ী ঝর্ণার স্বাভাবিক গতিপথকে অবরুদ্ধ করে। তাতে যে সামান্য পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতো সেটা তখনকার দিনের চাহিদা হয়তো মেটাত কিন্তু ঝর্ণাগুলির স্বাভাবিক প্রবাহ রুদ্ধ হয়ে কৃষি-জমি হয়ে উঠছিল অনুর্বর। তা'ছাড়া রাজা চন্দ্রসামশের আর একটা ক্ষতিকর ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। তিনি পাহাড়ী অঞ্চলের বন-জঙ্গল সাফ করে ক্ষেতের জমির পরিমাণ বাড়াচ্ছিলেন। কিন্তু উল্টো ফল ফলতে শুরু করে ৫০ বছরের মধ্যেই। ন্যাড়া পাহাড়ী অঞ্চলে বৃষ্টিপাত গেলো একদম কমে, ফলে চাষের জন্যে বৃষ্টি অথবা ঝর্ণার জল দুটোই দুর্লভ হয়ে উঠল—আর মানুষজনও ঐ অঞ্চল ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে শুরু করল।"

"তা'হলে ঐ কারখানাটি বন্ধ করে দেওয়ায় বেশ লাভ হয়েছে বলুন!"

"নিশ্চয়ই। আপনি যদি এখন ও অঞ্চলে যান তা'হলে দু'চোখ ভরে সবুজের সমারোহ দেখবেন। কিন্তু সেকালের মতো অপরিকল্পিত বন-জঙ্গল নেই। কেবল

নানা ধরনের ফলের বাগান। এ বার আপনিই বলুন, সেই পুরনো বিদ্যুতের কারখানাটা বন্ধ করে দিয়ে ক্ষতির থেকে লাভ কত বেশী হয়েছে।"

"আমার মনে হচ্ছে সর্বত্রই একটা বিপুল পরিবর্তন ঘটে গেছে। আচ্ছা এখন বোধহয় আপনাদের গ্রামের কাছাকাছি এসে গেছি—ঐ যে সব বাড়ি-ঘর দেখা যাচ্ছে ..."

"হ্যাঁ ওটাই আমাদের গ্রাম। তবে এখনও তিন মাইল দূরে—দশ মিনিটের মতো সময় লাগবে পৌঁছাতে।"

"আচ্ছা আপনি কি কখনো নেপালে গেছেন?"

"হ্যাঁ, অনেকবার। আমার বাৎসরিক ছুটির বেশীর ভাগ সময় নেপাল ও তিব্বতে ঘুরে বেড়িয়ে কাটিয়েছি। ওখানকার ভৌগোলিক এবং আর্থনীতিক বিষয়ে আমার কৌতূহল প্রচণ্ড।"

সুমেধের কথা শুনে আমার বিংশ শতাব্দীর কথা মনে পড়ল। সেই সময় সুমেধের মতো জ্ঞানী ব্যক্তিরা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার কাজ পেতেন। তা'হলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াল? দ্বাবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে, মানবসমাজে বিদ্বান্ ব্যক্তিদের কদর কি কমে গেছে যে কারণে সুমেধের মতো মানুষ ফলের বাগানের সাধারণ কর্মী! না-কি বিদ্যার মান অনেক উন্নত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে! জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার এতো অর্জিত বিদ্যা অন্যের কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করছেন না কেন?"

"ঠিকই বলেছেন। বাগানে আমার কাজ তো তিনবার কাজের বিরতির সময় নির্দেশ করা। তাই অবসর মতো আমি আমার বিশেষভাবে জানা বিষয়গুলির ওপর বক্তৃতা দিই এবং পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধও লিখে থাকি।"

"আচ্ছা বর্তমানে নেপাল থেকে কি কি জিনিস উৎপন্ন হয়?"

"নেপালে খনিজ পদার্থের মধ্যে তামা, লোহা ও সীসা উৎপন্ন হয়। কয়লাও কিছু পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু আজকাল বিদ্যুতের ব্যবহার এতো বেড়ে গেছে যে সেখানে আর কয়লার দরকার হয় না। তা'ছাড়া নেপালে বড় বড় কয়েকটি পশমের কারখানা আছে যেখান থেকে উৎপন্ন পশমের জামা-কাপড় অর্ধেক ভারত-বাসীর শীতকালের পোষাক জোগায়।"

"তবে কি নেপালে চাল-গম উৎপন্ন হয় না?"

"না। আজকের দুনিয়ায় এটাই নিয়ম যে, যেখানে যে-জিনিসের উৎপাদনের পরিস্থিতি সবচেয়ে অনুকূল সেখানে শুধু সেই জিনিসটিই উৎপন্ন হবে আর সেখান-কার মানুষজনদের অন্যান্য জিনিসের চাহিদা পূরণ করবে অন্য জায়গা থেকে আমদানী করা পণ্যসামগ্রী।"

কথায় কথায় আমরা গ্রামের প্রথম বাড়িটির কাছে এসে গেছি। দেখলাম টেলিফোনে যাঁর ছবির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর সঙ্গে আরও অনেকে রয়েছে। গাড়ী থামল, দেবমিত্র এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানালেন। একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন গ্রাম। সবগুলি বাড়ি একই ধরনের ···আমার মনে হলো এক নতুন পৃথিবীতে আমি পা রেখেছি।

দেবমিত্র বললেন, "আমার সঙ্গে আসুন।" সমবেত জনমণ্ডলীর সঙ্গে আমি দেবমিত্রকে অনুসরণ করলাম। একটু এগিয়ে চলার পরই চোখে পড়ল একটি বাড়ির গায়ে লেখা রয়েছে 'অতিথিভবন।'

দেবমিত্রের সঙ্গে আমরা সকলেই ঐ বাড়িতে প্রবেশ করলাম। দেবমিত্র একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, "কমরেড দেব, আমাদের আজকের অতিথির জন্যে কোন ঘরটি ঠিক করা হয়েছে ?"

কমরেড দেব একজন তরুণ। সে উত্তর দিলো, "ঐদিকের পাঁচ নম্বর ঘরটি।"

নির্দিষ্ট পাঁচ নম্বর ঘরের দিকে এগোচ্ছি এমন সময় অন্য আর একটি ঘর থেকে একজন প্রৌঢ় বেরিয়ে এসে আমায় স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন। যাইহোক আমাকে নির্দিষ্ট ঘরটিতে পৌঁছে দিয়ে দেবমিত্র বললেন, "আপনি এখন বিশ্রাম করুন, আপনাকে দেখাশোনা করার জন্যে কমরেড দেব এখানেই থাকবেন। রাত্রি আটটায় আমরা সবাই একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করব, তারপর 'কমিউন' হলে সকলের সঙ্গে আপনার পরিচয় হবে। হ্যাঁ, ইনি হলেন বিশ্বামিত্র এঁর সঙ্গে কথা বলুন। ইনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক। উনি কিছু তথ্যানুসন্ধানের জন্যে তিব্বত গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে আমাদের এখানে অতিথি হয়েছেন।"

দেখলাম, বিশ্বামিত্র আর কেউ নন, যিনি একটু আগেই এই ঘরে ঢোকার আগে আমায় সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন। এদিকে সূর্যাস্ত হয়ে গেছে ; আবছা অন্ধকার ঘরের মধ্যে ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে কিন্তু তার আগেই কমরেড দেব ঘরের মধ্যে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক বাতি জ্বেলে দিলেন। সন্ধ্যে নামার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ী ঠাণ্ডা বাড়ছিল যদিও সুমেধজী তাঁদের খামার বাড়ি থেকে বেরবার সময় একটি গাত্রবস্ত্র দিয়েছিলেন কিন্তু সেটা দিয়ে ঘনায়মান পাহাড়ী গ্রামের শীত আটকানো যাচ্ছিল না। আমার অবস্থা বুঝেই কমরেড দেব ঘর গরম-রাখার যন্ত্রটি চালু করে দিলেন। আশ্চর্য, কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘর গরম হয়ে উঠল।

বিশ্বামিত্রকে বললাম, "খুব যদি ব্যস্ত না থাকেন তা'হলে একটু বসুন —গল্প করা যাক।"

দু'জনে কাছাকাছি দুটো চেয়ার নিয়ে বসলাম। আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ

ছিল না খামার বাড়িতে যাঁর লেখা বইটি উল্টেপাল্টে দেখছিলাম তিনিই এই ব্যক্তি। তবু কোনো সন্দেহের অবশেষ না রাখার জন্যে প্রশ্ন করলাম, "আচ্ছা, আপনিই কি সেই অধ্যাপক বিশ্বামিত্র যাঁর লেখা 'সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের ইতিহাস' আমি এঁদের খামার বাড়িতে দেখেছি?"

বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, আমিই।"

"আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব আনন্দিত হলাম।"

"আমার আনন্দ আপনার চেয়ে অনেক বেশী। আমাদের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকলেই আপনাকে মনে রেখেছে। যে বীজ একদিন আপনি বপন করেছিলেন তার আজকের চেহারা দেখে আপনিও সুখী হবেন। গ্রাম সভাপতির সঙ্গে আপনার কথোপকথনের পর আপনার শুভাগমনের সংবাদ পেয়েই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য বশিষ্ঠকে আপনার খবর জানাই। তিনি আমাকে বলেন, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বাগ্রে আপনার দর্শনপ্রার্থী।"

"আপনি কি আচার্য বশিষ্ঠের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বললেন?"

"হ্যাঁ, এতক্ষণ তো ওঁর সঙ্গেই কথা হচ্ছিল। উনি বলছিলেন, যদি আপনার খুব কষ্ট না হয় তো আপনার সঙ্গে আমাদের দূরদর্শন-সমন্বিত দূরভাষণে একবার আলাপ করবেন।"

"কি আর কষ্ট? এমন তো কিছু পরিশ্রান্ত হইনি। এটা আমারও খুব আনন্দের ব্যাপার।" এই বলে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে ঘর থেকে বের হলাম।

অতিথিভবনের লাইব্রেরী ঘরে টেলিফোন। বিশ্বামিত্র গিয়ে টেলিফোনের ঘণ্টা বাজালেন এবং একটু বাদেই আমাকে বললেন, "আমাদের আচার্য শ্রী বশিষ্ঠ আপনার জন্যে প্রতীক্ষা করছেন।"

আমি গিয়ে দেখলাম, টেলিফোনের সঙ্গে যুক্ত আরসিতে এক বৃদ্ধের প্রতিবিম্ব। প্রতিবিম্বের ঠোঁট নড়ল এবং মাথা ঝুঁকল, শব্দযন্ত্রে আওয়াজ এলো, 'স্বাগতম'। আমিও মাথা হেঁট করে প্রত্যাভিনন্দন জানালাম। আমার পাশে দাঁড়িয়ে বিশ্বামিত্র আমাকে জানালেন, 'উনি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য শ্রী বশিষ্ঠ। প্রায় ৭০ বছর উনি নালন্দার সঙ্গে যুক্ত আর বিগত কুড়ি বছর আচার্যের পদে অধিষ্ঠিত আছেন।"

আমি সেই প্রতিবিম্বিত আচার্যের দিকে ফিরে বললাম, "আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি ধন্য। আপনি দীর্ঘকাল বিদ্যাদান করার গৌরবে গৌরবান্বিত।"

"ও কাজ তো আমার কর্তব্য কর্ম। হ্যাঁ, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আমার একটি নিবেদন আছে—আপনি অন্য কোথাও যাবার আগে আমাদের এই শিক্ষাসত্রে একবার আসুন।"

"আমার নিজের ইচ্ছাও তাই। ও ব্যাপারে আর কিছু বলতে হবে না। এখান থেকে সোজা আমি আপনাদের ওখানেই যাব।"

"অধ্যাপক বিশ্বামিত্র আপনার সঙ্গেই আছেন সুতরাং ওঁর সঙ্গে এখানে আসতে আপনার কোনো অসুবিধা হবে না। আপনার শরীর খুব রুগ্‌ণ দেখাচ্ছে তাই আপনাকে তাড়াহুড়ো করতে বারণ করছি।"

"সে ঠিক আছে। আপনাদের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী এবং অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের শুভেচ্ছা জানাই।"

"এখানে শব্দ-প্রসারণ যন্ত্রের মাধ্যমে সবাই আমাদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে। আচ্ছা এখন আপনি বিশ্রাম করুন।"

এই বার্তালাপ আমার মনে এক অদ্ভুত আনন্দের জোয়ার এনে দিলো। আমি বিশ্বামিত্রের হাত ধরে আমার জন্য নির্দিষ্ট ঘরটিতে ফিরে এলাম। বিশ্বামিত্রকে বললাম, "আমাদের পৃথিবীর সঙ্গে বর্তমান পৃথিবীর পার্থক্য অনেক। আর তুমি ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে এই তফাৎটা ভালোভাবেই জানো। কিন্তু আমার আশ্চর্য লাগছে এই ভেবে যে দুশ' বছর আগে আমি ঠিক এই রকমেরই এক সমাজ-ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেছিলাম যা বর্তমান পৃথিবীতে বাস্তবায়িত হয়েছে। সেই সময় সাম্যবাদের সূচনা কাল, কিন্তু মাত্র দুশ' বছরের মধ্যেই সাম্যবাদ সমগ্র পৃথিবীর বুকে এত বড় একটা পরিবর্তন ঘটিয়ে দেবে সেটা স্বপ্নেও চিন্তা করা কঠিন ছিল। তোমাদের এই নতুন পৃথিবীতে আমি আজই এসে পৌঁছেছি এবং বলতে গেলে এই নতুন বিধি-ব্যবস্থার প্রায় কিছুই এখনও পর্যন্ত দেখা হয়নি। কিন্তু যেটুকু দেখেছি এবং দেখছি তাতেই আমি বিস্ময় সায়রে ডুবে যেতে বসেছি। আমার এতেই সবচেয়ে বেশী আনন্দ যে, তোমাদের পৃথিবী কত দ্রুত প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে।"

নালন্দার কথা

"বলো বিশ্বামিত্র, তোমাদের বর্তমান নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা।"

"নালন্দা এখন এক বিশাল বিদ্যানিকেতন। পুরনো দিনের বড়গ্রাম থেকে রাজগৃহ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠভবন, ছাত্রাবাস ইত্যাদি বিস্তৃত। সারা বিশ্বে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন ও ইতিহাসের বিভাগ শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাই প্রত্যেক বছর ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি দেশগুলি থেকে ছাত্রেরা আসে। প্রাচীন বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংগ্রহশালা নালন্দা

বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই আর সেই সঙ্গে রয়েছে প্রাচীন ভাষা, লিপি ইত্যাদি পঠন পাঠনের সর্বোত্তম ব্যবস্থা। সংগ্রহশালাটি শুধু ভারতবর্ষে প্রাপ্ত জিনিসপত্রের ভাণ্ডার নয়, সার্বভৌম বিশ্বরাষ্ট্রের সহায়তায় ওখানে সংগৃহীত হয়েছে রোমক, গ্রীস, পারস্য, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশের ঐতিহাসিক মূল্যবান সামগ্রী। আন্তর্জাতিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান সর্বাগ্রগণ্য। দর্শন বিভাগেও নালন্দা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। সুদূর অতীত থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর সব দার্শনিক মতবাদ এখানে পড়াবার বন্দোবস্ত আছে। আমাদের আচার্য বশিষ্ঠ দর্শনশাস্ত্রের বিরাট পণ্ডিত ব্যক্তি। মহাকাশ শাস্ত্রের বিভাগটিও প্রশ্নাতীতভাবে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ভারতের নালন্দা এবং তক্ষশিলা পৃথিবীর অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম। আয়ুর্বেদ, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা এবং প্রাণীবিদ্যায় তক্ষশিলার খ্যাতি সর্বোচ্চ।"

"বুঝলাম। এখন শিক্ষাক্রম এবং পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু বলো।"

"১৭ বছর অধ্যয়ন তো সকলের জন্যেই বাধ্যতামূলক। এই নিয়ম শুধু সারা ভারতে নয় সমগ্র বিশ্বেই। ৩ বছর বয়সে শিশুদের নার্সারীতে নেওয়া হয়। তারপর ৬ বছর পর্যন্ত শিশুশ্রেণী। ৭ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত মাধ্যমিক শ্রেণী এবং ১৫ থেকে ২০ বছর পর্যন্ত উচ্চতর শ্রেণী। সাধারণত এখানেই অধ্যয়নের শেষ। এরপর ছাত্রছাত্রীরা নিজ নিজ রুচি ও যোগ্যতা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিতে যোগ দেয়। কিন্তু যাদের ঝোঁক উচ্চতর বিদ্যা অর্জনে তাদের নিজ নিজ বিষয়ে যোগ্যতা দেখাবার আরও সুযোগ দেওয়া হয় এবং সেটা সর্বদাই নির্ভর করে ছাত্রের যোগ্যতা এবং বিষয়ের ব্যাপ্তির ওপর।"

এইসব নানা বিষয়ে আমাদের আলোচনা হতে হতে প্রায় আটটা বাজল। অতিথিশালার পরিচালিকা শ্রীমতী পদ্মাবতী একবার এসে আমাদের অভিবাদন জানালেন। কিন্তু আমাদের গুরুগম্ভীর আলোচনায় ব্যস্ত দেখে উনি চলে গিয়েছিলেন। আবার ফিরে এসে আমাদের মনে করিয়ে দিলেন —আটটা বাজে; আমাদের নৈশ আহারের জন্যে এখনই যাওয়া উচিত। সময়-নির্দেশক তোপধ্বনি এখনই হবে।

দ্বাবিংশ শতাব্দী

আমি বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞেস করলাম, "সময় জানাবার জন্যে মাঝে মাঝে তোপধ্বনি করতে হয় কেন?"

"ব্যাপার হচ্ছে প্রত্যেকের কাছে ঘড়ি রাখার অনাবশ্যক খরচ রাষ্ট্র অনুমোদন করে না। এ জন্যে সময় জানানোর এই রকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঘুম থেকে ওঠার জন্যে একবার এবং চারবার খাবার জন্যে—এই মোট পাঁচবার তোপধ্বনি করা হয়।"

"কিন্তু আমি তো বাগানে সুমেধবাবুর হাতে ঘড়ি দেখেছি।"

"হ্যাঁ বাইরে যাঁরা কাজ করতে যান তাঁদের যিনি প্রধান তাঁর কাছে একটা ঘড়ি থাকে কিন্তু সবার কাছে নয়। সে যা' হোক হলো, এবার আমাদের ওঠা উচিত। এখনই তোপধ্বনি হবে নৈশ আহারের সময় ঘোষণা করে।"

ইতিমধ্যে তোপধ্বনি হলো। ততক্ষণে আমরা সবাই বেরিয়ে পড়েছি। দেব, পদ্মাবতী, বিশ্বামিত্র আর আমি একসঙ্গে অতিথি ভবন থেকে রওনা হয়েছি। রাস্তায় বিদ্যুতের এত আলো যে দিনের আলোকে হার মানায়। রাস্তার দু'পাশে একই ধরনের বাড়ি। প্রত্যেক বাড়ির সামনে কিছুটা খোলা জায়গায় ফুলের বাগান। এইসব বাড়িগুলোর ব্যবস্থাদি সম্পর্কে বিশ্বামিত্রের কাছে খোঁজ নিয়ে জানলাম, প্রত্যেকটি পরিবারের জন্যে তিনটি করে ঘর, সামনের দিকে বেশ বড় আয়তনের বৈঠকখানা, পেছনের দিকে শয়নকক্ষ এবং স্নানাগার। এই রকম তিনটি ঘর নিয়ে একটি ইউনিট আর একশ' ইউনিট নিয়ে এক একটি শ্রেণী। ঐ প্রত্যেক শ্রেণী থেকে একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন যিনি অবশ্যই ঐ শ্রেণীভুক্ত যে কোনো একটি বাড়ির বাসিন্দা। পরে আমি জেনেছিলাম, সুমেধও এইভাবে নির্বাচিত একজন শ্রেণী-প্রধান।

আমাদের সঙ্গে আরও অনেক স্ত্রী-পুরুষ পথ হাঁটছিল কিন্তু তাদের সঙ্গে কোনো শিশু দেখলাম না। মনে পড়ল, তিন বছর বয়স হলেই বাচ্চাদের আবাসিক বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, আর তিন বছরের কম বয়েসী বাচ্চাদের এই ঠাণ্ডায় বোধহয় বাইরে আনা হয়নি। আর একটু এগোতেই একটি বাড়ির গায়ে 'ভোজনাগার' কথাটি লেখা রয়েছে দেখতে পেলাম।

বাড়িটিতে ঢোকার অনেকগুলি দরজা। ঢুকেই বারান্দায় গরম জলের কলে সবাই দেখলাম হাত ধুচ্ছে, পাশেই তোয়ালে টাঙানো হাত-মুখ মোছার জন্যে। বড়

একটি হল ঘর যেখানে পাঁচ হাজার লোক স্বচ্ছন্দে একসঙ্গে বসে খেতে পারে। ঘরটির আভ্যন্তরীণ সাজ-সজ্জাও অপূর্ব। রান্নার জায়গা মনে হচ্ছে হল ঘরের পেছন দিকেই কোথাও হবে। আমাদের এখানে এসে হাজির হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার পূর্ব-পরিচিত গ্রাম-সভাপতি দেবমিত্র এবং অন্যান্যরাও এসে গেলেন। খাবার টেবিলে গিয়ে বসলাম ; আমার ডানদিকে দেবমিত্র, বাঁদিকে বিশ্বামিত্র বসলেন। টেবিলে আগে থেকেই থরে থরে খাদ্যবস্তু সাজানো রয়েছে—রুটি, মাংস, দু'রকমের তরকারি, হালুয়া, একটা ঝুড়িতে কিছু ফল আর প্রত্যেকের জন্যে এক গ্লাস করে জল। আমরা মিনিট দুই হলো বসেছি এমন সময় টিন্-টিন্ করে ঘণ্টা বেজে উঠল। দেবমিত্র আমাকে বললেন, এবার খাওয়া শুরু করা যাক। ঘণ্টা বাজানোর কারণ দেবমিত্রের কাছ থেকেই শুনলাম, যাতে সবাই পৌছানোর পর একসঙ্গে খাওয়া যায় তাই এই ব্যবস্থা।

এই সমবেত ভোজনশালার অনেক জিনিসই আমার কাছে অদ্ভুত লাগছিল। স্ত্রী-পুরুষেরা পাশাপাশি বসে নিঃসঙ্কোচে খাচ্ছে—এ রকম দৃশ্য বিশ শতকের প্রথম দিকে স্বপ্নেরও অতীত ছিল। আমি অবশ্য কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করিনি, কিন্তু সমবেত গ্রামবাসীদের সকলেই কি পোষাক-পরিচ্ছদে কি শিষ্টাচারে আমাদের সময়ের উচ্চবর্ণ-জাত ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বলে মনে হচ্ছিল। যদিও আমি শুনেছিলাম অর্জুনের মা-বাবা দু'জনেই সিংহলের অধিবাসী এবং এখানে দেখছি কারো কারো গায়ের রঙ ইউরোপীয়দের মতো গৌরবর্ণ। সব দেখে-শুনে নিজেই সিদ্ধান্তে পৌছালাম, এখানে, 'এক বর্ণমিদং সর্বম্'।

আহারাদির পর সবাই আবার গরম জলে হাত-মুখ ধুয়ে নিয়ে রওনা হলো। গ্রাম-সভাপতি আগেই সবাইকে জানিয়েছিলেন, গ্রামের সংস্থাগারে জমায়েত হতে। হ্যাঁ, একটা জিনিস এদের মধ্যে লক্ষ্য করলাম, কেউ জুতো মোজা খুলে পা ধুচ্ছে না অথবা পোষাকও পরিবর্তন করল না।

একটু দূরেই সংস্থাগার। আমরা পৌছে গেলাম। বাড়িটি খুব উঁচু এবং বৈদ্যুতিক আলোয় উদ্ভাসিত। বাড়ির মধ্যে ঢুকে দেবমিত্র আমাকে বললেন, সবাই এসে না পৌছানো পর্যন্ত আপনি সভামঞ্চের পিছনের ঘরটিতে বসে বিশ্রাম করুন। একটু বাদেই দেবমিত্র এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন মঞ্চের ওপর। সমবেত জনতার দৃষ্টি এখন আমার ওপর।

আমিও এবার ভালো করে সংস্থাগারটি দেখে নিলাম। মঞ্চের ওপর নানা রঙের বৈদ্যুতিক আলোর বন্যা। সমস্ত সভাগৃহটিই বিদ্যুতের আলোয় দিন হয়ে আছে। বাইরে যদিও বেশ ঠাণ্ডা এবং সভাগৃহের দরজা-জানালা সব খোলা রয়েছে তবু শীত নিয়ন্ত্রণের এমন চমৎকার ব্যবস্থা যে কোনো রকম কষ্টই হচ্ছে না। দেওয়ালের

ছাদের দিকে নানা রঙের আল্পনা। তা'ছাড়া সুবিন্যস্তভাবে সমস্ত সংস্থাগারের দেওয়ালে মনীষীদের আলোকচিত্র টাঙানো রয়েছে।

আমি উপস্থিত জনমণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তাদের মধ্যে কেউ রুগ্‌ণ বা দীন নেই। স্ত্রী-পুরুষ সবাই গদী-আঁটা চেয়ারে বসে অপেক্ষা করছে —সংখ্যায় তারা হাজার পাঁচেকের কম হবে না। তবুও মনে হচ্ছিল পেছনের দিকে আরও কয়েক শ' মানুষ অনায়াসে বসতে পারে। এই সংস্থাগার ভবনটি গ্রামের মানুষের বহুবিধ কাজে লাগে। এখানেই স্থানীয় অথবা বহিরাগত শিল্পীদলের নাচ-গান অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়, সামাজিক বা জাতীয় উৎসবেও এটি ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া গ্রামসভার সাধারণ অধিবেশন এবং শিক্ষামূলক আলোচনাচক্রের জন্য এটি যে গ্রামের সমস্ত মানুষের একান্ত প্রয়োজন সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

দেবমিত্র মঞ্চে দাঁড়িয়ে আজকের এই বিশেষ সমাবেশে সভাপতিত্ব করার জন্যে শ্রী ইসমাইলের নাম প্রস্তাব করলেন। প্রস্তাবের ভূমিকা হিসাবে দেবমিত্র বললেন, "যদিও আমাদের সকলের সঙ্গে কমরেড ইসমাইলের হৃদয়ের যোগ অবিচ্ছিন্ন, তবু আমাদের শ্রদ্ধেয় অতিথির অবগতির জন্যে জানাচ্ছি যে, কমরেড ইসমাইল আমাদের গ্রামসভার প্রাক্তন সভাপতি এবং বর্তমানে নেপাল গণপ্রজাতন্ত্রের নির্বাচিত সভাপতি। যদিও ওঁর বয়স ষাট বছর মাত্র, কিন্তু সমস্ত অর্জিত গুণাবলীর জন্য উনি আমাদের সকলের চেয়ে জ্যেষ্ঠ। আর একটা কথা, কমরেড ইসমাইল শুধু নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র নন, আমাদের মাননীয় অতিথির প্রায় সমকালীন, বৈশালীর মহাপুরুষ শফির বংশধরও উনি। আজকের পৃথিবীর প্রথম সারির রাষ্ট্রনীতি বিশেষজ্ঞদের অন্যতম হিসাবে শ্রী ইসমাইলের যে খ্যাতি সেই খ্যাতির অংশীদার আমাদের এই আপেলগ্রামও কারণ উনি আমাদের এই গ্রামেরই একজন।"

সমবেত জনমণ্ডলী করতালি ধ্বনির দ্বারা প্রস্তাবের পক্ষে তাদের সমর্থন ঘোষণা করল। ইসমাইল মঞ্চে এসে আসন গ্রহণ করলেন। বাস্তবিকই ইসমাইলের চেহারায় এক প্রতিভা-দীপ্ত ষাট বছরের যেন এক যুবককে আমি প্রত্যক্ষ করলাম! তবে ষাট বছর বয়সে যৌবনের তারুণ্য যেন এখানকার সব মানুষেরই!

ইসমাইল দাঁড়িয়ে উঠে সমবেত জনতাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলতে শুরু করলেন:

"কমরেডস্, অনেক জ্ঞানী এবং বয়োবৃদ্ধদের মধ্যে থেকে আমায় সভাপতিত্ব করতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এর কারণ আমার প্রতি আপনাদের অফুরন্ত ভালোবাসার নিদর্শন ছাড়া আর কিছু নয়। আমি আজকের সভার মাননীয় অতিথির আগমন সংবাদে বিশেষভাবে আনন্দিত ছিলাম। আমার সঙ্গে মাননীয় বিশ্ববন্ধুর অন্তরের একটা সুদীর্ঘ যোগসূত্র আছে। আমি শুধু নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের

ছাত্রই নই, আমার জন্মও ওখানে। আমার পিতামহ এবং আপনাদের পরিচিত শফি ১৫০ বছর বেঁচে ছিলেন। তাঁর কাছেই শুনেছি, কি প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে ওঁদের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনরুদ্ধার করতে হয়েছে। আমার পিতামহ ২৫ বছর বয়স থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নিজের উদ্যমকে নিয়োজিত করেন এবং মৃত্যুর পর ওখানেই সমাধিস্থ হন। ওঁর কাছেই শুনেছি, সেই সময় অনেকেই নালন্দার পুনরুদ্ধারের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের এদিকে ওদিকে কয়েকটি ছোট ছোট গ্রাম ছিল। সে সময় বর্তমান বুদ্ধ-পুষ্করিণীর হাজামজা দশা। বড়গ্রাম নামে ছোট একটি গ্রাম ছিল যেখানকার সূর্য মন্দির আজও রয়েছে। ঐ সূর্য মন্দিরটিকে কেন্দ্র করে সেকালে কার্তিক মাসে একদিনের একটি মেলা বসত। ঐ মেলাতে মেয়েরাই অংশগ্রহণ করতেন বেশী। আপনারা জানেন, তৎকালীন স্বার্থান্ধতার যুগে স্ত্রী-শিক্ষা ধর্মহানিকর বলে গণ্য হতো। আমাদের মুসলমান পূর্বপুরুষরা ধর্মের জিগীর তুলে মেয়েদের অর্গলবদ্ধ করে রাখতেন, আর তাঁদের দেখাদেখি উত্তর ভারতে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মেয়েদেরও গৃহবন্দীর জীবনযাপন করতে হতো। তবে ঐ কার্তিক মাসের মেলায় বছরে অন্তত একটি দিনের জন্যে তাঁরা বাড়ির বাইরে যাওয়ার সুযোগ পেতেন।

"সেই তমসাচ্ছন্ন যুগে আচার্য বিশ্ববন্ধু ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা করে উত্তরখণ্ডে চলে যান এবং তারপর তাঁর আর কোনো সংবাদ পাওয়া যায়নি। কিন্তু কে এমন আশা করতে পেরেছিলেন যে, আচার্য বিশ্ববন্ধুকে আমরা সুদীর্ঘ ২০০ বছর পরে ফিরে পাব! আমরা যখন বিশ্ববন্ধুর সংগ্রামী জীবনকাহিনী জানতে পারি তখন থেকে এই স্বপ্ন দেখে আসছি—আজকের সাম্যবাদী জগতে যদি তাঁকে আমরা ফিরে পেতাম তা'হলে তাঁকে মাথায় তুলে রাখতাম। নারীজাতির ওপর সামাজিক অত্যাচার যে কি জিনিস তা' আমরা জন্মাবধি দেখিনি। মানুষের মধ্যে উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ এখন আমরা ধারণাও করতে পারি না। ধর্মের নামে মারামারি-কাটাকাটি এখন কেউ জানেও না, কিন্তু একদিন এইসব অমানবিক কর্মকাণ্ড সমগ্র ভূ-ভারত জুড়ে তাণ্ডব করে বেড়াত। ইতিহাসে যখন আমরা এইসব ব্যাপারগুলো পড়ি তখন আমাদের হাসি পায়। কিন্তু এমন দিনও অতীতে ছিল যখন জনৈক শাসকের খামখেয়ালীপনার জন্যে হাজার হাজার মানুষকে যুদ্ধের আগুনে পতঙ্গের মতো আত্মাহুতি দিতে হয়েছে। সেই অন্ধকার যুগে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্যে যাঁরা ভগীরথের মতো চেষ্টা করেছিলাম আমাদের আজকের মাননীয় অতিথি আচার্য বিশ্ববন্ধু তাঁদেরই অন্যতম। তাই আমাদের হৃদয়ের আবেগ ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা অত্যন্ত কঠিন। আমাদের এই গ্রামের পরম সৌভাগ্য যে তিনি এই গ্রামেই প্রথম আতিথ্য গ্রহণ করেছেন।

"কমরেডস্ এই প্রবীণ মহাপুরুষকে আমরা কিভাবে সম্বর্ধনা জানাতে পারি? আমাদের কি এমন ঐশ্বর্য আছে যা' দিয়ে আমরা নিজেদের কৃতার্থ ভাবতে পারি? শুধু এই কথাই বলতে পারি, হে মহাত্মন, আমরা তোমার কাছে এক অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ, তোমার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা সবাই এখন আমাদের মাননীয় অতিথির মুখ থেকে কিছু শোনার জন্যে উদ্‌গ্রীব। কিন্তু মনে রাখবেন আমাদের এই আকাঙ্ক্ষা যেন নিষ্ঠুরতায় পরিণত না হয়। ২৬০ বছরের শরীরে দীর্ঘ ২০০ বছরের উপবাস নিয়ে আচার্য বিশ্ববন্ধু আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন—এই কথাগুলো মনে রেখে এবং পুনশ্চ আমাদের বিনীত কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি মাননীয় অতিথিকে দু'চারটি কথা বলার জন্যে অনুরোধ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।"

আমি খুব মনোযোগ দিয়ে ইসমাইলের বক্তব্য শুনছিলাম। শুনতে শুনতে আমার অতীত জীবনের অভিজ্ঞতা স্মৃতিপটে ভেসে উঠল। এবার আমায় কিছু বলতে হবে —উঠে দাঁড়ালাম।

"বন্ধুগণ, আমি আপনাদের মধ্যে এসে যা দেখছি সেই জিনিসই প্রতিষ্ঠার জন্যে আমাদের সময়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। আপনারা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন আমাদের সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন দেখে আমি কতটা অভিভূত। এই নতুন জগৎ আমি এ পর্যন্ত কতটুকুই বা দেখেছি। কিন্তু যা' দেখেছি তাই কি কম! মনে করুন, আজ যদি আপনাদের কেউ ১৯২৩ সালে ফিরে যেতে পারতেন তা'হলে আপনারা যে অভিজ্ঞতা লাভ করতেন সেই ব্যাপারেই কিছু বলি। এই আপেলগ্রামের মতো পাঁচ হাজার পরিবার অধ্যুষিত গ্রামের সে'সময় যে রকম অবস্থা ছিল তাই আপনাদের শোনাই। সকলেরই মাটির কাঁচা বাড়ি, তাও কোনোটার ছাদে খড় নেই, কিম্বা দেওয়ালের এক দিকটা ধ্বসে গেছে। দশটা বাড়ির মধ্যে হয়ত একটা বাড়ির ছাদ থেকে বর্ষার জল ঘরে ঢোকে না। ঘরের পাশেই নর্দমা সেখান থেকে পচা জল বর্ষার সময় আবর্জনার স্তূপের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যায়। তার মধ্যেই নোংরা কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোনো রকমে ঘিঞ্জি এলাকার মধ্যে দিয়ে যদি গাড়ী যেতে পারে তবে তখনকার দিনে সেটাই বড় সড়ক। সে সময় গরুর গাড়ী, না হলে এক্কা গাড়ী, মানুষ এবং মালপত্র পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হতো। আপনাদের প্রাচীন বস্তুর সংগ্রহশালায় ঐ ধরনের দু'একটি যানবাহন হয়ত রাখা আছে। আর এখন আপনারা সব কাজেই মোটর-গাড়ীর ব্যবহার করছেন, কিন্তু আমাদের সময়ে ঐ জিনিস একমাত্র বড়লোকদেরই ব্যবহার্য ছিল। আমিও কয়েকবার গরুর গাড়ী চড়ে আট-দশ ক্রোশ দূরের জায়গায় গিয়েছি এবং একটা গোটা রাত লেগে যেত ঐটুকু যেতে।

"হ্যাঁ, যে ধরনের গ্রামের কথা বলছিলাম সেখানে মানুষজন দারিদ্র্যসীমার এত নীচে বাস করত যে, তাদের অবস্থার যথাযথ আমি বর্ণনা করতে পারলেও আপনাদের ঠিকমতো হৃদয়ঙ্গম হবে বলে মনে হয় না। কিছু ধনী ব্যক্তিকে বাদ দিলে সাধারণ মানুষ একটি ধুতি আর গামছা সম্বল করে সারা বছর কাটাত। ৫-৬ বছরের ছেলেরা চার আঙ্গুল চওড়া কাপড়ের কৌপীন পরে ঘুরে বেড়াত। স্ত্রী-কন্যাদের পরিধেয় ছিল একখানি শতচ্ছিন্ন শাড়ি, ছিঁড়ে গেলে সেটাতেই তালি মেরে, সেলাই করে চালাতে হতো। তারপর সামাজিক অত্যাচারের কথা কত আর বলব। সেকালে কোনো কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে মেয়েদের জুতো পরা অপরাধ বলে গণ্য হতো। অবশ্য জুতো কেনার পয়সা তখন ক'জন লোকেরই বা ছিল! ছেঁড়া ন্যাকড়া সেলাই করে কেউ একখানা কাঁথা বানাতে পারলে সে নিজেকে ঐশ্বর্যবান বলে মনে করত। মাটিতে ঐ ধরনের ন্যাকড়ার কাঁথায় শুয়ে শিশুরা শীত কাটাত। খাটিয়া-চৌকি অধিকাংশ ঘরেই ছিল না। গ্রামের লোকজন শীতের দুঃসহ রাত কাটাবার জন্যে শুকনো খড়কুটো সংগ্রহ করে এক জায়গায় জমা করত। তারপর রাত্রি হলে সেই খড়কুটোয় আগুন দিয়ে তার চারধারে গোল হয়ে বসে শীতের রাত কাটাত।

"পচা-গলা-অস্বাস্থ্যকর খাদ্যও সব লোকের ভরপেট জুটত না। কত লোক অন্য কোনো উপায় না পেয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ভিক্ষা করত। আমি নিজের চোখে এমন দৃশ্যও দেখেছি —মানুষ কুকুরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে আবর্জনার গাদা থেকে ফেলে-দেওয়া এঁটো খাবার খুঁটেখুঁটে খাচ্ছে। অথচ সেকালে মানুষ যে পরিশ্রম-বিমুখ ছিল এমন নয়। হাজার হাজার লোক সকাল চারটে থেকে রাত্রি আটটা পর্যন্ত পরিশ্রম করেও দু'বেলা ভরপেট খাবার পেত না, পরিধেয় বস্ত্র সংগ্রহ করতে পারত না। ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত অবস্থায় তারা বছরের পর বছর পরিশ্রম করে যেত, যার ফল ভোগ করত কয়েকটি মুষ্টিমেয় মানুষ। অসুখ হলে তো আরও বিপদ। যারা অমানুষিক পরিশ্রমের বিনিময়ে সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব মেটাতে পারত না তারা চিকিৎসা করাবে কোথা থেকে! ১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসের কথা বলছি, তখন এই ভারতে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে ৬০ লাখ মানুষ মৃত্যুর কবলিত হয়েছিল—মাত্র ৪-৫ সপ্তাহের মধ্যে। মৃতের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিল দরিদ্র জনসাধারণ, যাদের কাছে না ছিল ঠাণ্ডার প্রকোপ থেকে আত্মরক্ষার উপযুক্ত আচ্ছাদন, না ছিল ওষুধ-পথ্য কেনবার মতো পয়সা। গরীব মানুষের প্রাণের মূল্য পথের কুকুর বেড়ালের চেয়ে বেশী ছিল না।

"ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ, আমি যে ভাষায় আমার বক্তব্য রাখছি সেটা বুঝতে হয়ত আপনাদের অসুবিধে হচ্ছে। তবু সে কালের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে

আপনাদের সাধারণভাবে অবহিত করতে চাইছি। এতক্ষণ শুনলেন, দেশের অধিকাংশ মানুষের অবস্থা, তাদের দারিদ্র্য, তাদের নিরাপত্তাহীন জীবনযাত্রার কথা। এবার আমি বর্ণনা করব মুষ্টিমেয় মানুষের কাহিনী যারা সেকালে পৃথিবীতে সব কিছু ভোগ্যদ্রব্যের অধিকারী ছিল। তারা ছিল বড় বড় ব্যবসায়ী, জমিদার, রাজা-বাদশা, কল-কারখানার মালিক ইত্যাদি। তারা সব বিরাট বিরাট চারমহলা, পাঁচমহলা প্রাসাদে থাকত। তাদের পরিচর্যার জন্যে প্রয়োজন হতো কয়েক শ' দাসদাসীর। অন্যের সম্মান বা সম্পদ নিজেদের আয়ত্তে আনতে কোনো রকম নৈতিকতার ধার ধারত না তারা। সাধারণ গরীব মানুষদের সঙ্গে তাদের ব্যবহার ছিল অমনুষ্যোচিত। এরা নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে যত খরচ করত সেই অর্থে তখনকার দিনের কয়েক হাজার পরিবার বেশ স্বচ্ছলভাবে জীবন কাটাতে পারত। সবচেয়ে অসহ্য লাগত যখন এই পরশ্রম-লুণ্ঠক, মুনাফাবাজ, লম্পট চরিত্রের লোকগুলো ধার্মিক, ধর্মরক্ষক, সমাজের নেতা হিসাবে স্বীকৃতি পেত। ঐ বদমাইশগুলোকে মদৎ দিত তখনকার দিনের বিচারক, বিদ্বান, পণ্ডিত, মৌলবী এবং পাদ্রীরা। ঐ তস্করের দল যখন বলত, জল উঁচু তখন মোল্লা, পুরুত পাদ্রীরা সমস্বরে তার প্রতিধ্বনি করত। সেকালের ধর্ম-যাজকরা এই মুষ্টিমেয় বড়লোকদের স্বার্থরক্ষার জন্যে নিজেদের ধর্মগ্রন্থ থেকে বুলি কপ্‌চাতো। সাধারণ দরিদ্রশ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রচার করত—ঈশ্বরের বিধানেই একজন রাজা বা ধনীব্যক্তি হয় এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই ঈশ্বরের অভিপ্রায়েই দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। এ সব তত্ত্ব জাহির করার জন্যে তারা জন্মান্তরবাদ, কর্মফল, ইত্যাদি নানা রকম আজব কল্পনার আশ্রয় নিত। মৌলবীরা বলত, আল্লাহ্ দুনিয়ার মঙ্গলের জন্যেই ধনী-দরিদ্র, প্রজা-বাদশাহ্ ইত্যাদি বানিয়েছেন—না হলে পৃথিবীর কাজ চলত কেমন করে। এই রকমভাবে পয়সাওয়ালা লোকদের স্বার্থ যাতে কোনোভাবে ক্ষুণ্ন না হয় সেটা এরা দেখত। প্রতিদানে ধনিকশ্রেণী এইসব লোক-গুলোকে ভালো বক্‌শিস দিত। আপনাদের মধ্যে এসে যতটুকু দেখেছি তাতে এটা বুঝতে আমার অসুবিধে হয়নি যে, আপনাদের পৃথিবী থেকে অসাম্য ব্যবস্থা চির-কালের মতো বিদায় নিয়েছে।

"আমার কথা শুনে আপনারা হয়ত ভাবতে শুরু করে দিয়েছেন, বিশ শতকের প্রথম দিকের কোটি কোটি মানুষ কি ভেড়ার পাল ছিল, যে জন্যে মুষ্টিমেয় পরশ্রম-ভোগী; লম্পট ধনিকশ্রেণীর খাঁচায় নিজেদের বন্দীদশা মেনে নিয়েছিল! আজকের সমাজ-ব্যবস্থায় এ রকম মনে হওয়াটা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু সেদিন অচল-অনড় অন্তহীন শোষণের যুগে সামান্যতম সামাজিক সংস্কারের কথা উচ্চারণ করলে তাকে পাগল, বিধর্মী, মানবতার শত্রু ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হতো। লেখাপড়া শিখে সুখী

স্বচ্ছল জীবনযাত্রা যাপন করার স্বপ্ন তখন গরীব মানুষদের মধ্যে ছিল কিন্তু সে স্বপ্ন হয়ত সার্থক হতো কয়েক হাজারের মধ্যে এক জনের। কারণ শিক্ষার সুযোগ সে যুগে ছিল খুবই সীমিত। সুতরাং সমস্ত মানুষই যে সমান, সকলেরই উন্নততর জীবন-যাপনের অধিকার আছে —এই সাধারণ তত্ত্বটিকে ধনিক-সম্প্রদায় সযত্নে এড়িয়ে চলত। আর দেশের গরীব জনসাধারণ ঐ ধরনের সমাজ-ব্যবস্থাকে অসম্ভব বলেই ভাবতে বাধ্য হতো। আপনারা হয়ত বলবেন, সে সময় এই সামান্য কথা, 'নিজের পরিশ্রমের ফল অন্যকে ভোগ করতে দেবো না'—এটা বলা বা করা এমন কি শক্ত কাজ ছিল! কিন্তু জেনে রাখুন, দীর্ঘদিন ধরে শোষণমুখী সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে পড়ে থাকা গরীব, শোষিত মানুষের মধ্যে ঐ ধরনের চিন্তার বিশেষ সুযোগও ছিল না। কারণ ধনিকশ্রেণী সর্বদাই এই রকম একটা প্রচার চালু রাখত যে, সামাজিক সাম্যের কথা বলা, অধর্মাচরণ, দেশদ্রোহিতা ইত্যাদি ইত্যাদি। দুর্ভাগ্যবশত সেকালে শ্রমজীবী মানুষরাও নিজেদের মধ্যে নানা উঁচু-নীচু সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। বিহারের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত গরীব শ্রমজীবী মানুষরা বলত, 'গরীব আছি, খেতে পাই না তাতে কি এসে যায়। রাজপুত, চামার এরা তো পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে, মহারাজ বলে সম্বোধন করে!' অর্থাৎ আমি না খেতে পেয়ে মরি, আমার শ্রম অন্যে ভোগ করুক তাতে ক্ষতি নেই কিন্তু উচ্চবর্ণের অহঙ্কার বজায় থাকলেই খুশী। তাই জাতপাতের বিচারটাই তখন দরিদ্র জনসাধারণের কাছে অগ্রাধিকার পেত, কিন্তু ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল নির্বিশেষে সকলেই যে মুষ্টিমেয় ধনিক সম্প্রদায়ের দ্বারা সমানভাবে শোষিত এবং নির্যাতিত —এই চেতনা তাদের মধ্যে সঠিকভাবে দানা বেঁধে ওঠেনি। আর এটাই চাইত শোষকশ্রেণী। দেশের সর্বস্তরে গরীব মানুষদের নিজেদের মধ্যে এই রকম অনৈক্য তাদের চিরস্থায়ী দুর্দশার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল।

"সব শেষে আপনাদের বর্তমান সময় সম্পর্কে দু' একটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। আপনারা কখনই যেন এটা ভেবে বসবেন না, আপনাদের বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা মানব-প্রগতির সর্বোচ্চ সোপান। সে রকম ধারণা নিয়ে থাকলে আপনাদের অগ্রগতি পশ্চাদ্গতিতে পরিণত হতে বাধ্য। মানব-প্রগতির, মানুষের অর্জিত জ্ঞানের কোনো শেষ সীমা নেই। আমাদের সময়ে জ্ঞান ও বিদ্যার যেটা চূড়ান্ত সীমা ছিল আজ সেখান থেকেই আপনারা শুরু করে আরো অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। আগামী দিনের মানব-সমাজ আজকের সর্বোচ্চ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় থেকে আরও এগিয়ে যাবে। এটাই ইতিহাসের নির্দেশ, এটাই মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারা। যেমন আজকের উন্নততর দূরবীক্ষণ, ক্যামেরা ইত্যাদি যন্ত্রের সাহায্যে মহাকাশের এমন নক্ষত্র আবিষ্কার করছেন যা' বিগতদিনে

মনুষ্য সমাজের জানা ছিল না। সেইরকম মহাকাশের আরও অনেক নক্ষত্ররাজির সন্ধান আগামী দিনের মহাকাশ বিজ্ঞানীরা দেবে যা' এখনও আপনারা খুঁজে পাননি। অর্থাৎ আমি এটাই বলতে চাইছি, যন্ত্র বা বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির যেমন কোনো সীমারেখা নেই ঠিক সেই রকম সমাজ-ব্যবস্থার চূড়ান্ত পর্যায় বলে কোনো স্থিতিশীল ব্যবস্থাও মেনে নেওয়া যায় না। এটা খুবই আমার কাছে ভালো লেগেছে যে, আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার সমস্ত সুফল মানব-সমাজের কল্যাণের কাজে লাগানো হচ্ছে। আজকের শিক্ষা সদনের দরজা সকলের জন্যেই উন্মুক্ত ; তাই সকলেই আজ শিক্ষিত এবং সমান সুযোগ সকলের জন্যে। এ ব্যবস্থা আমাদের সময়ে ছিল না। সর্বজনীন শিক্ষা-ব্যবস্থার অভাবে সেকালে সাধারণ মানুষ ঘোর তমসার মধ্যে, নানা কুসংস্কার ও অলীক ধ্যান ধারণার মধ্যে বন্দী থাকতে বাধ্য হতো। আজ তার অবসান ঘটেছে —তাই আমি আনন্দিত, আর তাই আমি আপনাদের ক্রমবর্ধমান প্রগতিতে দৃঢ়নিশ্চিত।"

আমার বক্তব্য শেষ করে বসে পড়লাম। কমরেড ইসমাইল উঠে আর এক দফা আমায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভা শেষ করলেন। আমি, বিশ্বামিত্র, ইসমাইল, দেবমিত্র, ইসমাইলের স্ত্রী প্রিয়ংবদা এবং আরও কয়েক জনের সঙ্গে সভামঞ্চের পেছনে বিশ্রাম কক্ষে এলাম। এখন সময় রাত্রি দশটা। আমি সকলের কৌতূহলের উত্তরে জানালাম, "আগামী তিনদিন আমি এই গ্রামেই থাকব এখানকার সব কিছু ভালোভাবে দেখব এবং বুঝবার চেষ্টা করব। তারপর অধ্যাপক বিশ্বামিত্রের সঙ্গে চলে যাব সোজা নালন্দায়। সেখান থেকে ভারতবর্ষের কয়েকটি জায়গায় যাবার ইচ্ছে রয়েছে এবং তারও পরে ভারতের বাইরে যাব এই রকম সঙ্কল্প এখন পর্যন্ত আছে।"

দেবমিত্র বললেন, "আপনার সঙ্গে কমরেড ইসমাইল এবং কমরেড প্রিয়ংবদাও থাকবেন। তাতে আধুনিক কালের ভাষা সর্বত্র আপনার পক্ষে বোঝা সহজ হবে।"

এরপর সবাই একে একে বিদায় নিলেন। আমি একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম, কমরেড ইসমাইল আমার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় মুসলমানী প্রথানুযায়ী আমায় সালাম জানালেন না। আমি প্রথম থেকেই এদের মধ্যে পুরনো দিনের আদব-কায়দার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করে কৌতূহলী হচ্ছিলাম। এখন ইসমাইলের সালাম না-জানানো ব্যাপারটি দেখে আর থাকতে পারলাম না। পাশেই অধ্যাপক বিশ্বামিত্র ছিলেন। জিজ্ঞেস করলাম, "বিশ্বামিত্র, যদিও এখানকার লোকজনের নামের মধ্যে হিন্দু নাম মুসলমানী নাম দু'রকমই পাচ্ছি কিন্তু সকলের পোষাক, কথাবার্তা আদব-কায়দা একই ধরনের। তা'হলে কি সব পুরনো সংস্কার মিলেমিশে এক হয়ে গেছে ?"

"সমস্ত প্রগতি-বিরোধী সংস্কারকে আমরা জনজীবন থেকে দূর করে দিয়েছি। নাম রাখার ব্যাপারটা ওটা ব্যক্তিগত পছন্দ অনুযায়ী। আর ভাষা? এখন সমগ্র ভারতে একটি মাত্র ভাষা 'ভারতী'। যেটা গড়ে উঠেছে আপনাদের সময়কার হিন্দী উর্দু প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষার সংমিশ্রণে। যদিও বিভিন্ন অঞ্চলে সাহিত্যিক অনুসন্ধিৎসার জন্যে অন্যান্য প্রাচীন ভাষাগুলির যথেষ্ট চর্চা হয় কিন্তু সকল ভারতীয় 'ভারতী' ভাষাকে গ্রহণ করেছেন তাঁদের নিজেদের মধ্যেকার সংযোগ রক্ষাকারী ভাষা হিসাবে। আর এখন তো আপনাদের সময়ের মতো কোনো একপেশে ব্যাপার নেই তাই ভাষা বেশভূষা সকলের এক হয়ে গেছে।"

অতিথিভবনে ফিরে এসেছি, বিশ্বামিত্র তাঁর ঘরে চলে গেছেন। এখন আমি একা বিছানায় শুয়ে, কিন্তু ঘুম আসছিল না। বাইরে যে কি রকম ঠাণ্ডা সেটা আগেই বলেছি, তবে এই শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত ঘর যথেষ্ট উষ্ণ এবং আরামদায়ক। আকাশে চাঁদের আলো, সামনের গাছটার মাথা টপ্‌কিয়ে সেই আলো আমার ঘরের মধ্যেও উঁকি দিচ্ছিল। দূরে একটা পাহাড়ের চূড়া দেখা যাচ্ছে। এখন কোনো শব্দ নেই যা আমার ঘুমকে বিঘ্নিত করতে পারে। কিন্তু আমি ঘুমোতে পারছি না। সারাদিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাগুলি যেন দ্রুত চলমান পটের মতো আমার মনের মধ্যে চলতে শুরু করেছে। প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতার সঙ্গে একরাশ করে কৌতূহলী প্রশ্ন—আবার সেইসব প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর আমাকে বেশ উত্তেজিত করছিল।

স্ত্রী-স্বাধীনতার দৃশ্য এবং অভিজ্ঞতা মনে হতেই আমি সেই সুদূর অতীতে ফিরে গেলাম। যেন নিজের অজান্তেই কিছুটা বিষণ্ন হয়ে উঠলাম এই ভেবে, দু'কুড়ি চার কুড়ি করে হিসাব বলার মেয়ে এ যুগে আর পাওয়া যাবে না; পাওয়া যাবে না সম্ভবত রূপকথার গল্প শোনানো মায়েদেরও। সেকালের ধনী ব্যক্তিদের কথা মনে হলো। এখন তো ও সব পরগাছা শ্রেণী অবলুপ্ত। রাজ-বাহাদুর, নবাব-বাহাদুর, রায়বাহাদুর, খানবাহাদুর খেতাবের দাতা ও প্রার্থীরা উভয়েই পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিয়েছে। নতুন পৃথিবীর গ্রাম, সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্যে পরিচয় হয়েছে কিন্তু আমার পুরনো পৃথিবীর ৬০ বছরের স্মৃতি যেন এর মধ্যেই অনেকটা ফিকে হয়ে আসছে। সে যাক, এদের সংগ্রহশালায় গিয়ে ও সব পুরনো স্মৃতি দরকার হলে ঝালাই করে নিয়ে আসা যাবে।

এই নতুন সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে আমার মনে নানা প্রশ্ন, কৌতূহল। এমন সময় অতিথিভবনের ঘড়িতে ১১টা বাজল। ভাবলাম, আর দেরী করা ঠিক নয়। আগামীকালের একটা খসড়া কর্মসূচী ঠিক করে ঘুমিয়ে পড়ব। মনে মনেই ঠিক করলাম, আপেলগ্রামের বাগান এবং সেখানকার কাজকর্ম তো দেখাই হয়ে

গেছে সুতরাং চিকিৎসা-সদন শিশুপালনের ব্যবস্থাদি কালকেই দেখে নেব মোটামুটি এটা ঠিক করে নিদ্রাদেবীর শরণাপন্ন হলাম।

গ্রামীণ সমাজ-ব্যবস্থা

পাঁচটা বাজার আগেই আমার ঘুম ভেঙে গেলো। বিছানা ছেড়ে উঠে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। আকাশে তখনও তারাগুলো জ্বলজ্বল করছে; অস্তগামী চাঁদের আলো অতিথিভবনের সংলগ্ন ফুলের বাগানটিতে এসে পড়ছে। ফুলের গন্ধ খোলা জানালা দিয়ে এসে আমার ঘরটিকে ভরিয়ে দিলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সময় নির্দেশক তোপধ্বনি হলো, অর্থাৎ পাঁচটা বাজল —এবার সমস্ত গ্রাম জেগে উঠে কর্মমুখর হবে। এর মধ্যেই আমার তত্ত্বাবধায় কমরেড দেব এসে পৌঁছাল। প্রথমে দরজা একটু ফাঁক করে দেখে নিলো, আমি ঘুম থেকে উঠেছি কিনা, তারপর ঘরে ঢুকে আমায় জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি এখন স্নান করবেন? যদি করেন তা'হলে ঘরের লাগোয়া শৌচাগারেও যেতেও পারেন কিম্বা অতিথিভবনের সাধারণ বড় শৌচাগারও ব্যবহার করতে পারেন —যা' আপনি ভালো মনে করেন।"

আমি ঘরের পাশেই শৌচাগারটির দিকে চলে গেলাম। কে বলবে এটি একটি গ্রামের অতিথিভবনের শৌচাগার! অতি পরিচ্ছন্ন, সব কিছুর সুবন্দোবস্ত। পরে বিস্তারিতভাবে এখানকার পয়ঃপ্রণালী এবং জঞ্জাল সাফাইয়ের ব্যবস্থাদি শুনে মনে হলো, স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ-দূষণ সম্পর্কে এরা কত সতর্ক এবং উন্নত কলাকৌশলের অধিকারী।

শৌচাগারে জলের কল খুলে দিলেই সমস্ত ময়লা ধুয়ে বেরিয়ে যায়। তারপর মাটির নীচে বসানো নলপথ দিয়ে সেগুলো গ্রামের বাইরে গিয়ে জমা হয়। সেখানে যন্ত্রের সাহায্যে মাটিতে বড় বড় গর্ত খোঁড়া থাকে, এবং গর্তের পাশেই মাটি জমা থাকে। নলপথে গ্রামের সমস্ত ময়লা এক দিক থেকে গর্তে এসে পড়ে অন্য দিক থেকে যন্ত্রের সাহায্যে মাটি ফেলে স্তূপীকৃত ময়লাকে চাপা দেওয়া হয় যাতে করে কোনো-রকম দুর্গন্ধ বাতাসে ছড়াতে না পারে। একটা গর্ত ভরাট হয়ে গেলে ময়লা-নিষ্কাসনী নলের মুখ অন্য একটি খালি গর্তের দিকে ঘুরে যায়। তিন-চার বছর পরে মাটি-চাপা ময়লার সঙ্গে অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য মিশিয়ে কৃষি-ক্ষেত্রের সার তৈরী করা হয়। বলা বাহুল্য, এইসব কাজ মানুষ যন্ত্রের সাহায্যে এমন নিপুণ-ভাবে করিয়ে নিচ্ছে যে সমাজে মেথর বা ধ্যাঙড়দের কাজ করার লোকের দরকার

হয় না। অবশ্য যন্ত্রের গোলোযোগ ঘটলে সেটা ঠিক করার জন্যে যন্ত্রবিদ্‌রা আছে কিন্তু তাদের সঙ্গে সমাজের অন্য মানুষদের সঙ্গে কোনো রকম পার্থক্য নেই!

শৌচাগার থেকে স্নানের ঘরে ঢুকলাম। ঠাণ্ডা এবং গরম দু'রকমেরই জলের কল রয়েছে। দুধের মতো সাদা চীনামাটির বাথটব। কলের কাছে দেওয়াল আলমারীতে সাবান, তোয়ালে, পরিষ্কার কাপড় সব সাজানো রয়েছে। গরম জলের কল খোলাই ছিল এবং বাথটব প্রায় ভর্তি কিন্তু জল উপ্‌চে মেঝেতে পড়ছে না। প্রথমে আমি ভালো করে হাত-মুখ ধুয়ে নিলাম। তারপর দাঁত মাজার কথা মনে পড়ল। কিন্তু বাথরুমে দাঁতন জাতীয় কোনো পদার্থ আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হলাম। দেখলাম একটা নতুন দাঁত মাজার ব্রাস রয়েছে, তার পাশেই একটা রূপালী টিউবে সুগন্ধিত পেষ্ট। অগত্যা ওতেই কাজ সেরে নিলাম। পরে বিশ্বামিত্রকে দাঁতনের অভাব জানাতে উত্তর পেয়েছিলাম —দাঁতনের ব্যবহার অনেক দিনই উঠে গেছে। কারণ অপ্রয়োজনীয় গাছের বনজঙ্গল এখন আর নেই। আর প্রয়োজনীয় মূল্যবান বৃক্ষসম্পদের ডাল ভেঙে গোটা পৃথিবীর মানুষের দাঁতনের যোগান দিতে হলে প্রত্যেক দিনই একটা মাঝারি আয়তনের বনভূমি উজাড় হয়ে যাবে। তাই বাদাম ডালিমের খোসাগুলো ফেলে না দিয়ে তার থেকে এমন দাঁত-মাজার জিনিস তৈরী করা হয়েছে যা' একই সঙ্গে দাঁত-মাড়িকে সুস্থ রাখে আর মুখের ভেতরটা তরতাজা করে দেয়। যাইহোক দাঁত মাজার পর বাথটবে নেমে সাবান মেখে ভালো করে স্নান করলাম। তারপর কাপড় বদলিযে বাইরে আসতেই কমরেড দেব বাথরুমে ঢুকে বাথটব-সংলগ্ন একটা কলের চাবি ঘুরিয়ে দিতেই জলের তোড়ে আপনা-আপনিই বাথটবটা ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার হয়ে গেলো। বাথরুমেরই পাশে একটা উঁচু মতো জায়গায় একটা আসন পাতা, আমি ওখানে বসে হাল্কা ধরনের একটু ব্যায়াম করে নিলাম। তারপর ঘরে ফিরে বৈঠকখানা অংশে একটা চেয়ারে এসে বসলাম।

এতক্ষণে সূর্য উঠেছে, পূবদিক লাল হয়ে আছে। পাখীর সুমধুর কাকলি ঘরের মধ্যে বসে শুনতে পাচ্ছিলাম। সকালের রোদে সমস্ত বাড়িগুলো যেন ঝক্‌মক করছিল। এমন সময় বিশ্বামিত্র এসে ঘরে ঢুকলেন ওর সঙ্গে সঙ্গে পদ্মাবতীও এলেন। ওদের দু'জনেই আপাদমস্তক পশমী পোষাকে ঢাকা। কিন্তু ঘরের মধ্যে শীত-নিয়ন্ত্রণের জন্যে যন্ত্রটা চালু রয়েছে তাই মনে হলো বাইরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছে ওরা।

এই নতুন জগতে যা' কিছু দেখছি তারই বিস্তারিত বিবরণ দিতে ইচ্ছে হচ্ছে। যেমন স্ত্রী-পুরুষদের পোষাক। সকলেরই একই ধরনের পরিচ্ছন্ন সুরুচিকর পোষাক, কোনো দীনতা যেমন নেই তেমনি স্বাভাবিক কাজ-কর্মের বাধা সৃষ্টি করতে পারে

এ রকম আড়ম্বরও নেই। কর্মস্থলে সব স্ত্রী-পুরুষের এক রকমের পোষাক—পশমের জাঙ্গিয়া, লম্বা মোজা ও জুতো। আবার জুতোগুলোও চামড়ার নয়। চামড়ার মতোই দেখতে এক ধরনের মোটা কাপড়ের তৈরী এবং জুতোর নীচে পুরু রবার সোল। জামার ওপর কোট এবং সকলের মাথায় একই রকমের টুপি। তবে ঐ কাজের সময়ের পোষাক অন্য সময় পরে না। গতকাল রাতে খাবার সময় কিম্বা সংস্থাগারে সমবেত স্ত্রী-পুরুষদের পোষাক ছিল অন্যরকম। জামা-পাজামা, হাঁটু-ঝুল ওভারকোট এবং গোল টুপি। মহিলাদের সে সময় শাড়ী পরতে দেখেছি তবে ওভারকোট আর টুপি পুরুষদের মতোই। পুরুষরা তো নয়ই, মেয়েরাও কেউ অলঙ্কার ধারণ করে না। তবে সংখ্যায় অল্প হলেও কিছু লোক সাবেক আমলের মতো চশমা পরে ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তিকে সচল রাখে। প্রত্যেকের কাছে অবশ্য একটা কলম এবং ডায়রীর মতো খাতা থাকে। গতকাল আমি যখন দিনপঞ্জী লিখতে চেয়ে কাগজ আর কলম চেয়েছিলাম আমাকেও ঐ রকম একটা ডায়রী এবং কলম দেওয়া হয়েছে। কলমের নিবটা খুব সুন্দর, বোধহয় সোনার সঙ্গে কোনো শক্ত ধাতু মিশিয়ে তৈরী। সোনার গহনা পরার চল যখন উঠেই গেছে তখন কলমের নিব বা ঐ ধরনের প্রয়োজনীয় কাজে সোনা ব্যবহারের অসুবিধা নেই।

বিশ্বামিত্র এবং পদ্মাবতী আসার কিছুক্ষণের মধ্যে ইসমাইল এবং তার স্ত্রী প্রিয়ংবদা এসে গেলো। প্রিয়ংবদা জানাল, আজ সকালে জলযোগের পর এই গ্রামের শিশুনিকেতনটি দেখতে যাওয়ার অনুরোধ। প্রিয়ংবদা ঐ শিশুনিকেতনের সহ-অধিকর্তী। এখানে আসার আগে ওখানকার প্রধানা কমরেড ফতিমার সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলে এসেছে। আমার কোনো কিছুতেই আপত্তি নেই। মনে মনে ঠিক করলাম বরং দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে গ্রামের চিকিৎসালযটি দেখতে যাওয়া যাবে। আমাদের এইসব নিয়েই কথাবার্তা হচ্ছিল এমন সময় সকালের জলযোগের সময়-নির্দেশক তোপধ্বনি হলো। আমরাও গুটিগুটি খাওয়ার বাড়িটির দিকে পা বাড়ালাম।

গতকালের মতোই হাতমুখ ধুয়ে আমরা জলযোগের জন্যে টেবিলে বসলাম। প্রত্যেকের প্লেটে দুটো করে সেদ্ধ ডিম, জিলিপী এবং ছানার তৈরী একটা করে মিষ্টি। তা'ছাড়া আর একটা প্লেটে তাজা এবং শুকনো ফল। পানীয় হিসাবে রাখা ছিল এক গ্লাস করে গরম দুধ এবং জল। যথানিয়মে খাওয়া শুরু করার ঘণ্টা পড়ল।

জলযোগ শেষ করে আমি, বিশ্বামিত্র, ইসমাইল এবং প্রিয়ংবদা এক সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের উদ্দিষ্ট শিশুনিকেতনটি এই ভোজনশালা থেকে বেশ কিছুটা দূরে। আমরা ঢিমে তালে হাঁটছি, খুব তাড়াহুড়োর কোনো

ব্যাপার তো নেই। রাস্তায় বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা, তোমাদের এই নতুন সমাজ-ব্যবস্থায় পান-বিড়ি খাওয়ার পাট উঠিয়ে দিয়েছ ?"

"শুধু পান-বিড়ি নয়, সব কিছু নেশার জিনিসের প্রচলন উঠে গেছে। গাঁজা, আফিম্, ভাঙ এখন কোনো কিছুই পাওয়া যায় না। আসলে ওর কোনোটিই মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নয়, সুতরাং যাতে জনসাধারণের শরীরের ক্ষতি হতে পারে এমন কোনো কিছুই পাওয়া যাবে না। তা'ছাড়া রাষ্ট্র অনাবশ্যক ব্যয় অনুমোদন করে না। পান বা তামাকের কথাই ধরুন। শুধু ভারতের ৬০ কোটি লোকের নেশার জোগান দেওয়ার জন্যে যদি পান বা তামাক চাষ করতে হয় তা'হলে কত জমির প্রয়োজন, কত শ্রমের দরকার ? তাই আগে যে সব জমিতে ঐ সব জিনিস চাষ হতো এখন সেখানে প্রয়োজনীয় ফসল উৎপন্ন হয়।"

আমি বললাম, "বুঝেছি। তোমাদের প্রগতিশীল সমাজ-ব্যবস্থায় পুরনো দিনের মানুষের বাজে অভ্যাসগুলি দূর করেছ। এখন তো দেখছি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে একই পংক্তিতে বসে আহার করছে। কিন্তু আমাদের সময়ে দুই সম্প্রদায়ের মাংস খাওয়া না-খাওয়ার ব্যাপারে যে বাচ-বিচার ছিল সেটার সমাধান করলে কিভাবে ?"

"এখন কোনো জীব-জন্তুর মাংস আমরা খাই না। মাংস হিসাবে যা' আপনি খেয়েছেন আমাদের সঙ্গে সে-সব কৃত্রিমভাবে তৈরী মাংসের স্বাদ-গুণ বিশিষ্ট উদ্ভিদ্-জাত খাদ্য।"

"আর ডিম ?"

বিশ্বামিত্র একটু হেসে উত্তর দিলেন, "ওটাকে আমরা পরম সাত্ত্বিক আহার হিসেবেই গ্রহণ করি।"

"এখন কি তবে ইউরোপ আমেরিকায় মাংসের চাহিদা পূরণের জন্যে শূকর পালন করা হয় না ?"

"দরকার হয় না। তা'ছাড়া আপনি দেখতেই তো পাচ্ছেন, লোকালয়ের মধ্যে কোনো জীব-জন্তু নেই। এখন জাতি নির্মূলকারী ব্যবস্থায় অপ্রয়োজনীয় জীব-জন্তু প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। শুধু প্রাণীবিদ্যার চর্চা এবং জীবের ক্রমবিকাশের গবেষণার জন্যে সংরক্ষিত অঞ্চলে ঐ সব জীবজন্তুর সাক্ষাৎ মিলবে।"

আমি বললাম, "প্রাণীজ মাংস বর্জন করেছ, কিন্তু তোমরা দুধের প্রয়োজন মেটাতে নিশ্চয়ই গরু-মোষ পালন কর। এখন তোমাদের পালিত গরু-মোষ স্বাভাবিক নিয়মেই প্রতিদিনই কিছু না কিছু মারা যায়। তাদের মাংস তোমরা না হয় না খেলে কিন্তু মৃত গরু-মোষের চামড়া দিয়ে মেসিনের ভালো বেল্ট তো তৈরী করতে পারো।"

"বর্তমানে মেসিনের বেল্ট যে কৃত্রিম তন্তু থেকে উৎপন্ন হয় তা' গোরু-মোষের চামড়ার থেকে অনেক বেশী মজবুত। তা'ছাড়া মৃত পশুদের শরীর থেকে চামড়া ছাড়ানো, সেই চামড়াকে ব্যবহারোপযোগী করা খুবই সময়-সাধ্য নোংরা কাজ। আর ঐ কাজের ফলে বাতাসে দুর্গন্ধ ছড়ায়। তাই আমরা পালিত পশুদের মৃতদেহগুলি মাটিতে পুঁতে ফেলি। পরে সেটা সার হিসাবে চাষের কাজে লাগাই।"

আমরা কথা বলতে বলতে পথ চলছিলাম। লক্ষ্য করলাম, রাস্তার মানুষজন বেশ অবাক অবাক চোখ করে আমাকে দেখছে। গ্রামটা পাহাড়ের পাদদেশে আবার গ্রামের পাশ দিয়েই একটা পাহাড়ী নদী বয়ে যাচ্ছে। পাহাড় আর নদীর মাঝখানের অংশটুকুতেই গ্রামটির বিস্তার। ফলে পাঁচ-হাজার মানুষ অধ্যুষিত গ্রামটি বেশ লম্বাটে। উত্তরে পাহাড় দক্ষিণে নদী—মাঝখানে গ্রাম। তাই গ্রামটি পূব-পশ্চিমে লম্বা। পাঁচটি সমান্তরাল প্রশস্ত পথ গ্রামের পূব থেকে পশ্চিমে চলে গেছে। গ্রামের সংস্থাগার এবং ভোজনালয় গ্রামের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায়। সংস্থাগারের সংলগ্ন একটা সাধারণ পাঠাগার রয়েছে। বিশ্বামিত্র জানাল, সমস্ত গ্রামবাসীদের পোষাক-পরিচ্ছদ আসে দর্জিগ্রাম থেকে। তবে সামান্য ছেঁড়া-ফাটা সেলাই করার জন্যে গ্রাম সভার কার্যালযের সামনেই একটা ছোট দর্জি-কারখানা আছে। গ্রামের উত্তর দিকে পাহাড়ের কোল ঘেঁসে কাপড় কাচার ব্যবস্থা আছে, সেখানে যন্ত্রের সাহায্যে কাপড় কাচা, কাপড়ে মাড় দেওয়া হয়। তারপর বড় বড় হলঘরে গরম বাতাসের সাহায্যে সেগুলো শুকিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। আর একটু এগিয়েই চোখে পড়ল ভোগ্যবস্তু জমা রাখার গুদাম ঘর। তারপরেই মোটর গ্যারেজ এবং অন্যান্য জিনিসের গুদাম। গ্রামের একদম শেষপ্রান্তে একটা ছোট কারখানা। যেখানে খুব জরুরী প্রয়োজনের যন্ত্রপাতি সারানোর ব্যবস্থা আছে। অবশ্য বড় ধরনের কাজের জন্যে আলাদা-আলাদা কারিগরদের গ্রাম আছে যেখানে সারা দেশের সেরা যন্ত্রকুশলীরা থাকে। এই গ্রামের একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো, গ্রামের সমস্ত কার্যালয়ই পশ্চিমমুখী এবং উত্তর-দক্ষিণগামী রাস্তার ওপর অবস্থিত।

কথা ছিল এ বেলাই শিশুনিকেতনটি দেখতে যাওয়ার। কিন্তু এইসব দেখতে দেখতেই দুপুরের খাবার সময় হয়ে গেলো। অগত্যা ভোজনশালার দিকে সকলেই ফিরে চললাম। ভোজনশালা থেকে আমরা যখন গজ বিশেক দূরে তখন সময় নির্দেশক ১১টার তোপধ্বনি হলো। পূর্ববৎ হাত-মুখ ধুয়ে এক এক করে সবাই এসে খাবার টেবিলে জড়ো হচ্ছিল। এখনকার খাদ্যবস্তুর আয়োজন দেখে মনে হচ্ছিল যেন আগের কালের মধ্যাহ্ন ভোজের ব্যাপার। রুটি, ডাল, মাংস, পকৌড়া সব পরিচিত ভোজ্যবস্তু। আমার বাঁদিকে বিশ্বামিত্র এবং ডানদিকে ইসমাইল।

খাওয়া শুরু করতে তখনও কয়েক মিনিট দেরী আছে তাই ভাবলাম এই ফাঁকে রান্নাঘরটি দেখে আসি।

রান্নাঘরটি ভোজনশালার বড় হলঘরটির বাঁদিকে। রান্নাঘরে নানা ধরনের ঝক্‌ঝকে বাসনপত্র তবে সেগুলো দরকার মতো নামানো ওঠানো হচ্ছিল যন্ত্রের সাহায্যে। আটা মাখা, রুটি তৈরী করার কাজও হচ্ছে মেশিনে। রান্না হচ্ছে বৈদ্যুতিক চুল্লীতে। এতবড় রান্নাঘর যেখানে পাঁচ হাজার লোকের খাদ্য প্রস্তুত হয় সেখানে কোথাও একটুও কালি বা ধোঁয়া নেই। প্রত্যেকটি খাবার চুল্লীতে বসানো এবং নামানোর নির্দিষ্ট সময় আছে। সেইসঙ্গে চুল্লীর তাপ-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও রয়েছে। ফলে কোনো জিনিসই আধসেদ্ধ কিম্বা পুড়ে যাবার সম্ভাবনা নেই। সব খাদ্যবস্তুই এই রান্নাঘরে এসে পৌছায় টাট্‌কা এবং পরিষ্কার অবস্থায় তবু এখানে সে সব রান্না করে পরিবেষণের আগে একজন বিশেষজ্ঞ সব কিছুর গুণাগুণ পরীক্ষা করেন এবং তাঁর অনুমতি না পেলে কোনো জিনিসই রান্নার জন্যে ব্যবহার করা হয় না। রান্নাঘরের সব কর্মীরাই কাজে ব্যস্ত রয়েছে —থালা-বাটি খাবার ভর্তি করে কন্‌ভেয়ার বেল্টের ওপর তারা সাজিয়ে রাখছিল। সাজানো শেষ হলে বিদ্যুৎ-চালিত কন্‌ভেয়ার বেল্ট রান্নাঘর থেকে সেগুলো খাবার ঘরে পৌছে দেবে। তারপর সেখানে কয়েকজন কর্মী সেগুলোকে কন্‌ভেয়ার বেল্ট থেকে নামিয়ে খাবার টেবিলে সাজিয়ে রাখবে। আবার সকলের খাওয়া শেষ হলে এঁটো থালা-বাসন কন্‌ভেয়ার বেল্ট বাহিত হয়ে বাসন-মাজার ঘরে পৌছে যাবে। সেখানে গরম জল এবং বাসন পরিষ্কারকারী রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা সেগুলো মাজা-ধোয়া হবে —বলা বাহুল্য এ কাজটাও করা হবে যন্ত্রের সাহায্যে। আর পাতে ভুক্তা-বশিষ্ট যা থাকে সেগুলো এক করে ঢাকা মোটর গাড়ীতে পুরে গ্রামের বাইরে নিয়ে গিয়ে পুঁতে ফেলা হয়। পরে সেগুলো সারে পরিণত হলে ক্ষেতের কাজে ব্যবহার করে। তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, এরা খাদ্যদ্রব্য খুবই কম পাতে ফেলে রেখে নষ্ট করে —যার যেটুকু দরকার সে সেইটুকুই নেয়।

খাওয়া শুরু করার সময় নির্দেশক ঘণ্টা বাজার আগেই আমরা নিজের নিজের জায়গায় বসে গিয়েছিলাম। পরম তৃপ্তির সঙ্গে ভোজনপর্ব সমাপ্ত হলো। এরপর আমরা ঠিক করলাম গ্রামের চিকিৎসা কেন্দ্রটি দেখতে যাব। গ্রাম-সভাপতি দেবমিত্রও আমাদের সঙ্গী হলেন।

চিকিৎসা-কেন্দ্রের বড় গেটটির সামনে কমরেড মনোরমা এবং তার কয়েকজন সহকর্মী আমাদের স্বাগত জানাবার জন্যে দাঁড়িয়েছিলেন। একজন সহকারী চিকিৎসক ছাড়া এখানকার সমস্ত কর্মীরাই মহিলা। সহকারী চিকিৎসক আর কেউ নন, তিনি হলেন কমরেড মনোরমার স্বামী শ্রী রহিম ব্রহ্ম। এই চিকিৎসক

দম্পতির জন্ম কাশ্মীরে কিন্তু দু'জনেই তক্ষশিলাতে লেখাপড়া করেছেন এবং দু'জনেই তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসা-শাস্ত্রের সর্বাধুনিক বিদ্যায় কৃতী।

আমার ধারণা ছিল, পাঁচ হাজার মানুষের বসতি যে গ্রামে সেখানকার চিকিৎসা-কেন্দ্রে রোগীর সংখ্যার হার সেই অনুপাতেই হবে। কিন্তু আমার ভুল ভাঙলো যখন জানলাম সর্বসাকুল্যে মাত্র ৫০ জন ব্যক্তি এখানে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এই চিকিৎসা-কেন্দ্রে একবার রোগীর সংখ্যা ১০০ হয়েছিল এবং সেটাই না-কি এখানকার সর্বকালের রেকর্ড। নতুন পৃথিবী থেকে কুষ্ঠ, অর্শ, যৌনরোগ, যক্ষা, হাঁপানী একেবারে নির্মূল হয়ে গেছে। সাধারণত এখানে যারা ভর্তি হয় তাদের অসুখের মধ্যে জ্বর, মাথাব্যথা, বদহজম কিম্বা কোনো শারীরিক আঘাতের শুশ্রূষার জন্যে।

কমরেড মনোরমা আমাকে বলল, "আজকাল চিকিৎসা-শাস্ত্রে যত রোগের বিবরণ এবং তার প্রতিবিধান পড়ানো হয় তার বেশীর ভাগই বাস্তবে কোনো কাজেই লাগে না —অতীতের অনেক দুরারোগ্য রোগ এখন ইতিহাসের বিষয় হয়ে গেছে। শল্য চিকিৎসার ক্ষেত্রেও এই একই অবস্থা। তবে পৃথিবীতে যদি এমন কোনো দিন আসে যখন আমাদের মতো ডাক্তারদের রোগী-পরিচর্যার কাজ থাকবে না তা'হলে আমাদের অখুশী হওয়ার কারণ ঘটবে না। তখন আমরা আরও ব্যাপকভাবে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার নিয়মগুলো কার্যকর করতে পারবো। আর আমাদের লক্ষ্য এটাই, মানুষ যাতে অসুখে না পড়ে তার জন্যেই চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।"

হাসপাতালে রোগীদের ঘর, ঔষধ-পথ্যের বিপুল আয়োজন, সংক্রামণ-নিরোধের ব্যবস্থা এবং শুশ্রূষাকারীণীদের সেবা-যত্ন সব ঘুরে ঘুরে দেখলাম। সব দেখেটেখে মনে হলো, এখানে ওষুধপত্র না থাকলেও রোগীরা পরিচর্যার গুণে এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশের প্রভাবে নিজের থেকেই সেরে উঠবে।

গ্রামের চিকিৎসা-কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আমরা অতিথিনিবাসের পথ ধরলাম। কমরেড ইসমাইল এবং প্রিয়ংবদা রাস্তাতেই আমাদের বিদায় জানিয়ে নিজেদের বাড়িতে ফিরে গেলো। আমি ও অধ্যাপক বিশ্বামিত্র অতিথিভবনে ফিরে এলাম। কমরেড দেব আমাকে ঘর অব্দি পৌঁছে দিয়ে তবেই বিদায় নিলো। আমি বিশ্বামিত্রকে বললাম, "এতক্ষণ যা দেখলাম, জানলাম, সেটা আমার মতো করে ডায়রীতে লিখে ফেলি এবার!"

বিশ্বামিত্র নিজের ঘরে চলে গেলো, আমি এখন একা। কলম নিয়ে লিখতে বসে প্রথমেই মনে হলো, যা' কিছু দেখেছি সে'সব পুরোপুরি লিখে ফেলা আমার পক্ষে সম্ভব নয় —অত সময়ও নেই এবং ক্ষমতাতেও কুলোবে না। বরং সংক্ষেপে

প্রধান প্রধান বিষয়গুলো লিখে ফেলতে পারি। আর একটা জিনিস ঠিক করলাম —প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা রাত্রিতে ঘুমনোর আগে লিখে ফেলব। তাতে যা' কিছু দেখব-শুনব তার সংক্ষিপ্তকরণের সময় কোনো বিশেষ উল্লেখযোগ্য জিনিস বাদ পড়বে না।

শিশুনিকেতন

পরের দিন সকাল সকাল উঠে তৈরী হয়ে নিলাম। আপেলগ্রামে আজ আমার দ্বিতীয় দিন। গতকালের মতো গদাইলস্করী চাল ছেড়ে, সকালের জলযোগ পর্ব শেষ করেই শিশুনিকেতনটি দেখতে রওনা হলাম এবং রোদের তেজ বেশী হবার আগেই পৌঁছে গেলাম।

বিরাট এলাকা নিয়ে এই শিশু-নিবাসটি গড়ে উঠেছে। তবে পাঁচিল দিয়ে বা বেড়া দিয়ে সমস্ত এলাকাটি ঘেরা নেই। কারণ আজকের সমাজে সে ধরনের মানুষ নেই যারা অরক্ষিত অঞ্চলে ঢুকে উৎপাত করবে অথবা বন্য জীবজন্তুও নেই যাদের আট্‌কাবার জন্যে কোনো ব্যবস্থার দরকার।

শিশুনিকেতনের এলাকায় এসে পৌঁছানোর পরই কমরেড ফতিমার সঙ্গে প্রথম দেখা হলো। ভদ্রমহিলা আমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। বয়স প্রায় আশী কিন্তু কর্মতৎপরতায় যুবকদেরও হার মানাতে পারেন। ২০ বছর হলো উনি বিধবা হয়েছেন। ওঁর স্বামী হৃষীকেশ দ্বিবেদী ছিলেন চিকিৎসক আর উনি ছিলেন বিশেষভাবে শিক্ষণপ্রাপ্ত নার্স। স্বামীর মৃত্যুর পর উনি এই শিশুনিকেতনে এসে যোগ দেন এবং শিশুদের ওপর অপরিসীম মমত্ব তাঁকে এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান পদে উন্নীত করেছে।

শিশুনিকেতন বাড়িটির দিকে আমরা এগোচ্ছিলাম। এখানে নানা রকমের ফুল ও ফলের গাছ, শিশুদের সঙ্গেই বাগানের পরিচর্যাও যে খুব ভালোভাবে হয় সেটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না। কিছুটা দূরে এক বিশাল বটবৃক্ষ। গ্রীষ্মকালে শিশুরা সেখানে খেলাধূলা করে। যদিও বেলা বেশ কিছুটা হয়েছে কিন্তু বাগানের ঘাসে রাতের শিশির এখনও সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়নি। তাই বাড়ির সংলগ্ন দালানেই বাচ্চারা তাদের সেবিকা মায়েদের সঙ্গে কলতান করছিল। এখানে যতগুলি শিশু রয়েছে তাদের প্রত্যেকেরই বয়স তিন বছরের কম কারণ তিন বছর বয়স পূর্ণ হলেই নার্সারী বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। একজন সেবিকা মা কয়েকটি শিশুকে বোঝাচ্ছিল—

—আজ একজন খুব বুড়ো মানুষ এখানে আসবেন।

একটি শিশু —উনি কি আমাদের বড়মা'র চেয়েও বয়সে বেশী ?

পরে জেনেছিলাম এখানে ফতিমাকে বাচ্চারা বড়মা বলে ডাকে। সেবিকা মা বাচ্চাটিকে বোঝাবার চেষ্টায় বলল,

—সোনামণি, তোমাদের বড়মা তখনও জন্মাননি যখন ওঁর বয়স তোমাদের বড়মার চেয়ে বেশী হয়ে গিয়েছিল।

অন্য একটি শিশু —তা'হলে একজনের নাম বলো, যার মতো বুড়ো।

—তা'হলে আর বলছি কি! সারা পৃথিবীতে ওঁর মতো বুড়ো মানুষ আর একজনও নেই।

আর একজন —আমরা আর সারা পৃথিবী দেখলাম কোথায় যে মানুষ কত বুড়ো হয় জানতে পারব!

—দেখবে সোনামণি, দেখবে। এখন তো সবে কথা বলতে শিখেছ, এর পর পড়াশুনা করবে, সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াবে।

আর একজন সেবিকা মা ওদের বললে —এখন বকবক না করে চুপ করে বসে অপেক্ষা করো। তারপর তোমাদের বুড়োদাদু এলে তোমরা যে যেটা পারো, গান গেয়ে বাজনা বাজিয়ে দাদুকে খুশী করে দিও।

আমরা এতক্ষণ ওদের কলতান শুনতে শুনতে গাছের আড়াল দেওয়া পথ ধরে দালানটির সামনে এসে পৌঁছালাম। সেবিকা মায়েরা হাত তুলে আমাদের অভিবাদন জানাল। ওদের দেখাদেখি অনেকগুলি বাচ্চা তাদের সেবিকা মায়েদের অনুকরণ করল।

একসঙ্গে এতগুলি প্রাণোচ্ছল শিশুদের মধ্যে পৌঁছে মনে হচ্ছিল একরাশ তাজা ফুলের মধ্যে এসেছি। প্রত্যেকের পরণে গোলাপী ফ্ল্যানেলের পোষাক। সবার পায়ে জুতো-মোজা। ভালো করে অনেকক্ষণ ধরে না দেখলে একজনের সঙ্গে অপরের পার্থক্য বোঝা শক্ত। আমরা বড়রা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছি আর ওদিকে শিশুভোলানাথের দল নিজেদের সব খেলনা বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বসে গেছে। যেন কোনো বড় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হবে, আর তারই যেন মহলা চলছে।

এখনও যে সব বাচ্চারা হাঁটতে চলতে শেখেনি তাদের দিকটিতে গেলাম। সব আলাদা আলাদা দোলনায় শোয়ানো —কেউ পাশে দাঁড়ানো মায়েদের আঙুল চুষছে, কেউ বা অস্ফুট ধ্বনি তুলে বড়দের ভাষা অনুকরণের চেষ্টা করছে, কেউ আবার হাসিমুখে তাদের নতুন সম্পত্তি সামনের দুটো দাঁত দেখাচ্ছে। সব কটি শিশুই স্বাস্থ্যবান —একটিও রুগ্ণ বা জড়বুদ্ধির নেই। একটি ছ'মাসের শিশুর

পাশে দাঁড়াতেই সে হাত তুলে আমার কোলে উঠতে চাইল। খুব সন্তর্পণে তাকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। কি আশ্চর্য, একজনকে কোলে নিয়েছি দেখে পাশাপাশি দোলনার কয়েকটি শিশু নানা ভঙ্গীতে তারাও এই বৃদ্ধের কোলে ওঠার দাবী জানাতে লাগল। দোলনায় শোওয়া বাচ্চাদের দেখে আমরা আবার আগের বড় দালানটিতে গিয়ে বসলাম। ওদের সকলের বড়মা কমরেড ফতিমা সকলকে সম্বোধন করে বললেন, "সবাই শোনো, তোমাদের, আমার, আমাদের সকলের দাদু আজ এখানে এসেছেন তোমাদের দেখতে। তোমরা কে কি পারো তা' ওঁকে দেখিয়ে দাও। আগে তোমাদের জানকী মা গান শোনাবেন তারপর জয়নাব মা বীণা বাজাবেন আর তারপর তোমরা। এখন কে কি গান শোনাবে সেটা আগে আমায় বলো।" বিজয় নামের একটি আড়াই বছরের ছেলে উঠে বলল, "বড়মা আমি গান শোনাব।" তার থেকেও ছোট মূর্তজাও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "বড়মা আমিও গান করব।" ফতিমা দু'জনকে কোলে টেনে নিয়ে বললেন, "ঠিক আছে, আগে তোমাদের মায়েদের গান হোক তারপর তোমাদের পালা।"

জানকী হাতে তানপুরার মতো একটা যন্ত্র নিয়ে পুরনো দিনের পল্লীগীতির মতো সুরে একটা গান শোনাল; তারপর জয়নাব। এ-বার দুই শিশু শিল্পীর পালা। কিন্তু একটা গণ্ডগোল বেধে গেলো —কে আগে গান গাইবে এই নিয়ে। বিজয় আগে বলেছে সুতরাং তার দাবী সে মূর্তজার আগে গান শোনাবে কিন্তু ক্ষুদে মূর্তজাও তার অধিকার ছাড়তে রাজী নয়। শেষ পর্যন্ত ওদের বিরোধ নিষ্পত্তি করতে বড়মা ফতিমাকেই আসতে হলো। ওদের ডাকতেই ওরা দু'জনে দৌড়ে গিয়ে ফতিমার কোলে বসল। ফতিমা বিজয়কে বললেন, "আচ্ছা বিজয়, সেদিন যখন তুমি আর শফি দু'জনে একসঙ্গে আমার কাছে ছিলে তখন আমি আপেল কেটে তোমাকে যখন দিতে গেলাম তুমি তখন নিতে চাইছিলে না কেন?"

বিজয় বোধহয় ফতিমার কণ্ঠস্বরে একটু কাঠিন্যের আভাস পেল। তাই ফতিমার গলা জড়িয়ে ধরে কিছুটা আব্দারের সুরে বলল, "বাঃ রে, আমি নেব না বলেছিলাম না-কি! বলেছিলাম তো আগে শফি নিক তারপর আমি নেব।"

ফতিমা জিজ্ঞাসা করলেন, "ঠিক আছে, কিন্তু কেন শফিকে আগে দিতে বলেছিলে —সেটা বলো।"

বিজয়, "তুমিই তো বলো —আগে ছোটদের দিয়ে তারপর বড়দের নিতে হয়। শফি ছোট আমি বড়। তা'হলে আমি আগে খাব কি করে! প্রহ্লাদ দাদা, ইব্রাহিম দাদা, জগদীশ দাদা যখন ইস্কুলে যায়নি তখন আমাকে বা শ্যামকে বাদ দিয়ে কখনও কিছু খেত?"

ফতিমা, "ঠিক বলেছ বাবা। এবার তা'হলে বলো মূর্তজা তোমার ছোটভাই না বড়ভাই ?"

বিজয়, "ছোটভাই।"

ফতিমা, "এবার তুমিই বলো কে আগে গান শোনাবে ?"

বিজয় বোধহয় নিজের ভুল বুঝতে পারল। একটু অপ্রস্তুত ভঙ্গীতে সে মূর্তজাকে বলল, "তুই আগে গান কর, আমি পরে গাইব।"

ইতিমধ্যে মূর্তজারও মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে গেছে। এখন সেও বায়না ধরে বসল —বিজয় দাদা আগে গাইবে, আমি 'তাপ্পরে'। আবার নতুন ফ্যাসাদ। শ্রীমতী ফতিমাকেই হাল ধরতে হলো। "শোনো মূর্তজা, বিজয় তোমার দাদা হয়। দাদা বলছে তোমাকে আগে গান করতে আর তুমি শুনছ না !"

ঝঞ্ঝাট মিটলো। মূর্তজা দৌড়ে প্রিয়ংবদার কাছে এসে তার খেলনা বীণাটি প্রিয়ংবদার হাতে দিয়ে বলল, "আম্মা এটার তারগুলো ঠিক করে দাও।"

প্রিয়ংবদা তারগুলো একটু এদিক-ওদিক করে মূর্তজার হাতে দিতেই সে বেশ ওস্তাদী কায়দায় সেটাকে নিয়ে টুং-টাং করে আওয়াজ তুলতে লাগল। তারপর তার নিজেরই কি যেন মনে হতে বলল, "আমি গান খুব ভালো গাইতে পারি না —শুধু বাজনা বাজাই ?"

আমি আর বিশ্বামিত্র দু'জনেই সমস্বরে তাকে সমর্থন জানিয়ে বললাম, "ঠিক আছে ভাই, তোমার বাজনাই আজ শুনি।"

কিছুক্ষণ টুং-টাং করার কৃতিত্বে মূর্তজা নিজেই খুব খুশী হয়ে উঠে পড়ে বেশ অভিভাবকসুলভ ভঙ্গীতে ঘোষণা.করে দিলো —এবার বিজয় দাদার গান হবে।

বিজয় এতক্ষণ বড়মা'র কোলে বসেছিল। সে এবার উঠে জয়নাবের কাছে গিয়ে বলল, "মা তুমি বাজাও আমি গান করি।" আসলে এটাই বিজয়ের সঙ্গীতচর্চার পদ্ধতি। সে জয়নাবের কোলে বসে গান গাইবে আর জয়নাব মা তার খেলার সেতারটি বাজাবে। সুতরাং এখনও তাই করতে হলো। বিজয় কিন্তু বেশ কয়েক কলি গান শিখেছে। শিশুকণ্ঠের সরল অথচ মধুর স্বরের গান শুনে আমরা সকলেই তারিফ করলাম। বিজয়ের পর আরও দু একজন তাদের সঙ্গীত-প্রতিভা প্রদর্শনের জন্যে উঠে এল। বলা বাহুল্য, কাউকেও নিরাশ করা হলো না।

এর পর অক্ষর চেনার খেলা। শুনলাম, এ ব্যাপারে মরিয়ম ও রুক্মিণী সকলের সেরা। প্রিয়ংবদা একটা বাক্স থেকে কাঠের তৈরী একটা অক্ষর মাটিতে রেখে দু'জনকেই একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, 'বলো, এটা কি ?' রুক্মিণী একটু তফাতে ছিল তাই ঠিকমতো বুঝে ওঠার আগেই মরিয়ম উত্তর দিয়ে দিলো —ক। প্রিয়ংবদা রুক্মিণীকে আদর করে বললেন, 'ঠিক আছে ; তুমিও বলতে পারবে।'

তারপর দু'জনকে এক সারিতে দাঁড় করিয়ে আর একটা অক্ষর মাটিতে রাখলেন। এবার দু'জনেই একসঙ্গে বলে উঠল —র। ওদের 'বড়মা' কমরেড ফতিমা দুটি বাচ্চাকে কোলে নিয়ে আদর করলেন। এবার নানা জীবজন্তু চেনার খেলা। কুকুর, বেড়াল, খরগোশ ইত্যাদির পুতুল সার দিয়ে রাখা হলো। 'বড়মা' এক একটি বাচ্চার নাম ধরে ডাকেন আর তাকে বলেন, আমাকে —বেড়ালটা এনে দাও —খরগোশটা এনে দাও। দেখলাম সবাই সঠিক জিনিসটিই এনে দিচ্ছে। অতঃপর বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে বাগানে আসা হলো। কে ক'টা ফুলের নাম, গাছের নাম শিখেছে তার পরীক্ষা চলল কিছুক্ষণ। বাগানে বড় বড় গাছের ডালে দোলনা টাঙানো, দোলনার মধ্যে বেশ মোটা গদী আঁটা। বাচ্চারা ইচ্ছে হলেই দোলনায় চড়ে —অবশ্য সেবিকা মায়েরা সঙ্গেই থাকে।

এমন সময় ন'টার ঘণ্টা পড়ল। আজকে সবুজ ঘাসের গালিচার ওপরেই খাবার বন্দোবস্ত হয়েছে। এই সময় বাইরে থেকে কয়েকজন মহিলাও এলেন। শুনলাম ওরা সবাই এখানকার বাচ্চাদের মা। তবে এখন মা বলতে শুধু গর্ভধারীণীরাই নয়, কারণ এই শিশুনিকেতনে যারা সর্বক্ষণ বাচ্চাদের পরিচর্যা করছে, শিশুমন যাতে বিকাশ লাভ করে তার জন্যে সব রকম বন্দোবস্ত করছে, তারা গর্ভধারীণী মায়েদের থেকে কোনো ব্যাপারেই তো কম নয়। এখানে শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের সব রকম সুব্যবস্থা থাকায় সব মায়েরা নিজেদের বাচ্চাদের এখানেই রেখে দেন। তবে এক বছরের কম বাচ্চারা সাধারণত রাত্রিতে মায়েদের কাছে চলে যায়। সদ্যোজাত শিশুর জননীরা কোনো প্রতিষ্ঠানে কর্মরতা থাকলে তাদের মাত্র দু'ঘণ্টা কাজ করতে হয়, অবশিষ্ট সময় শিশুদের সঙ্গে এখানেই কাটায়। বলতে গেলে এই শিশুনিকেতনটি গ্রামের সব মানুষের স্নেহ ভালোবাসায় এক অপরূপ মিলনক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অজস্র ফুলের গাছ —ফুল ফুটে আছে আর তার মধ্যে ফুলের চেয়েও সুন্দর এক দঙ্গল শিশুভোলানাথদের ক্রীড়াক্ষেত্র।

আজকের সমাজের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের জীবনকে সুখী ও আনন্দময় করে গড়ে তোলা এবং সেই লক্ষ্যপূরণের দিকে তারা অনেকটাই এগিয়ে গেছে। কিন্তু শিশুদের জন্যে আজকের সমাজ যা করেছে সেটা প্রাচীন যুগের সম্রাট-পুত্রদেরও ভাগ্যে জুটতো না।

এখানে বাচ্চাদের সারাদিনে প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ানো হয়। লক্ষ্য রাখা হয়, প্রত্যেকবার খাওয়ার পর কিছুটা সময় যেন তারা খেলাধূলা করে, যাতে খাদ্য সহজে হজম হয়। ক্ষুদে ক্ষুদে খেলুড়ের দল সবুজ ঘাসের ওপর বল নিয়ে নাচানাচি করে। দেখলাম, আমাদের পুরনো দিনের 'কানামাছি' খেলা কিম্বা হাডু-ডু খেলা একালেও উঠে যায়নি। একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, শিশুদের

খাওয়া-পরা, খেলাধূলা, গান-বাজনা সমস্ত কিছুর ওপর খুব সতর্ক মনোযোগ দেওয়া হয় যাতে তারা দেশের ভবিষ্যৎ সুনাগরিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

খাওয়ার ঘণ্টা পড়ার পর যে সব মায়েদের এখানে আসতে দেখলাম তারা কেউ কেউ নিজেদের বুকের দুধ খাওয়াবার জন্যে বাচ্চাদের অন্যত্র নিয়ে গেলো। একটু বড় বয়সের বাচ্চাদের মায়েরা নিজেদের সন্তানদের সঙ্গে আরও কয়েকটি বাচ্চাকে বসিয়ে একসঙ্গে খাইয়ে দিতে লাগল। এই সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষের মধ্যে সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী মুছে গেছে। তাই একটি শিশুর জননী আর পাঁচটি শিশুকে নিজের সন্তান থেকে স্বতন্ত্র মনে করে না। তিন বছর বয়স পার হলেই বাচ্চাদের এখান থেকে নার্সারী স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তখন শুধু জন্মদাত্রী মায়েরাই নয়, অনেক আদর-ভালোবাসায় যে সব সেবিকা মায়েরা তাদের বড় করে তোলে —সকলেই সমানভাবে কষ্ট অনুভব করে। কিন্তু দেশের জন্যে, ভবিষ্যতের জন্যে এবং শিশুদের মঙ্গলের জন্যে এ বিচ্ছেদের ব্যথা সকলেই শান্ত মনে স্বীকার করে নেয়।

খাওয়া-দাওয়ার পর্ব চুকলে আমরা এখানকার শিশুদের জন্যে বিশেষভাবে তৈরী সংগ্রহশালাটি দেখতে চললাম। কিছু কিছু বাচ্চা নিজেরাই হেঁটে আমাদের সঙ্গে চলল আর সবাই মায়েদের কোলে চড়ে। সমবেত শিশুদের মধ্যে বিজয় নামের একটি ছেলে সবচেয়ে হৃষ্টপুষ্ট এবং বুদ্ধিমান বলে মনে হচ্ছিল। সে জয়নাবের আঙুল ধরে গটগট করে হাঁটছিল।

সংগ্রহালয়টিতে অনেক ধরনের জীবজন্তুর মডেল রাখা আছে। প্রাচীন যুগের ব্যবহার্য অস্ত্রশস্ত্রও রয়েছে দেওয়ালে টাঙানো। আর একধারে বড় বড় মনীষীদের ছবি শোভা পাচ্ছিল। কোথাও সক্রেটিস হাসিমুখে হেমলক পান করছেন, কোথাও অমিতাভ বুদ্ধ দস্যু অঙ্গুরীমালের আঘাত সহ্য করেও অবিচলিতভাবে দাঁড়িয়ে আছেন, কোথাও গান্ধী মজুরের কাজ করছেন, কোথাও আব্রাহাম লিঙ্কন ক্রীতদাস ব্যবসায়ীদের হুমকির তোয়াক্কা না করে ক্রীতদাস প্রথা বিলোপ সাধনে তৎপর। আবার কোথাও জোয়ান অব আর্ক, কোথাও সম্রাট অশোকের ছবি। শুনলাম, এইসব ছবি দেখিয়ে যেমন বাচ্চাদের ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় তেমনি শিশুমনের উপযোগী চলচ্চিত্রের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাথমিক বিষয়গুলি শেখানো হয়। তবে সমস্ত ব্যাপারটাই এমনভাবে পরিকল্পিত যাতে ঐ সব শিক্ষণীয় বিষয় কোনো সময়েই ছোটদের অরুচিকর ঠেকে না বরং নিজেরাই আগ্রহী হয়ে ওঠে আরও বেশী কিছু জানার জন্যে। আর এটাও ঠিক কৌতূহলী শিশুমনে শিক্ষণীয় যে সব ব্যাপারের ছাপ একবার পড়ে তার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়।

আমি সংগ্রহশালাটি ঘুরে ঘুরে নানা দ্রষ্টব্য জিনিসগুলি দেখছিলাম এবং মাঝে মাঝে দু'একটি বাচ্চাকে ডেকে কোনো একটি দ্রষ্টব্য বিষয় সম্পর্কে তাদের কাছ থেকেই জানতে চাইছিলাম। আমাকে অবাক করে দিলো, প্রত্যেকেই সঠিক জিনিসটির নাম এবং বিষয় বেশ ভালোভাবেই বলতে পারল। কমরেড ফতিমা জানালেন, বাচ্চারা নিজেদের উৎসাহে তাদের মায়েদের এখানে টেনে আনে এবং এইসব দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি সম্পর্কে মায়েদের নানা রকম প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করে। মজার কথা হলো, অনেক সময় মায়েরা নিজেদের সন্তানদের কৌতূহল নিবৃত্তি করতে গিয়ে বেশ বিপাকে পড়ে যায়। যদিও তিন বছর বয়স পূর্ণ না হলে কাউকে বইপড়া বা লেখা শেখানো হয় না কিন্তু এইসব খেলাধূলা এবং সংগ্রহশালা থেকে তারা যে জ্ঞান অর্জন করে সেটা তাদের পরবর্তী শিক্ষাজীবনে অনেক কাজে লাগে।

আর একটা ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষ্য করলাম, এখানকার বাচ্চাদের ভাষাগত উচ্চারণে কোনো গ্রাম্যতা বা ঐ জাতীয় কোনো দোষ নেই। এর একমাত্র কারণ এখানকার সেবিকা মায়েরা যেমন সকলেই সুশিক্ষিত এবং মার্জিত ভাষায় কথা বলেন তেমনি বাড়িতেও বাচ্চারা বাবা মায়েদের কাছ থেকে শুদ্ধ এবং পরিষ্কার উচ্চারণ ছোটবেলা থেকেই শুনে থাকে।

সংগ্রহশালাটি দেখা শেষ করে বাচ্চাদের খাবার ঘর, রান্নাঘর, শোবার ঘর দেখতে গেলাম। যদিও অধিকাংশ শিশু রাতে নিজেদের বাবা মা'র কাছে চলে যায় তবু এমন কয়েকজনও আছে যারা এখানকার সেবিকা মায়েদের কাছেই রাতে থাকতে চায় সুতরাং তাদের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয়েছে। এদিকে ফতিমার ঘড়িতে দেখলাম এগারোটা বাজতে মিনিট পাঁচেক বাকী —আর দেরী করা যায় না। শিশুনিকেতনের আরও কিছু জানবার, দেখবার ইচ্ছে জলাঞ্জলি দিয়ে সবাইকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে অতিথিভবনের দিকে ফিরে চললাম। একটা দিনে এতটা অভিজ্ঞতা আমার পক্ষে যথেষ্ট। আগামীকাল নালন্দায় রওনা হব তার আগে একটু বেশী সময় বিশ্রাম নিয়ে রাখি।

অতিথিভবনে পৌঁছে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে আগামীকালের ভ্রমণসূচী নিয়ে আলোচনা শুরু করলাম। বিশ্বামিত্র জিজ্ঞেস করল, "এখান থেকে সোজা নালন্দায় যাবেন তো?"

"সোজা মানে? —এখান থেকে ট্রেনে উঠব আর মাঝপথে কোনো গাড়ী বদল না করে নালন্দায় গিয়ে নেমে পড়ব!"

বিশ্বামিত্র, "ট্রেনে গেলে একটু সময় বেশী লাগবে কিন্তু প্লেনে গেলে মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যেই নালন্দা পৌঁছে যাবেন।"

"না, না, অত তাড়াহুড়ো আমার পোষাবে না। ট্রেনেই চলো এবং প্যাসেঞ্জার ট্রেন হলে আরও ভালো হয়। আমার ইচ্ছেটা তোমায় বলি ; দু'শ বছর আগে নালন্দা থেকে যে পথ ধরে আমি এখানে এসে পৌঁছেছিলাম সেই রক্সৌল, সগৌলী, মোতিহারী, মজফ্‌ফরপুর, পাটনা, বক্তিয়ারপুর হয়ে নালন্দায় ফিরি। তাতে তোমাদের নতুন সমাজ-ব্যবস্থায় আমার অনেক কাল আগে দেখা জায়গাগুলোর কতটা পরিবর্তন হয়েছে সেটা দেখতে দেখতে যাব তবে গাড়ী বদল করে অন্য গাড়ীতে উঠতে যেটুকু বাড়তি সময় ব্যয় হবে তার বেশী সময় রাস্তায় বিশ্রাম আমার দরকার হবে না।"

"গাড়ী একবার পাটনাতেই বদল করতে হবে —বক্তিয়ারপুর যাবার কোনো দরকারই হবে না কারণ পাটনা থেকে নালন্দা পর্যন্ত সোজা রেলপথ চালু হয়ে গেছে। তা'ছাড়া এখন রেল গাড়ীরও অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। আপনাদের সময়ের মতো ব্রড গেজ, মিটার গেজ, মার্টিনের বাচ্চা রেলগাড়ী —এ সব কিছুই পাবেন না। সারা দুনিয়াতে এখন সর্বত্র একই গেজের রেলপথ।"

"বিশ্বামিত্র, তুমি মার্টিন কোম্পানীর বাচ্চা রেলগাড়ীর কথা কি করে জানলে ?"

"কেন, বইতে পড়েছি।"

"কথাটা যখন উঠল তখন ঐ বাচ্চা রেলগাড়ীর একটা গল্প তোমাকে শোনাই। তখনকার দিনে গ্রামে অক্ষর-পরিচয় সম্পন্ন মানুষ ছিল না বললেই হয়। এমনও অনেক গ্রাম ছিল যেখানে একটা চিঠি এলে ভিন্‌গ্রামে সেটা পড়াতে নিয়ে যেতে হতো। তা' সে যাইহোক, একজন গ্রামের মানুষ বক্তিয়ারপুর ব্রডগেজ লাইনের গাড়ীতে উঠেছে —কোথায় যেন যাবে। এমন সময় স্টেশনের আরেক দিকে ছোট ছোট রেলের কামরা চোখে পড়ল। বেচারী ন্যারো গেজের রেল লাইন এবং তার গাড়ী জীবনে কখনও দেখেনি। অবাক হয়ে সে পাশে-বসা লোকটির কাছে ব্যাপারটা জানতে চাইল। পাশের লোকটিও নিরক্ষর এবং সেও তফাৎটা জানে না, কিন্তু তার মধ্যে একটা সবজান্তা ভাব ছিল। সে বলল —আরে ওগুলো এই বড় রেলের বাচ্চা। প্রথম জন আরো অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল —রেলগাড়ীরও তা'হলে বাচ্চা হয় ? সবজান্তা সেই যাত্রী বিজ্ঞজনোচিত ভঙ্গীতে বলল —হবে না কেন, ঘোড়া, হাতি, মোষ যারাই চলে ফিরে বেড়ায় তাদের যখন বাচ্চা হয় তখন এত জোরে ছুটোছুটি করে যে রেলগাড়ী তার বাচ্চা হবে না ! তবে হ্যাঁ, হাতীর বাচ্চা যেমন হাতীই হয় ঘোড়া হয় না কিন্তু আকারে আসল হাতীর থেকে ছোট ; সেই রকমই এই বড় রেলগাড়ীর বাচ্চা ঐ ছোট রেলগাড়ীটা। দ্যাখ, ঠিক একই রকম দেখতে শুধু মাপে ছোটবড় এই যা ! সে যা হোক হলো, কিন্তু এখান

থেকে গাড়ী বদল না করে পাটনা পর্যন্ত যাব কি করে? —গঙ্গার ওপর কি সেতু তৈরী হয়েছে?"

"হ্যাঁ। ঐ সেতুর বয়স প্রায় দেড়শ' বছর পার হয়ে গেছে।"

"বেশ, বেশ। আচ্ছা কাল সকালে আমরা এখান থেকে কখন রওনা হচ্ছি?"

"কমরেড ইসমাইলের সঙ্গে এ ব্যাপারে আমার কথা হয়ে আছে। কাল সকালে উঠে জলযোগ সেরে নিয়ে আমরা মোটরে মোহনপুর রওনা হয়ে যাব। তারপর ওখানেই দুপুরের খাওয়া সেরে বেলা ১২টায় পাটনাগামী ট্রেনে উঠব। হ্যাঁ, আর একটা কথা, মোহনপুরের জনগণ আপনাকে দেখতে খুব উৎসুক। তারা চেয়েছিল, আপনি এক রাত্রির জন্যে ওদের গ্রামের আতিথ্য গ্রহণ করুন। কিন্তু আপনার ইচ্ছে, আর দেরী না করে সোজা নালন্দা রওনা হবার —আর সেটাই আমরা জানিয়ে দিয়েছি।"

"ঠিক আছে। ঐ কথাই পাকা হয়ে রইল।"

আমার সঙ্গে কথা শেষ করে বিশ্বামিত্র ইসমাইলকে, মোহনপুর এবং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে আমার ভ্রমণসূচী জানিয়ে দিলো।

রেলপথে

পরদিন সকালে উঠে জলযোগের জন্য বার হবার আগেই, প্রিয়ংবদা, ইসমাইল, দেবমিত্র এবং আরও অনেকে অতিথিভবনে এসে গেলেন। একসঙ্গে জলযোগ পর্ব শেষ করে গ্রামের সংস্থাগারে আমায় বিদায় সম্বর্ধনা জানানোর জন্যে নিয়ে যাওয়া হলো। সোনার পাতে খোদাই করা মানপত্র আমাকে উপহার দিলো। বিনিময়ে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানানো ছাড়া তাদের দেবার মতো আর কোনো পার্থিব সম্পদ আমার তো নেই!

এরপর আমি, বিশ্বামিত্র, প্রিয়ংবদা, ইসমাইল এবং দেবমিত্র একটি মোটরে করে মোহনপুরের দিকে রওনা হলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই মোহনপুর গ্রামের এলাকার মধ্যে এসে পড়লাম। আমাদের স্বাগত জানাবার জন্যে গ্রাম-প্রধান এবং আরো অনেকেই অপেক্ষা করছিল। ঠিক হলো, পাটনার ট্রেন ছাড়তে যখন বেশ কিছুটা দেরী আছে তখন গ্রামের সংস্থাগারে নিয়ে গিয়ে মোহনপুরবাসীরা আমায় সম্বর্ধনা জানাবে। মোটর থেকে আর নামা হলো না—সোজা মোহনপুর গ্রামের সংস্থাগারে পৌঁছে গেলাম। চোখ বেঁধে এবং আমায় না জানিয়ে যদি এখানে নিয়ে আসা হতো তা'হলে এটি মোহনপুর গ্রামের সংস্থাগার, না ফেলে

আসা আপেলগ্রামের সংস্থাগার সেটা আমার পক্ষে কোনোভাবেই বুঝে ওঠা সম্ভব হতো না। বিশ্বামিত্রের কাছ থেকে জানলাম, লোকসংখ্যার অনুপাতে গ্রামের আয়তন ছোট-বড় হতে পারে কিন্তু বাড়ি-ঘর, অতিথিনিবাস, ভোজনশালা, শিশু-নিকেতন, হাসপাতাল দেশের সর্বত্র একই প্যাটার্নে তৈরী। তবে স্থানীয় জলবায়ু বা প্রাকৃতিক সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী ঘর-বাড়ির নকসার পরিবর্তন হয়। মোহনপুর সম্বন্ধে জানলাম, এখানে একটি বরফ তৈরীর কারখানা আছে। আশ-পাশে যত ফলের বাগান আছে সেখানকার উদ্বৃত্ত ফল এখানে চলে আসে তারপর সেগুলো এখান থেকে সারা দেশে এমন কি বার্মা, শ্রীলঙ্কায় চালান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এখানকার লোকদের কাজ হচ্ছে, সমস্ত ফল এমনভাবে প্যাকিং করে, প্রয়োজন মতো বরফের বাক্সের মধ্যে পুরে দেশের বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো যাতে নির্দিষ্ট জায়গায় ফলগুলো পৌছানোর পরও তাজা ও সুস্বাদু থাকে। তা'ছাড়া যে সব গাড়ীতে ফল চালান যায় সেখানে যেমন তাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকে তেমনি লক্ষ্য রাখা হয় ওপরের দিকের ফলের চাপে নীচে-রাখা ফলগুলি যেন কোনোভাবে নষ্ট না হয়। ভেবেছিলাম এ গ্রামে যখন কারখানা আছে তখন চিমনি-ধোঁয়া এ সব কিছু চোখে পড়বে। হা-হতোহস্মি, মনেই ছিল না এখন বিদ্যুতের যুগে কার-খানায় চিমনি-ধোঁয়ার পাট উঠে গেছে। আর যদি কিছু থেকেও থাকে তা'হলে এরা আবহাওয়া-দূষণ ব্যাপারে এত সতর্ক যে, সব চোখে পড়বার কথা নয়।

মোটর থেকে নেমে সংস্থাগারের মঞ্চে এসে পৌছালাম। সমবেত মোহনপুর-বাসীরা হর্ষধ্বনি করে আমায় অভিনন্দন জানালেন। এরপর গ্রামসভার সভাপতি আমাকে গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে অভিবাদন জানালেন এবং রীতি-মাফিক আমাকেও দু'চার কথা বলতে হলো। মোহনপুরবাসীদের ভোজনশালায় দ্বিপ্রহরের খাওয়াটা শেষ করলাম। হাতে আর বিশেষ সময় নেই সুতরাং আর কারো সঙ্গে বিশেষভাবে আলাপ-পরিচয় করার সুযোগ হলো না। রেল স্টেশনের পথে সকলে রওনা হলাম।

ট্রেন আসতে এখনও কয়েক মিনিট বাকী। বিশ্বামিত্র বলল, "এখনকার রেল স্টেশনে আপনাদের যুগের মতো, ফিরিওয়ালা, ভিখারী, ভবঘুরে, কুলি —এ সবের ভীড় নেই আবার স্টেশন-সংলগ্ন সরাইখানা, ভুজিওয়ালাদের দোকান কোথাও দেখতে পাবেন না।"

আমি বললাম, "আর সব নেই তাতে ভালোই হয়েছে, কিন্তু স্টেশন-সংলগ্ন দু'একটা হোটেল থাকলে যাত্রীদের সুবিধা হতো।"

"কোনো অসুবিধে হবার কথা নয়, প্রায় প্রত্যেক স্টেশনের খুব কাছেই একটি করে অতিথিনিবাস —হাঁটা পথে বড় জোর দু'মিনিটের রাস্তা। আর

অতিথিনিবাসটি যদি কোথাও দূরে হয়, স্টেশন থেকে একবার টেলিফোন করে দিলেই হলো —কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাড়ী এসে যাবে।”

ট্রেন এলো। পুরো দু'শতাব্দী বাদে রেলগাড়ী দেখলাম। সেকালের মতো কালি-ঝুলি মাখা বিপুল গর্জনকারী ইঞ্জিন সহ রেলগাড়ী নেই। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সুন্দরভাবে রঙ করা যেন এক সার ডাক-বাংলো। এখন সব রেলগাড়ী বিদ্যুতেই চলে তাও বাইরের থেকে বিদ্যুতের জোগান দিতে হয় না। গাড়ী চালু করার সময় শক্তিশালী ব্যাটারী থেকে বিদ্যুৎ নিয়ে গাড়ী চলতে শুরু করে তারপর চলন্ত গাড়ীর ঘূর্ণায়মান চাকা ও রেল লাইনের সংঘর্ষে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তাকে বিদ্যুতে রূপান্তরিত করে গাড়ী তার প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সৃষ্টি করে নেয়। এখন রেল স্টেশনে আগের দিনের মতো টিকিটবাবু, চেকারবাবু এ সব কর্মীর দরকার হয় না। কারণ রেলে কাউকেই ভাড়া দিতে হয় না —যা' কিছু খরচ সবই রাষ্ট্রের। তবে স্টেশন মাষ্টার, এবং রেলপথ সুরক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত রাখার জন্যে কিছু কর্মী আছে। কিন্তু কর্মীদের কাজও কায়িক শ্রমের নয়, শুধু যে সব যন্ত্রের সাহায্যে রেলপথকে বাধামুক্ত, দুর্ঘটনামুক্ত রাখা হয় সেগুলির তত্ত্বাবধান করা। আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম, ট্রেনের কোনো যাত্রীর কাছে কোনো মালপত্র নেই। দরকারই বা কি ? ট্রেনের মধ্যে যার যা' দরকার সবই তো আছে, আবার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে অতিথিভবনে নিজের বাড়ির সব সুযোগ-সুবিধে তো রয়েছেই। একগাদা পোটলা-পুঁটলি ঘাড়ে করে ট্রেনে চড়ার মতো আহাম্মকি কাণ্ড কে আর সাধ করে করবে !

আমি আর বিশ্বামিত্র গাড়ীর সামনের দিকের একটা কামরায় উঠলাম। স্টেশন চত্বরে কোনো পুলিস বা ঐ জাতীয় কাউকে না দেখে বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞেস করলাম, “পুলিস বা কোনো ধরনের শান্তিরক্ষকের এখন তোমাদের দরকার লাগে না ?”

উত্তরে বিশ্বামিত্র যা' বললে তার থেকে বুঝলাম, সমাজের সর্বস্তরে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা এবং সমাজ-সচেতন শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ফলে মানুষের মধ্যে থেকে অপরাধ-প্রবণতা লুপ্ত হয়ে গেছে। তবু অবাঞ্ছিত কোনো ঘটনা যদি কখনও ঘটে যায় তার জন্যে প্রত্যেক গ্রাম থেকে কয়েকজন কর্মীকে নিয়োগ করা হয়, যাদের পুলিস না বলে স্বেচ্ছাসেবক বলাই উচিত।

গাড়ী ছাড়ার সঙ্কেত বেজে উঠল। প্রিয়ংবদা, ইসমাইল এবং অন্যান্য যারা আমার সঙ্গে আপেলগ্রাম থেকে এসেছিল আমাকে উষ্ণ আত্মীয়তার স্পর্শে বিদায় জানাল। আমার এখন এই রেলগাড়ী নিয়ে কৌতূহলের অবধি নেই। বিশ্বামিত্রকে বললাম, “আগে তোমাদের এই নতুন গাড়ীটা আমায় ভালো করে দেখে নিতে

দাও, তারপর বিশ্রাম করব।" একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি, এখনকার ট্রেনে ফার্স্ট ক্লাস, সেকেণ্ড ক্লাস বা ঐ ধরনের কোনো শ্রেণী বিভাগ নেই এবং সামনের কামরা থেকে শেষ কামরা পর্যন্ত যাতায়াতের বন্দোবস্ত আছে।

আমি 'করিডর' দিয়ে পেছনের বগিগুলির দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। প্রত্যেক কামরাতেই স্ত্রী-পুরুষ যাত্রীরা রয়েছে —আলাদা কোনো জানানা কামরা নেই। অধিকাংশই নিজেদের আসনে বসে খবরের কাগজ পড়ছে। যাক্ এতক্ষণ পরে আমাদের সময়ের মানুষদের অভ্যাস খবরের কাগজ পড়ার নেশাটা এদের মধ্যেও রয়ে গেছে দেখলাম। তবে এখনকার সংবাদপত্রের চরিত্রগত যে পরিবর্তন হয়েছে সেটা লক্ষ্য না করে পারলাম না। আজকাল কোনো পত্রিকায় নিলাম, টেণ্ডার নোটিশ, স্টক এক্সচেঞ্জের খবর থাকে না ; লোক-ঠকানো 'ত্রিকালদর্শীর মাদুলি', 'দৈব এবং অব্যর্থ ফলপ্রদ কঠিন ব্যারামের ওষুধ', 'ঘরে বসে হাজার হাজার টাকা আয়' —এই ধরনের কোনো বিজ্ঞাপন নেই ; নেই অর্ধসত্য অথবা সম্পূর্ণ কল্পনা-প্রসূত নিজস্ব সংবাদদাতা বা রয়টারের জনমনকে বিপথগামী করার কোনো সংবাদ। কিন্তু সমস্ত খবরই প্রকাশিত হয় গুরুত্ব অনুসারে আগুপেছু করে —যা পড়ে পাঠক চলমান দুনিয়ার তাবৎ সংবাদই সঠিকভাবে পেয়ে যান। আগে চমকপ্রদ খবর তৈরী করে এবং তাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে ছাপানো হতো কাগজের বিক্রী বাড়াবার জন্যে। এখন সেই মানসিকতা থেকে সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় না। শুনলাম, দৈনিক সংবাদপত্র পড়া শেষ হলেই পুরনো কাগজের গাদায় জমা হয় না। এক বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে ছাপা অংশটুকু মুছে ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে ঐ কাগজেই ছাপা চলে।

মাসিক-পাক্ষিক-সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি খুব সুন্দর কাগজে সচিত্র অবস্থায় ছাপা। এখন যে সব জিনিসের ফটো ছাপা হয় তার হুবহু রঙ এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলি ছাপা ছবিতে অনুপস্থিত থাকে না। শুধু তাই নয়, বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে পৃথিবীর কোনো একটি জায়গায় তোলা ফটো কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে দুনিয়ার সর্বত্র পৌঁছে যায়। আমার নিজের ব্যাপারেই এই কাণ্ডটা ঘটে গেছে। যেদিন আমি আপেলগ্রামে গিয়ে পৌঁছাই সে-দিনই সর্বত্র দূর-চিত্রপ্রেরণের সাহায্যে আমার ছবি ও বিবরণ সব জায়গাতেই ছাপা হয়ে গেছে। তাই 'করিডর' দিয়ে যখন যাচ্ছি তখন প্রায় প্রত্যেকেই আমায় স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছিল এবং তাদের কাছে কিছুটা সময় বসবারও সনির্বন্ধ অনুরোধ পাচ্ছিলাম। সবাইকেই এক কথা বলে কাটালাম —আগে ভাই তোমাদের এইসব নতুন জিনিস দেখে নিই, তারপর তো সময় আছেই তোমাদের সঙ্গে কথা বলার।

আমি হাঁটতে হাঁটতে রেলগাড়ীর লাইব্রেরী কামরায় এসে পৌঁছালাম। রেল

গাড়ীতেও লাইব্রেরী! দু-তিন আলমারি বই —সেইসঙ্গে অসংখ্য পত্র পত্রিকা। জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, ইতিহাস, ভাষা-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান দর্শন, সাহিত্য, প্রযুক্তিবিজ্ঞান, কৃষি, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা —মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন কোনো শাখা নেই যার ওপর প্রকাশিত পত্রিকা এই রেলগাড়ীর লাইব্রেরীতে রাখা হয়নি। দু' একটা নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখলাম —এই বিপুলসংখ্যক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে সারা পৃথিবী থেকেই অথচ ভারতের সীমান্ত অঞ্চলের একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেনে যাত্রীদের জন্যে সবগুলিই সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে! পড়বার আসনে বসে কেউ অন্যের সঙ্গে গভীর দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনায় ব্যস্ত। কোথাও আজকের সংবাদে প্রকাশিত কোনো আনন্দ বা শোক সংবাদ নিয়ে মত বিনিময় করছে। কেউবা কোনো রম্য সাহিত্যে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত করে ডুব দিয়ে আছে। কোথাও সঙ্গীত-চর্চার আসর বেশ জমজমাট।

লাইব্রেরী কামরার পরের বগিটিই হলো এই ট্রেনের রসুইখানা। যেমন গ্রামের ভোজনাগারে টাট্‌কা জিনিসপত্র রান্না করা হয় এখানেও ঠিক সেই রকম ব্যবস্থা। আবার খাদ্য পরিবেষণ করা হয় একদম সময় ধরে। নির্দিষ্ট সময়ে কন্‌ভেয়ার বেল্ট বাহিত হয়ে গরম গরম আহার্যবস্তু যাত্রীদের বসবার জায়গায় চলে আসে, খাওয়া শেষ হলে শূন্য থালা-বাটি যথাস্থানে ফিরে যায়। ট্রেনের শেষ বগিটি শৌচাগার; তবে আগের দিনের মতো সমস্ত ট্রেন লাইনে ময়লা ছড়াতে ছড়াতে যায় না —একপাশে জমা থাকে। তারপর কয়েকটি নির্দিষ্ট স্টেশনে যন্ত্রের সাহায্যে জমা ময়লা একসঙ্গে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়।

রসুইখানার পরে একটি বগি অসুস্থ যাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত। কয়েকজন অসুস্থ যাত্রী বেশ আরামপ্রদভাবে শুয়ে আছে। কয়েকজন নার্স রয়েছে রোগীদের ঠিকমতো পরিচর্যা করার জন্যে। ঔষধ-পথ্য, রোগীদের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা— কোনো দিকেই ত্রুটি নেই। থার্মোফ্লাস্ক জাতীয় পাত্রে দুধ, পুষ্টিকর ফল আরও কত কিছু। রোগীদের মধ্যে দু'জন তিব্বতী রয়েছে —ওদের তক্ষশিলায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কারণ যে ধরনের অসুখে দীর্ঘকাল ওরা অসুস্থ তার সর্বাধুনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা একমাত্র তক্ষশিলাতেই হতে পারে। রেলগাড়ীর এই হাসপাতালের যে জিনিসটি আমায় সবচেয়ে বেশী অভিভূত করল সেটা হলো রোগীদের সঙ্গে শুশ্রূষাকারীণীদের আচরণ। এমন মমত্বপূর্ণ ব্যবহার যে-সব রোগীর ভাগ্যে জোটে তাদের আলাদাভাবে ওষুধ-পত্রের দরকার কি!

সব ক'টা বগি দেখে আমার নির্দিষ্ট জায়গায় এসে বসলাম। ভাবছিলাম, বিশ শতকের কথা। শিশু বৃদ্ধ রোগী, পোঁটলা-পুটলি নিয়ে জরুরী দরকারে গাঁটের কড়ি খরচ করে ট্রেনে চাপত এবং কি অবর্ণনীয় কষ্টে বাদুড়-ঝোলা হয়ে তাদের

যেতে হতো। কত লোক নির্দিষ্ট ট্রেনে উঠতে না পেরে কতভাবে যে হয়রানি সহ্য করত! আর যারা পয়সাওয়ালা তারাও প্রথম শ্রেণীর যাত্রী হিসেবে যেটুকু আরাম আয়েস উপভোগ করত আজকের রেলগাড়ীর সর্বজনীন সুযোগ-সুবিধার তুলনায় তা' কত নগণ্য!

আমার কাছেই এক মধ্যবয়স্কা মহিলা বসেছিলেন। জিজ্ঞেস করে জানলাম উনি অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য। ভদ্রমহিলা প্রায় ছ'মাস পৃথিবীর নানা অঞ্চল পরিভ্রমণ করে দেশে ফিরছেন। প্রথমে, অন্ধ্র থেকে শ্রীলঙ্কা, সেখান থেকে ইন্দোনেশিয়া-জাভা-কম্বোজ হয়ে অস্ট্রেলিয়া তারপর জাপান এবং সেখান থেকে ফেরার পথে তিব্বত নেপাল হয়ে এখন নিজের কর্মস্থলে ফিরে যাচ্ছেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এখনও কি অস্ট্রেলিয়াতে আমাদের সময়ের মতো শুধু শ্বেতকায়দেরই রাজত্ব?"

উত্তর পেলাম, "শুধু অস্ট্রেলিয়ার কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন, এখন পৃথিবীর কোথাও বর্ণভেদ, শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ, এক সম্প্রদায় কর্তৃক অন্য সম্প্রদায়কে নিপীড়ন —এ সবের কোনো চিহ্ন খুঁজে পাবেন না। আমি আপনাকে চিনি, আপনি তো বিংশ শতাব্দীর মানুষ। মনে করে দেখুন, আপনাদের সময়ে দক্ষিণ ভারতে জাত-পাত, ছোঁয়াছুঁয়ি নিয়ে কত কাণ্ডই না ঘটত!"

আমি একটু অবাক হয়েই বললাম, "তা'হলে কি সারা পৃথিবী থেকে সব রকমেরই বৈষম্য দূর হয়ে গেছে?"

"শুধু দূর হয়ে গেছে বললে ঠিক বলা হয় না। ঐ সব বৈষম্যমূলক মনোবৃত্তির কোনো অবশেষ আজ পৃথিবীর মানুষের মধ্যে কোথাও খুঁজে পাবেন না। হ্যাঁ, একদিন মানবসমাজে ঐ ধরনের ব্যাধি ব্যাপক আকারে ছিল এবং ইতিহাস-চর্চা যাঁরা করেন তাঁরাই ঐ ব্যাপারগুলো জানেন।"

"আপনি তো বেশ চমৎকার এ দিককার লোকদের ভাষা 'ভারতী'তে কথা বলছেন কিন্তু আমাদের সময়ে দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীরা এ দিকের ভাষা বুঝতেন না, আমরাও দক্ষিণ ভারতের আঞ্চলিক ভাষাগুলি কিছুই বুঝতে পারতাম না। তা' এমনটা হলো কি করে?"

"এখন সর্বভারতীয় যোগাযোগ রক্ষাকারী একটি মাত্র ভাষা এবং তা' হলো 'ভারতী'। তাই 'ভারতী'তে আমার কথাবার্তা বলতে বা বুঝতে অসুবিধে হবে কেন?"

"তবে কি অন্ধ্রে তেলেগু ভাষা অবলুপ্ত হয়ে গেছে?"

ভদ্রমহিলা জবাবে বললেন, "আপনি যেভাবে এই ভাষাগত বিষয়টা বুঝতে চাইছেন আসল ব্যাপারটা কিন্তু অন্য রকম। অন্ধ্রের লোক তেলেগু জানে এবং

বোঝে তবে এই ভাষার ব্যাপারটা ঠিকমতো বোঝাতে গেলে আমাদের একটু পুরনো ইতিহাসের দিকে ফিরে যেতে হবে। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও ভারতের সবগুলি ভাষাই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখে আসছিল। কিন্তু প্রধানত উত্তর ভারতের এবং কিছুটা দক্ষিণ ভারতীয় ভাষার সমাহারে ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতরা সমগ্র দেশের যোগাযোগ রক্ষাকারী ভাষা হিসাবে যে 'ভারতী' ভাষার প্রচলন আগেই শুরু করে দেন তার প্রচলন খুবই দ্রুতগতিতে বেড়ে চলে। তবে রাষ্ট্রীয় আইন করে 'ভারতী' ভাষাকে সমগ্র জনগণের ওপর চাপানো হয়নি। এর পর দ্বাবিংশ শতাব্দীতে যখন সমগ্র পৃথিবী একটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হলো তখন আপনাদের সময়ে যে নতুন কৃত্রিম ভাষা এস্পেরান্ত গঠিত হচ্ছিল তারই একটি সংস্কৃত ও সরলীকৃত রূপকে সার্বভৌমী রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। আবার অনেক বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে একটি সাধারণ বর্ণমালা 'ভারতী' ভাষার জন্যে গৃহীত হয়। একদিকে সার্বভৌমী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা এস্পেরান্ত অন্যদিকে ভারতবর্ষের প্রাচীন ভাষাগুলির সমবায়ে গঠিত 'ভারতী' এই দুইটি ভাষার পাশাপাশি আঞ্চলিক ভাষাগুলি ক্রমশই ব্যবহারিক জীবনে উপযোগিতা হারিয়ে ফেলতে থাকে। আজকের নব-জাতক কোনো গ্রাম বা অঞ্চলের মানুষ নয়, সে বিশ্বনাগরিক। 'ভারতী' সে শেখে ভারতবর্ষের নাগরিক হিসাবে এবং এস্পেরান্ত তাকে জানতে হয় বিশ্বমানুষের সান্নিধ্যে আসার জন্যে। এইসঙ্গে আরও একটি ভাষা শিক্ষা অহেতুক সময় ও শ্রমের অপব্যয় নয় কি ?"

"আপনারা তা'হলে আমাদের সময়ের ভারতীয় ভাষাসমূহের সমাধির ওপর এই নতুন 'ভারতী' ভাষার ইমারৎ গড়েছেন।"

"আমি অত্যন্ত বিনীতভাবে আপনার এই ধারণার প্রতিবাদ করতে বাধ্য হচ্ছি। কারণ এটা তো আপনি জানেন, জোর করে কোনো ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। আপনাদের সময়ে যে তামিল ভাষা প্রচলিত ছিল সেই ভাষা কি তামিল ভাষার হাজার বছর আগে রূপটির সঙ্গে অভিন্ন ? মানুষের প্রয়োজনেই ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ। আবার একদল স্বার্থান্বেষী মানুষ ভাষাগত সামান্য ব্যবধানকে উপলক্ষ্য করে এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর বিরোধ পাকিয়ে রাখত। শুধু ভাষা কেন, শোষণভিত্তিক সমাজে যে-কোনো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগাত পরস্পরের বিরুদ্ধে। এখন সমাজ-ব্যবস্থা বদলে গেছে, এখন সুযোগ, সুবিধা, নিরাপত্তা সকলের জন্যই সুরক্ষিত। তাই ভাষাগত বিরোধ যেমন নেই তেমনি আবার যাঁরা আমাদের পূর্বপুরুষদের ভাষা-সাহিত্য চর্চা করতে চান তাঁরা স্বাধীন-ভাবে এবং সব রকম রাষ্ট্রীয় সহায়তায় সে কাজ করে চলেছেন। এই আমার ব্যাপারটাই দেখুন না, সার্বভৌমী রাষ্ট্রভাষা এস্পেরান্ত শিখেছিলাম বলেই তো

সারা দুনিয়া ঘুরে এলাম, কোথাও ভাষাগত কারণে কোনো অসুবিধার সৃষ্টি হয়নি।"

ভদ্রমহিলার নাম গার্গী। এ বার ওর ভ্রমণ বৃত্তান্ত জানতে চাইলাম। জিজ্ঞেস করলাম, "এখন অস্ট্রেলিয়ার লোকসংখ্যা কত?"

"প্রায় ষোল কোটি। তবে এখন ওখানকার বেশীর ভাগ মানুষই ভারত, চীন—এইসব জনবহুল দেশ থেকে গিয়ে বসবাস করছে। আগে যেমন ওটা ছিল ইংলণ্ডের লোকদের কলোনী এখন কিন্তু আর তা' নেই। তবে এটাও বলে রাখি, কে চীনের লোক, কে ইউরোপের লোক এ রকম কোনো বাচ-বিচার পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে গেছে। এ ব্যাপারটা শুধু নৃতাত্ত্বিকদের আলোচনার জন্যেই টিঁকে আছে।"

গার্গী আরও দু'জন সহযাত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো। একজন বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রী হক, অন্যজন আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রী বিশ্বনাথ। দু'জনেই ভারতের বাইরে গিয়েছিলেন; এখন নিজের নিজের কর্মস্থলে ফিরে যাচ্ছেন।

বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় অপরাধ-প্রবণতা এবং অপরাধের বিচার-শাস্তি কিভাবে হয় সে সম্পর্কে জানতে চাইলাম। শুনলাম সমস্ত বিহার প্রদেশের জন্যে একটি মাত্র জেলখানা আছে এবং গত কয়েক বছরের মধ্যে সেখানে কয়েদীর সর্বোচ্চ সংখ্যা হচ্ছে ১০০। আসলে বিংশ শতাব্দীতে যে সব কারণে নানা ধরনের অপরাধ সংঘটিত হতো বর্তমান পৃথিবীতে সেইসব কারণগুলির মূলোচ্ছেদ হয়ে গেছে। অর্থাৎ অভাব দারিদ্র্য মানুষকে যে অপরাধের পথে ঠেলে দিত সেগুলি বর্তমান রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় চিরতরে দূর করা হয়েছে। তবুও কিছু কিছু কারণে কোনো লোককে যদি অপরাধী সাব্যস্ত করা হয় তা'হলে তাকে কিছুকাল কারাবাস করতে হয়। কিন্তু সেই কারাগারগুলির চরিত্র এবং চিত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—আমাদের সময়ের কারাগারগুলির সঙ্গে। বিশ শতকে তো দেখেছি, জেলখানাগুলো ছিল বিভীষিকার রাজত্ব। নির্বিচারে এবং বিনা প্ররোচনাতেই কয়েদীদের ওপর প্রচণ্ড অত্যাচার চালানো হতো। জেলখানার মধ্যেই নিরস্ত্র মানুষদের পিটিয়ে বা গুলি করে মেরে ফেলাটা খুবই সাধারণ ব্যাপার ছিল। এদের কাছেই শুনলাম, এখন সরকার যাদের দোষী সাব্যস্ত করে এখনকার জেলখানায় রাখে তারা দেশের অন্যান্য নাগরিকরা যে খাওয়া-পরা এবং সুযোগ-সুবিধা পায় তার সব কিছুরই তারা অধিকারী। শুধু স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার তাদের থাকে না। সেইসঙ্গে এটাও লক্ষ্য রাখা হয়, যেন অপরাধীরা দ্রুত অপরাধ-প্রবণতার ব্যাধি থেকে মুক্ত হয়ে আবার সুস্থ সাধারণ নাগরিক জীবনের শরিক হতে পারে। এ কালের জেলখানার বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছিল, আজকের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা অপরাধীদের কোনো মানসিক রোগের

শিকার বলেই ধরে নেয় এবং সেইভাবেই তারা প্রতিবিধানের ব্যবস্থা চালু করেছে।

এখনকার দিনে ছেলে বা মেয়েরা বিবাহের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন। ২০ বছর বয়স পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষাক্রম শেষ করে তারা নিজেদের যোগ্যতা ও পছন্দমতো কাজ পায়। এ যুগে কেউ বেকার থাকে না। তারপর নিজের ভালো-লাগা বা রুচি অনুসারে একজনকে জীবনসঙ্গী বা জীবনসঙ্গিনী করে নেয়। কিন্তু বিবাহ এ যুগে কোনো স্থায়ী বন্ধন নয়। যদি একপক্ষ কিম্বা উভয়পক্ষই মনে করে তাদের দাম্পত্য-জীবন সুখের নয় তবে অনায়াসেই তারা বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে এবং এ ব্যাপারে রাষ্ট্র বা সমাজ কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না।

*　　　　　*　　　　　*

আমাদের ট্রেনটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন হলে হবে কি, গতিবেগে কিন্তু বিশ শতকের মেল ট্রেনের মতোই। কখনও চড়াই, কখনও উৎরাই আবার কখনও পাহাড়ের সুরঙ্গ পথ ধরে ছুটে চলেছে। দু'পাশের পাহাড়ে ধাপে-ধাপে নানা ফলের গাছ। বেশ কয়েক ঘণ্টা চলার পরে রেল সমতলভূমিতে নামল। এখন দু'পাশে শাল-সেগুনের জঙ্গল। আগে এই তরাই অঞ্চলে হিংস্র পশুদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র ছিল। এখন শুনলাম, এখানে কোনো বন্য পশুর উপদ্রব নেই। দেশের কয়েকটি সংরক্ষিত এলাকায় সমস্ত প্রজাতির জীবজন্তু রাখা আছে কিন্তু তার বাইরে কোথাও তাদের খুঁজে পাওয়া যাবে না। আরও কয়েক মাইল রাস্তা অতিক্রম করার পর একটা স্টেশনে গাড়ী দাঁড়াল। ওখান থেকে কয়েকটি শাখা রেলপথ জঙ্গলের দিকে চলে গেছে আর স্টেশন-সংলগ্ন এক বিরাট গুদাম। জিজ্ঞেস করে জানলাম শাখা রেলপথগুলি জঙ্গলের অভ্যন্তরে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। সেখান থেকে গাছ কেটে ওয়াগন ভর্তি করে এই স্টেশনে নিয়ে এসে গুদামজাত করা হয়, তারপর স্টেশনের কাছেই দশ হাজার লোকের বসতিপূর্ণ যে কাগজগ্রাম আছে সেখানে পাঠানো হয়। তা'ছাড়া ঘাস, কাপড়ের টুক্‌রো, বাঁশ এবং কাগজ তৈরীর অন্যান্য উপকরণও দেশের নানা জায়গা থেকে কাগজগ্রামে নিয়ে আসা হয় এবং সেখানে সর্বাধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে উৎকৃষ্ট মানের কাগজ তৈরী করা হচ্ছে। আবার কাগজ-গ্রামের পাশেই একটা কাঠের কারখানা আছে। সেখানে বাড়ি-ঘরের দরজা জানালা থেকে শুরু করে নানা কাজের কাঠের আসবাবপত্র তৈরী হয়।

গাড়ী স্টেশন ছাড়ল; আবার পরের স্টেশনে এসে দাঁড়াল। প্রত্যেক স্টেশনেই আমাকে দেখবার জন্যে কৌতূহলী মানুষের ভিড়। আমি যে এই গাড়িটিতে যাচ্ছি সে খবর সবাই জেনেছে। গাড়ী থেকে নামার কোনো দরকার হচ্ছিল না।—জানালার ধারেই বসেছিলাম আর সেইসঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয়-

বাহক আমারই লম্বা সাদা দাড়ি। গাড়ী যতক্ষণ স্টেশনে থামছিল আমাদের আলাপ-আলোচনা বন্ধ করতে হচ্ছিল। আবার চলতে শুরু করলেই পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে যাচ্ছিলাম।

এ বার জঙ্গলের সীমানা অতিক্রম করে সবুজ তৃণভূমির বুক চিরে গাড়ী এগিয়ে চলল। এখন জ্যৈষ্ঠ মাস অথচ ঘাসের রঙ কি গাঢ় সবুজ। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমরা আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে দরকার মতো বৃষ্টিপাতও ঘটাতে পার না-কি ? এখন খরার সময়ে ঘাসের রঙ এত সবুজ আছে কিভাবে!"

অধ্যাপক হক হেসে বললেন, "আপনি ঠিকই বলেছেন, এখন প্রয়োজনে আমরা বৃষ্টি নামাতে পারি; কিন্তু এখানে কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের দরকার হয়নি। জলসেচের খুব ভালো বন্দোবস্ত আছে এই অঞ্চলে। সাধারণত কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিপাত ঘটানো হয় উঁচু শুকনো পাহাড়া এলাকাকে কর্ষণযোগ্য করার জন্যে।"

এতক্ষণ রেলপথের দু'দিকেই কোনো তারের রেলিং ঘেরা ছিল না। হঠাৎ রেল লাইনকে এভাবে বেড়া দেওয়া হয়েছে কেন ? উত্তরটা নিজেই খুঁজে পেলাম। রেলপথের দু'ধারেই অজস্র গরু চরছে। যাতে বেমক্কা কোনো গরু রেল লাইনে উঠে এসে দুর্ঘটনা না ঘটায় তাই এই তারের জাল। স্বাস্থ্যবান বিশাল আকৃতির গরুর পাল সবুজ তৃণক্ষেত্রে মহানন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তৃণভূমির মধ্যে বড় বড় জলের চৌবাচ্চায় জল ভর্তি করা রয়েছে; ছড়িয়ে ছিটিয়ে কয়েকটা গাছও লাগানো আছে যেখানে বসে বসে কয়েকটি গরু পরম দার্শনিকের মতো জাবর কাটছে। গাভী-কুলের মধ্যে কয়েকটি ভীমাকার ষাঁড় চোখে পড়ায় আবার অধ্যাপক হককেই শুধোলাম, "তোমরা তো প্রাণীজ মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছ, গাড়ী-টানা বা লাঙল দিতেও গরু-মোষের দরকার হয় না, তাই গাভীকুলের বংশবৃদ্ধি করতে যে কটি ষাঁড় দরকার তার বাড়তি ষণ্ডগুলোর ব্যবস্থা কি করো ?"

"এখন আমরা হিসেব করেই ষাঁড় আর গাইগরুর জন্ম নিয়ন্ত্রণ করি। যে ক'টি ষাঁড়ের দরকার তার বেশী যাতে জন্মাতে না পারে সে ব্যাপারে পশু-প্রজনন বিজ্ঞানীরা ব্যবস্থা নেন।"

এ বার আমার সত্যিই আকাশ থেকে ভূপতিত হওয়ার মতো বিমূঢ় অবস্থা। কতগুলো বক্না আর তাদের জন্যে ক'টা এঁড়ে বাছুর জন্মাবে সেটাও এরা ঠিক করে দিচ্ছে! অধ্যাপক হক আমার বিমূঢ় অবস্থাটা বুঝতে পেরে বলল, "আমাদের ব্যবহারিক জীবনে যা' কিছু অসুবিধাজনক তাকে দূর করাই আজকের সমাজের লক্ষ্য। তাই আমাদের পরিশ্রম, গবেষণা, উন্নততর প্রযুক্তি-বিজ্ঞান সব কিছুই মানব-কল্যাণ অভিমুখী। সেই কারণেই যা কিছু অপ্রয়োজনীয় তার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভই আমাদের লক্ষ্য।"

এর পরের স্টেশনের নাম গোগ্রাম। গ্রামটিতে হাজার ছয়েক লোকের বাস; অবশ্য গ্রামটির নাম গোগ্রাম না হয়ে গোপালগ্রাম হলেই মানানসই হতো কারণ গরুর বাথান গ্রাম থেকে মাইল পাঁচেক দূরে। গরু বাছুর মিলিয়ে প্রায় এক লক্ষ, তার মধ্যে অর্ধেক দুগ্ধবতী। অবশ্য গরুর দুধ দোয়া সেই দুধকে ট্যাঙ্কারে ভরে চালান করা সবই যান্ত্রিক পদ্ধতিতে হয়। গরুর বাঁটে ছোট ছোট নল লাগিয়ে দুধ টেনে নেওয়া হয় তারপর সেই ছোট ছোট নলগুলি বড় নলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ট্যাঙ্কারে গিয়ে জমা হয়। তারপর প্রয়োজন মতো দুধপূর্ণ ট্যাঙ্কারগুলি ঠাণ্ডা বা গরম করে দেশের সর্বত্র চাহিদা অনুযায়ী পাঠানোর কাজ চলে। দুধের সংরক্ষণ পদ্ধতি এইরকম হওয়ার ফলে কোনো সময়েই খাবার আগে দুধ বাতাসের সংস্পর্শে আসতে পারে না, ফলে দুধের খাদ্যগুণ অবিকৃত থাকে। গোগ্রামে দুধ গরম বা ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা নেই —সে সব অন্যত্র হয়। এখানকার লোকদের কাজ দুধ দোয়ানো, গবাদি পশুর যথাযথ পরিচর্যা করা এবং দরকার মতো আলাদা আলাদা গোশালায় গরুদের রাখা। যে সব গ্রামে গবাদি পশুপালনের ব্যবস্থা আছে সেইসব জায়গাতেই আধুনিক পশু-চিকিৎসালয়ও আছে। গোগ্রাম থেকে দুধ সরবরাহ করা ছাড়াও গোবর-সার কৃষি-গ্রামগুলিতে পাঠানো হয়।

গোগ্রাম পার হয়ে আমাদের ট্রেন ছুটে চলল। এ বার মহিষগ্রামের এলাকার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। একই রকম তৃণভূমিতে বিশালাকৃতির মোষ চরে বেড়াচ্ছে। এদের কাছে বিংশ শতাব্দীর হিসার অঞ্চলের বিখ্যাত মহিষও শিশু। কালো পাথরের মতো শরীর, দুধের বাঁট যেন লম্বা লম্বা বোতলের মতো ঝলকাচ্ছে। দেখেই মনে হলো এ ধরনের মোষ দিনে কমপক্ষে এক মণ করে দুধ দেবার ক্ষমতা রাখে। মোষেরা গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে থাকতে ভালোবাসে তাই মহিষচারণ ভূমিতে অনেকগুলো জলের কুণ্ড দেখতে পেলাম। মোষের দুধ কিন্তু গোদুগ্ধের মতো সবটাই চালান করা হয় না। মহিষ পালকদের গ্রামে বৈদ্যুতিক মন্থন প্রক্রিয়ায় মোষের দুধ থেকে মাখন তুলে নেওয়া হয়, তারপর সেই মাখন ঠাণ্ডা করে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত গাড়ীতে দেশের বিভিন্ন জায়গায় চালান যায়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "মাটা-তোলা মোষের দুধ আপনারা কি ফেলে দেন?"

বিশ্বামিত্র জানালেন, "না, না, ফেলে দেওয়া হবে কেন। এদিকে কাছাকাছি বোতাম তৈরীর কারখানা আছে। মাখন-তোলা দুধের সাদা অংশ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আলাদা করে তার থেকে বোতাম তৈরী হয়, আরও নানা কাজে লাগে। আর্ট পেপারের মসৃণ শুভ্রতা আনতে ঐ দুধের সাদা অংশ ব্যবহার করা হয়।"

এতক্ষণে সাড়ে তিনটে বাজার তোপধ্বনি নিকটবর্তী কোনো গ্রাম থেকে হলো, আমরা ট্রেনে বসেই শুনতে পেলাম। যাত্রীরা যারা এদিক ওদিক ঘুরছিল

তারা নিজেদের আসনে এসে বসে পড়ল। গাড়ীর রসুইখানা থেকে কন্‌ভেয়ার বেল্ট-বাহিত হয়ে দুপুরের খাবার যাত্রীদের কাছে পৌঁছে গেলো। এখনকার খাবারে বিশেষ বৈচিত্র্য ছিল। একটা প্লেটে গোলমরিচ দেওয়া ঘিয়ে ভাজা নিমকি, সবুজ ছোলা, মটর-সেদ্ধ, দুধ মেশানো কাঁচা আমের রস এবং সেইসঙ্গে কয়েক জাতের ফল। খাবার ব্যাপারে দেখছি পুরনো দিনের রীতি-নীতি বেশ কিছুটা বজায় আছে।

আমার মনে পড়ছিল বিশ শতকের গোঁড়া হিন্দুদের কথা। তারা বলাবলি করত, এরপর কলিকাল আসছে —পৃথিবী নরকে পরিণত হবে। কিন্তু এই দু'-দিনের অভিজ্ঞতায় বুঝেছি, পৃথিবীতে কলিকাল এসেছে কিনা জানি না তবে এ দুনিয়ার মানুষ স্বর্গসুখে বাস করছে। আসলে এ যুগের মানুষ সমানভাবে পৃথিবীর সব কিছু উপভোগ করতে পারে আর এই ধরনের সম্ভাবনার কথা ভেবে সেকালের শোষকশ্রেণী আতঙ্কিত হতো এবং এই সাম্যবাদী ব্যবস্থা তাদের কাছে নরক বলে মনে হতো।

* * *

খাওয়া শেষ করে হাত-মুখ ধুয়ে আবার জানালার পাশটিতে এসে বসলাম। দু'ধারে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধুই ছোলার ক্ষেত। তার পরের স্টেশন শালিগ্রাম; এ বার ধানক্ষেত চোখে পড়ল। জিজ্ঞেস করে জানলাম, পঞ্চাশ বিঘা জমি নিয়ে এক একটি ক্ষেত তৈরী করা হয় যার চারপাশে উঁচু বাঁধ দেওয়া থাকে। বাসমতী, কনকজিরা, কিষেণভোগ এই জাতীয় উৎকৃষ্ট এবং উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষই শুধু হয়। মোটা চালের ধান-চাষ এখন বন্ধই হয়ে গেছে। শালিগ্রামের জনসংখ্যা দশ হাজারের কাছাকাছি। ওরা চাষ-আবাদ দেখাশুনো করে তা'ছাড়া গ্রামের ঠিক বাইরে একটা বড় ধানকল আছে সেখানে ধান ভাঙা হলে গাড়ী ভর্তি করে সে সব দেশের সর্বত্র চালান দেওয়া হয় আর ধানের খোসা, ভাঙা চাল আলাদা করে রেখে দেওয়া হয় সারের কাজে ব্যবহার করার জন্যে। এখন ধান কাটার পদ্ধতিও অন্যরকম। শুধু শিষগুলো কেটে নিয়ে ধান কলে নিয়ে আসা হয়, বাকী শুক্‌নো খড় আলাদা-ভাবে কেটে যেখানে কাগজকল আছে সেখানে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়।

রেল লাইনের পাশে এক জায়গায় ফুটবল খেলা হচ্ছিল। কয়েক হাজার মেয়ে পুরুষ জমা হয়ে খেলা দেখছিল। একটা প্রচণ্ড হর্ষধ্বনি উঠল, বোধহয় কোনো পক্ষ গোল দিলো। আর এক জায়গায় কবাডি খেলাও হচ্ছে দেখতে পেলাম। গাড়ীর গতি শ্লথ হয়ে আসছিল —সামনের কোনো স্টেশনে দাঁড়াবে। তাই খেলোয়াড়দের সুন্দর সুঠাম স্বাস্থ্য এবং ক্রীড়া-কুশলতাও গাড়ীতে বসেই দেখে নিলাম।

রেল লাইনের নীচ দিয়ে জায়গায় জায়গায় ছোট ছোট খাল চলে গেছে।

বিশ্বামিত্রের কাছ থেকে শুনলাম, এখন গঙ্গা বা গণ্ডক নদীতে বছরের কোনো সময়েই জলস্ফীতি দেখা দেয় না। সারা দেশে জালের মতো খাল কাটা আছে। বর্ষার অতিরিক্ত জল ঐ খালগুলিতে ধরে রাখা হয়। এখন যেমন বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে সমস্ত কলকারখানা চলে তেমনি বিদ্যুৎ-এর বেশীর ভাগটাই উৎপন্ন হয় প্রবাহমান জলস্রোতের সাহায্যে।

ট্রেন ছুটে চলেছে, ফেলে আসা দূরের পাহাড়শ্রেণীকে কালো মেঘের মতো মনে হচ্ছে। এ বার গমের ক্ষেত চোখে পড়ল। বাতাসের দোলায় গমের শিষগুলোকে শান্ত সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো মনে হচ্ছিল। গমের দানাগুলোও দেখতে পাচ্ছিলাম আর তাই বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞেস করলাম, "আমাদের সময়ের তিন নম্বর পুসা বীজের গমের দানার চেয়েও এখন তো দেখছি গমের দানা আরও বড়।"

বিশ্বামিত্র বলল, "আপনাদের সময়ের তিন নম্বর পুসা বীজের গমের দানা কৃষি-যাদুঘরে গেলে দেখতে পাবেন। এখন যে জিনিস দেখছেন সেটা আপনাদের সময়ের চেয়ে আয়তনে ও গুণে অনেক উন্নততর।"

বিশ্বামিত্রর কাছ থেকে এ কালের চাষ-আবাদের ব্যাপারটা আরও একটু বিস্তারিতভাবে শুনে নিলাম। জমি চাষ, বীজবোনা, ফসল কাটা সবই যন্ত্রের সাহায্যে হয়। যান্ত্রিক লাঙলে একসঙ্গে আট-দশ খানা ফলা লাগানো থাকে আবার লাঙলের পেছনে থাকে মই যা চষা জমির মাটিকে ছোট ছোট টুক্‌রো করে সমান করে দেয়। ভালো সার এবং প্রয়োজনীয় জলসেচের কোনো অভাব নেই তাই এখন একর প্রতি জমিতে ফলনও যেমন বেড়েছে, সেইসঙ্গে একই জমিতে বারো মাস আবাদ করতেও কোনো অসুবিধে হয় না।

গম ক্ষেতের ধারেই গমগ্রাম। সেখানে গম-পেষাই করার একটা বড় কারখানাও আছে। উৎপন্ন ফসলের সবটাই একবারে ভাঙা হয় না। কিন্তু স্থানীয় প্রয়োজনে, অন্য জায়গায় পাঠানোর প্রয়োজনে সারা বছরই গম-ভাঙানোর কলটিকে চালু রাখতে হয়। গমগ্রামের এলাকা পার হতেই আম-লিচু ইত্যাদি ফলের বাগান শুরু হলো। জিজ্ঞেস করে জানলাম, আমরা মোতিহারীর কাছাকাছি এসে গেছি এবং যে বাগানটা দেখছি সেটা একটা বিদ্যালয়-সংলগ্ন উদ্যান।

মোতিহারী শহরে এসে আমরা পৌঁছালাম। পুরনো শহর মোতিহারীকে যেন আর চেনাই যাচ্ছে না। সবই পাল্‌টে গেছে। জনসংখ্যা হাজার দশেকের মতো, কিন্তু পরিচ্ছন্নতায়, সৌন্দর্যে এই শহরের এক নতুন চেহারা এসে গিয়েছে। মোতি-হারী মল্লভূমির একটি জেলা শহর। পুরনো আমলের সারণ জেলাও এই মল্লভূমির মধ্যেই পড়ে। মল্লভূমির পশ্চিমভাগ কাশী-কোশল হয়ে লক্ষ্ণৌ পর্যন্ত বিস্তৃত। মল্লভূমির পরে কুরু, পঞ্চাল, সুরসেন ইত্যাদি প্রদেশ, যে নামগুলি প্রাচীন ভারতের

গণরাজ্যগুলির নামানুসারে আবার রাখা হয়েছে। দিল্লী অবশ্য এখনও মধ্যযুগীয় নামেই ভারতের রাজধানী হিসাবে রয়েছে। মোতিহারী শহরে জেলা পঞ্চায়েতের সদর কার্যালয়। জেলা পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্যরা এখানেই থাকে এবং এখান থেকে জেলার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত অঞ্চলের কাজ সুষ্ঠুভাবে যাতে পরিচালিত হয় তার ব্যবস্থাদি করে। মোতিহারা শহর নিশ্চয়ই, কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, গ্রামগুলির বাড়ি-ঘর, জনসাধারণের পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির সঙ্গে এই শহরের বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। শুনলাম মোতিহারী শহরে বড় ধরনের যন্ত্রপাতি সারানোর একটা কারখানা স্থাপন করা হয়েছে, সেইসঙ্গে যন্ত্রাংশ তৈরী করার ব্যবস্থাও আছে।

আবার চলা শুরু হলো। এ বার পথের দু'দিকেই তৈলবীজের ক্ষেত। অনেক জায়গায় ফসল কাটা হয়ে গিয়েছে আবার কোথাও নতুন চারা গাছ। বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞেস করে জানলাম গাড়ী এখন তৈলগ্রামেয় এলাকার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। এখানে ক্ষেতে প্রথম দফায় তিল বোনা হয়, তারপর তিল উঠে গেলে সরষে। আবার পাশেই একটি তেল-কল আছে। এখানে ভোজ্য ও মানুষের অন্যান্য কাজে ব্যবহার্য তেল উৎপন্ন হয়। এখান থেকেই তৈলবীজ পাঠানো হয় গাজীপুর, কনৌজ অঞ্চলে। ওখানে কয়েক শত একর জুড়ে ফুলের চাষ হয় এবং ফুলের সুগন্ধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তেলের সঙ্গে মিশিয়ে সুগন্ধী তেল বানানো হয়।

পরবর্তী স্টেশনের নাম দেখলাম আচারগ্রাম। শুধু আচার আর মোরব্বা তৈরী হয় এই গ্রামটিতে কিন্তু আচার ও মোরব্বা তৈরার সমস্ত উপকরণ আসে দেশের ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে। এ অঞ্চলের মানুষ আচার আর মোরব্বা তৈরীর কাজে বেশ কয়েক পুরুষ ধরে পারদর্শী। এখন তাদের পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত অভিজ্ঞতায় যে মুখরোচক খাদ্যবস্তুটি তৈরী হয় তার আস্বাদনের সুযোগ সারা দেশের লোকের ভাগ্যেই জোটে। পথেই দধিগ্রাম, ডালগ্রাম পড়ল। তারপর শুরু হয়ে গেলো আম, জাম, লিচুর বাগান। এ অঞ্চলের আম আর লিচু বহু শতাব্দী আগেই খ্যাতি অর্জন করেছে। বর্তমানে সুষ্ঠু রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে এবং উদ্ভিদবিদ্যার সাম্প্রতিকতম গবেষণার সাহায্যে এ অঞ্চলের এই ফলগুলি সমগ্র ভারতের চাহিদা মিটিয়ে সারা বিশ্বে রপ্তানি করা হয় —এমনই সুপ্রচুর ফলন। ইতিমধ্যে সূর্যাস্ত হয়ে গেলো, আর গাড়ীর মধ্যে দিনের মতো বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে উঠল। এখন আর জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকা বৃথা। সুতরাং আবার গল্প আলোচনায় আমরা মশগুল হয়ে উঠলাম। রাত্রি আটটায় রেলের খাবার ঘর থেকে নানা রকম সুখাদ্য এসে গেলো, আমরাও নৈশভোজ সেরে নিলাম। তারপর আরও কিছুক্ষণ সময় গল্পগুজব করে নিজের নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

• • •

তখন বোধহয় ভোর চারটে, গাড়ীর ঝম্‌ঝম্‌ আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেলো। মনে পড়ল, বিশ্বামিত্র বলেছিল গঙ্গার ওপর নতুন সেতু তৈরী হয়েছে এবং গাড়ী বদল না করে পাটনা পর্যন্ত পৌছে যাব। আর তাই হলো, ট্রেন অল্প সময় পরেই পাটনা স্টেশনে এসে যাত্রাবিরতি ঘোষণা করল। পাটনা—প্রিয়দর্শী সম্রাট অশোকের স্মৃতি-বিজরিত পাটলীপুত্র নগরী।

এই নতুন শতাব্দীতে পৌছে আমি যে সব অভিনব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এতক্ষণ কাটালাম সেগুলো একবার মনে মনে ঝালিয়ে নিতে চেষ্টা করলাম। একটা জিনিস প্রথমেই মনে হলো বিংশ শতাব্দীর মানুষের তুলনায় একালের মানুষ অনেক বেশী বুদ্ধিমান। তখনকার লোকের ভাবনা ছিল তাদের নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিস যেন কাছাকাছি উৎপন্ন হয়। এই কারণে সেকালে একই গ্রামে সব রকমের প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরী করার চেষ্টা করত। আর এখন একটা গ্রামের সব লোকই কেবলমাত্র একটি জিনিস উৎপাদনের কাজে নিজেদের কর্মশক্তিকে নিয়োজিত করছে। দর্জিগ্রাম কাপড় উৎপাদনকারী গ্রাম থেকে কাপড় নিয়ে এসে লক্ষ লক্ষ মানুষের পোষাক-পরিচ্ছদ বানাচ্ছে। কিন্তু তাদের কখনই ভাবতে হয় না কোথায় চাল-ডাল-আটা পাওয়া যাবে কিম্বা নিজেদের দরকারে সব্জি চাষ কখন করবে বা গরু-মোষ পালন করার জন্যে ক'জন লোক কাজ করবে। তারা সারা দেশের পোষাক-পরিচ্ছদ বানাবার দায়িত্ব পেয়েছে প্রতিদানে তাদের অন্যান্য সব কিছুর চাহিদা মেটানোর দায়িত্ব দেশের অন্যান্য গ্রামের। আমাদের যুগে দেখেছি, সারা দিন-রাত পরিশ্রম করেও দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের ব্যবস্থা বেশীরভাগ শ্রমিকরাই করতে পারত না। নুন আনতে পান্তা ফুরোয় গোছের মতো অবস্থা ছিল সেদিনের শ্রমিকশ্রেণীর। আর আজকের যুগে মানুষ সপ্তাহে পাঁচদিন চার ঘণ্টা করে পরিশ্রম করে কিন্তু তাতেই জীবনের যত সুখ আনন্দ সব কিছুরই তারা অধিকারী। অবশ্য পুরনো দিনেও সামান্য কিছুসংখ্যক মানুষ ছিল যারা যাবতীয় পার্থিব সুখ-ঐশ্বর্য ভোগদখল করত, কিন্তু পরশ্রম-অপহারক ঐ সামান্য ক'জন মানুষ মোট জনসংখ্যার এক নগণ্যতম অংশ হিসেবে বিবেচিত হতো। সে দিনের শ্রমকারী এবং দরিদ্র মানুষের প্রতিভা স্ফুরণের কোনো সুযোগ ছিল না কারণ সংসার, দারিদ্র্য, শোষণের যাঁতাকলে সে প্রতিভার অকালমৃত্যু ছিল অনিবার্য। এখন মানুষের জীবনধারা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। সপ্তাহে মাত্র ২০ ঘণ্টা কাজ, বাকী সময় যার যেমন রুচি—খেলাধূলা, সংস্কৃতিচর্চা, পড়াশুনা ইত্যাদির মধ্যে সে নিজেকে পরিশীলিত উন্নত নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে পারে। এ ছাড়াও আজকের দিনে প্রত্যেক কর্মী বছরে ৩ মাস করে ছুটি

পায় এবং ছুটির সময়ে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় সে বেড়িয়ে আসতে পারে। এখন সারা পৃথিবী এক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার অধীনে সুতরাং পছন্দমতো জায়গায় যাওয়ার কোনো বাধা-নিষেধ নেই। নিজের গ্রামে বা বাড়িতে যে পরিবেশে মানুষ অভ্যস্ত —পৃথিবীর সর্বত্র সেই সুখ-সুবিধা-আরামের বন্দোবস্ত পর্যটককারীদের জন্যে আছে। নিজের নিজের কর্মক্ষেত্র নির্বাচনেও এ কালের মানুষ স্বাধীন, শুধু দরকার প্রার্থিত কাজটি করবার মতো দক্ষতা। তাই একজন ভারতীয় আঙ্গুর-বিশেষজ্ঞ এখন যদি ইচ্ছে করেন ফ্রান্সে গিয়ে বসবাস করবেন এবং সেখানেই কাজ করবেন তা'হলেও তাঁর কোনো রকম অসুবিধায় পড়তে হবে না। কারণ ফ্রান্স আঙ্গুর উৎপাদনে অগ্রণী দেশ এবং সেখানে ঐ কাজ করার লোকের চাহিদা প্রচুর।

পাটনা স্টেশনেই নালন্দাগামী ট্রেন দাঁড়িয়ে ছিল। আমি অন্যান্য সহযাত্রীদের বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে নালন্দার গাড়ীতে উঠে বসলাম।

নালন্দায় সম্বর্ধনা

আমাদের ট্রেন এখন দ্রুতগতিতে নালন্দা অভিমুখে ছুটে চলেছে। ব্রাহ্ম মুহূর্তের আলো-অন্ধকার ভেদ করে সূর্যদেব এখনও সপ্তাশ্ব-বাহিত রথে পূর্ব দিগন্তে উদিত হননি কিন্তু অরুণাভ রক্তিম দিগন্ত তাঁর আগমন বার্তা ঘোষণা করছে আর সে খবর পাখীদের কুলায় পৌছে গেছে দিকে দিকে। আরও কিছুটা সময় কাটল, আমার সহযাত্রীরা প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করে নিজের নিজের জায়গায় ফিরে এলেন। কেউ একটি বই নিয়ে মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করছে ; কেউ গুণগুণ করে স্বর ভাঁজছে ; কেউ বা চুপচাপ বসে হয়ত কোনো জটিল চিন্তার সমাধান সূত্র খুঁজছে। শুধু ট্রেনের ধাতব আওয়াজ, আর সবই যেন এক প্রভাতী মৌনতায় ধ্যানমগ্ন।

গাড়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করল। চারিদিকে বিস্তৃত সবুজ মাঠের মধ্যে তিনতলা এক বিশাল ভবন। তার কিছুটা দূরে এক বহুতল বিশিষ্ট চার-মহলা বাড়ি যার মাঝখানে এক বড় চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণ। বিশ্বামিত্র বলল, "এটা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আর পাশেরটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস। আর ঐভাবেই সমস্ত বিভাগের জন্য আলাদা আলাদা পাঠভবন এবং ছাত্রাবাস আছে।"

ঠিক সাড়ে ছ'টায় একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় নির্দিষ্ট সময়ে আমাদের ট্রেন নালন্দার প্রধান স্টেশনে এসে পৌছাল। নালন্দা এখন এক জমজমাট উপনগরী। এখানে আরও চারটি স্টেশন আছে। ট্রেনে বেতার-দূরভাষণের ব্যবস্থা আছে।

বিশ্বামিত্র আগের স্টেশনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে জানিয়ে দিয়েছিলেন আমার আগমন বার্তা। পাটনা থেকে যখন গাড়ী বদল করি তখন দরজার কাছেই বসেছিলাম তাই গাড়ী থামতে প্রথমেই নেমে পড়লাম। স্টেশনে আচার্য বশিষ্ঠ এবং আরও জনা পঞ্চাশেক অধ্যাপক-অধ্যাপিকা উপস্থিত ছিলেন। আমি নামতেই ফুল আর ফুলের মালায় তাঁরা উষ্ণ সম্বর্ধনা জানালেন। স্টেশনের বাইরে আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্যে মোটরগাড়ী অপেক্ষা করছিল। আমি বললাম, "এইটুকু তো রাস্তা, মোটরে না গেলেই নয়? বরং হেঁটে গেলে রাস্তায় যারা অপেক্ষা করছে তাদের সঙ্গে ভালো করে সাক্ষাৎ-পরিচয় হবে।" আমার প্রস্তাব সকলেই মেনে নিল। আমরা পায়ে হেঁটে 'বসুবন্ধু' ভবনের দিকে চললাম।

'বসুবন্ধু' ভবনটি স্থাপত্যকলার এক অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন। বাড়িটি বেশ উঁচু এবং সম্ভবত শ্বেতপাথরে তৈরী। বাড়ির উঠানে পুরনো দিনের আচার্য, উপাচার্য এবং বহু বিশ্ববরেণ্য মনীষীদের মর্মর মূর্তি। আমার দেখে খুবই ভালো লাগলো যে বিদ্যাব্রতের একটি মূর্তি এখানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। বিদ্যাব্রত হলেন সেই ব্যক্তি যিনি নালন্দার পুনরুদ্ধারের কাজে নিজের সর্বস্ব দান করেছিলেন। স্থাবর অস্থাবর সব মিলিয়ে তাঁর পঁচিশ লাখ টাকার সম্পত্তি ছিল। তাঁর কোনো সন্তান-সন্ততি ছিল না। তিনি ধ্বংসপ্রাপ্ত নালন্দাকে নিজের সন্তান হিসেবে মনে করতেন। এই মহৎ ত্যাগের দৃষ্টান্ত বিদ্যাব্রত যে সময় রেখেছিলেন সে সময় ঐ ধরনের কাজে কোনো ধনী ব্যক্তি এগিয়ে আসতেন না। আমার বেশ মনে আছে, সেই একই সময়ে নালন্দার পুনরুদ্ধারের বাসনা আমারও ছিল। কিন্তু বাস্তবে আমার মতো অতি সাধারণ পর্যায়ের মানুষের চেষ্টায় অতবড় কাজ সম্পন্ন করা যে সম্ভব নয় সেটাও বুঝতাম। তবু যতটুকু শক্তি তাই নিয়েই কাজে নেমে পড়েছিলাম। সে সময় বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি সমাজে যে একদম ছিল না তা' নয়, কিন্তু কেউই সে সময় সাহায্য ও সহযোগিতার হাত এগিয়ে দেননি। সমাজের বিত্তবান মানুষরা কিছু দান-খয়রাতি করতেন বটে কিন্তু প্রতিদানে যশ বা খ্যাতির সম্ভাবনা না থাকলে হাত দিয়ে একটি পয়সাও বার হতো না। বরং অনেক নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত মানুষদের সঙ্গে পেয়েছিলাম যাঁরা আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন কিন্তু তাঁদের যতটা সাধ ছিল, সাধ্য ছিল অনেক কম। তবুও তাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা নিয়েই একটু একটু করে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় পুনরুদ্ধারের কাজে নেমেছিলাম কিন্তু কাজ আশানুরূপভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারিনি। বিদ্যাব্রতের সঙ্গে আমার কোনো ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না। তবুও কিসের প্রেরণায় তাঁর সমস্ত সম্পদ এই প্রাচীন শিক্ষানিকেতনটি পুনর্গঠনের কাজে দান করলেন। দু'শ বছর পার হয়ে গেছে সেই সময় থেকে কিন্তু আমার স্মৃতিতে সেই

মহানুভব ব্যক্তি এখনও উজ্জ্বল হয়ে বিরাজ করছেন। সেই সময় তাঁকে আমরা উপযুক্ত মর্যাদা দিতে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিতে পেরেছিলাম কি!

'বসুবন্ধু' ভবনটি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় সভাগৃহ। অর্ধচন্দ্রাকৃতির এই বাড়িটিতে প্রায় সওয়া লক্ষ মানুষ একসঙ্গে বসতে পারে। বসার গ্যালারী মঞ্চের সামনে থেকে ধাপে ধাপে উচুতে উঠে গেছে। যদিও অর্ধচন্দ্রাকৃতি গ্যালারীর সারি মঞ্চের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ঘিরে আছে তবু ব্যবস্থাদি এমন চমৎকার যে গ্যালারীর সর্বোচ্চ সারির দর্শকরা মঞ্চের সবাইকে পরিষ্কারভাবে দেখতে পায় এবং শব্দ-প্রসারণ যন্ত্রের মাহাত্ম্যে মঞ্চের মানুষদের অস্ফুট কণ্ঠস্বরও তাদের অগোচরে থাকে না। সভাগৃহের দেওয়ালে বিশ্ব মনীষীদের তৈলচিত্র এবং সোনালী অক্ষরে তাঁদের বাণী উৎকীর্ণ। শুনলাম এইসব ছবি এখানকার ছাত্র এবং অধ্যাপকদেরই রচনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক শিক্ষিকারা আমায় সম্বর্ধনা জানানোর জন্যে উপস্থিত ছিলেন। আচার্য বশিষ্ঠ আমায় সঙ্গে করে মঞ্চে নিয়ে এলেন। এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে আচার্য সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আমায় শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানালেন। আমিও সংক্ষেপে তাঁদের আন্তরিক সম্বর্ধনার প্রত্যুত্তরে কৃতজ্ঞতা জানালাম। সেইসঙ্গে বললাম, আমি এখন কয়েকদিন এখানেই থাকবো সুতরাং সকলের সঙ্গে ভালোভাবে আলাপ পরিচয়ের সুযোগ হবে।

ওখান থেকে বেরিয়ে সোজা অতিথিনিবাস। এই অতিথিনিবাসটি একটি পাঁচতলা বাড়িতে অবস্থিত। ঘর এবং অন্যান্য ব্যবস্থা আপেলগ্রামের অতিথি-ভবনেরই মতো। তবে এখানে একসঙ্গে এক হাজার অতিথি যাতে ভালোভাবে থাকতে পারেন সে ব্যবস্থা রয়েছে। ওপর-নীচ করার জন্যে লিফ্‌টের বন্দোবস্ত আছে। আর একটা জিনিস, অতিথিভবনের মধ্যেই ভোজনশালা এবং চিকিৎসা-লয়। অতিথিদের আদর-আপ্যায়ন করার জন্যে অনেক মহিলা ও পুরুষ কর্মী রয়েছে। আর আমার কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় লাগল এই অতিথিভবনের সুবৃহৎ পাঠাগারটি। অতিথিনিবাসের দরজা থেকেই ট্রাম পাওয়া যায়। এই ট্রাম লাইন বিশাল এলাকায় বিভিন্ন ছাত্রাবাস-পাঠভবনের দরজা পর্যন্ত ছড়ানো। অতিথি যে শিক্ষানিকেতনে যেতে চাইবেন সেখানকার নির্দিষ্ট ট্রামে উঠে চলে যাবেন — সামান্য হাঁটার কষ্টটুকু পর্যন্ত করতে হবে না। আমি সব দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, দুই শতাব্দীর মধ্যে কি বিপুল অগ্রগতি ঘটে গেছে। আচার্য বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, আমি এবং আমাদের সঙ্গের অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা একসঙ্গে বসে জলযোগ পর্ব শেষ করলাম।

প্রাথমিক শিশুশিক্ষা পদ্ধতি

অন্যান্য অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা জলযোগের পর নিজ নিজ কাজে চলে গেলেন, রইলাম আমি, বিশ্বামিত্র, আচার্য বশিষ্ঠ এবং শিশুবিভাগের প্রধানা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপিকা বীরা। আমি সর্বাগ্রে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য শিশুবিভাগটি দেখতে যাব, এ খবর আগেই দেওয়া ছিল। এটা আমিই ঠিক করেছিলাম, কারণ এ কালের শিক্ষাপদ্ধতি বুঝতে বা জানতে হলে প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করাই উচিত।

শিশুবিভাগের পাঠভবন এই অতিথিগৃহ থেকে প্রায় দু'মাইলের মতো। পথের দু'ধারে খোলা মাঠ এবং অন্যান্য বাড়িগুলি চোখে পড়ছিল। আজ বিদ্যালয়গুলির ছুটির দিন। ছেলে-মেয়েরা এদিক ওদিক বেড়াচ্ছে, কেউ বা একলা বসে কিছু মনোযোগ সহকারে পড়ছে আবার কোথাও খেলাধূলার আসর জমেছে। ট্রামে আমাদের প্রায় সকল সহযাত্রীই বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি। কেউ এসেছে নিজেদের ছেলে-মেয়েদের দেখতে, কেউ বা বাৎসরিক ছুটির সময়ের কিছুটা এখানে কাটিয়ে যেতে, আবার কেউ শিক্ষা সম্পর্কে কোনো গবেষণার কাজে এসেছে।

ট্রাম শিশুবিভাগের বাগান-ঘেরা বাড়িটির সামনে এসে থামল। আমরা ট্রাম থেকে নেমেই শিশুবিভাগের সকল শিক্ষয়িত্রীদের দ্বারা সম্বর্ধিত হলাম। বাড়ির লাগোয়া উদ্যানটি বিশাল তবে এই জিনিসেরই ক্ষুদে সংস্করণ দেখেছিলাম আপেল-গ্রামের শিশুনিকেতনে। শিক্ষয়িত্রী এবং অন্যান্য বয়স্কা মহিলাদের বাদ দিলে এটাকে একটা কচিকাঁচার গ্রামও বলা যেতে পারে। এখানে শিশুদের দেখাশুনা, পড়ানো সমস্ত দায়িত্ব কিন্তু মহিলারাই পালন করে। শুধু যে এটা একটা শিশুশিক্ষা ভবন বলে প্রথমে ভুল করেছিলাম এখানে এসে সেই ভুল ভাঙলো। একই এলাকার মধ্যে যেমন পাঠভবন রয়েছে তেমনি আছে রন্ধনশালা, খাবার ঘর, রাত্রিতে থাকার আলাদা ঘর, চিকিৎসাকেন্দ্র —সব কিছুই।

আগেই বলেছি, শিশুদের তিন বছর বয়স পূর্ণ হলেই তাদের এই ধরনের কেন্দ্রীয় শিক্ষায়তনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। নালন্দার মতোই দেশের সর্বত্র শিক্ষা-ব্যবস্থার পদ্ধতি একই রকম। শিশুবিভাগে রাখা হয়, চার বছর বয়স শুরু হওয়া থেকে ছ'বছর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত। তারপর সাত বছর বয়স থেকে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত মাধ্যমিক বিভাগে। এর পর পনেরো থেকে কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত উচ্চ শিক্ষা বিভাগে। শিশুবিভাগ সহ মাধ্যমিক, উচ্চ শিক্ষা বিভাগগুলিতে শিক্ষা-

দানের পদ্ধতি দেশের সর্বত্র একই রকমের। শিশুবিভাগে বইপত্রের ব্যবহার খুবই কম যদিও এখানেই শিশুদের বর্ণপরিচয় এবং প্রাথমিক গণিতের সঙ্গে পরিচয় ঘটানো হয়। তবে শিশুরা এখান থেকে মাধ্যমিক বিভাগে যাওয়ার আগেই লিখতে এবং পড়তে বেশ পোক্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু বেশীরভাগ শিক্ষণীয় বিষয়গুলি মৌখিক এবং সে সব বিষয় এমন শিশু-চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে পড়ানো হয় যাতে শিশুমনের কৌতূহল বেড়ে ওঠে। ফল এই দাঁড়ায়, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে আকর্ষণ অব্যাহত থাকে এবং শিক্ষণীয় বিষয় কখনও শিশুমনে নীরস হয়ে ওঠে না। আবার যে বিষয়ে যে শিশুর আগ্রহ বেশী শিক্ষিকারা তাকে সেই বিষয়েই বিশেষভাবে যত্ন নেন যাতে ভবিষ্যতে সে ঐ বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠতে পারে। এখানে শুধু লেখাপড়া শেখানোই হয় না; খেলাধূলা, নানারকম শরীরচর্চার দ্বারা শিশুরা যাতে নীরোগ স্বস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে সে দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়। এখানে শিশুরা নিজেদের পছন্দমতো সব রকম খেলাধূলার স্থযোগ পায়। শিক্ষিকারা একটু একটু করে খেলার নিয়মগুলো বাচ্চাদের শিখিয়ে দেয় তারপর বাচ্চারা নিজেরাই ঠিকমতো খেলতে চেষ্টা করে। পড়াশুনা, খেলাধূলা সব কিছু মিলিয়ে যারা অন্যদের থেকে অধিকতর যোগ্যতা দেখাতে পারে তারা সামনের দিকের আসনে বসতে পায়। এ ছাড়া অন্য কোনো রকমের পুরস্কার কাউকে দেওয়া হয় না। শিক্ষিকারা গল্পচ্ছলে ইতিহাস শিক্ষা দেন। সন-তারিখে ভারাক্রান্ত করে আমাদের সময়ের মতো ইতিহাস পডানোর পাট উঠে গেছে। শিশুদের স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে নিয়মগুলো খুব যত্নের সঙ্গে শেখানো হয়। এবং এটাই তাদের বলা হয়, তোমার একার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতন হলে চলবে না তোমার পরিবেশ, তোমার অন্যান্য সহপাঠীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কেও সচেতন থাকতে হবে। এ ছাড়া বয়স্কদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা এবং ছোটদের ওপর মমত্ববোধ যাতে গড়ে ওঠে সে ব্যাপারেও শিক্ষিকারা যথেষ্ট নজর রাখেন যাতে আজকের শিশুরা ভবিষ্যতে স্থনাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠে।

এই শিশু পাঠভবনের সংগ্রহশালাগুলি বই-পুঁথি পড়ার অভাব মিটিয়ে দেয়। ইতিহাস, প্রাণীবিজ্ঞান, ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান সমস্ত শিক্ষণীয় বিষয়ের মিউজিয়ম রয়েছে। আর এই কারণেই একালের ছেলেমেয়েরা শেখে অনেক বেশী কিন্তু আমাদের সময়ের মেধাবী ছাত্রদের মতো বই মুখস্ত করে মানসিক দিক থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়ে না।

ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় নিয়ে গিয়ে এই বিভাগের অধ্যক্ষা যাঁরা আমাকে সব কিছু দেখালেন। শিক্ষিকাদের সঙ্গে আগেই আলাপ হয়েছিল, শিশুদের সঙ্গেও পরিচয় হলো। পুরনো মাস্টারী করার অভ্যাসটা দুশ' বছর ঘুমিয়েও নষ্ট হয়ে যায়নি।

একটি সংগ্রহশালায় কার্ল মার্কস-এর মূর্তিটিকে দেখিয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করলাম ওঁর সম্পর্কে যা জানো বলো দেখি।

সে বেশ চমৎকার করে বলল, "উনি মানবজাতির প্রকৃত মুক্তির পথ অনুসন্ধান করে সফল হয়েছিলেন। কিন্তু নিজের জীবনে অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেও আদর্শ থেকে এক চুলও সরে আসেননি।"

এতবড় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশু বিভাগ ঘুরে দেখতে দেখতে তিনটে বেজে গেলো। বলা বাহুল্য, দুপুরের খাওয়াটা শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গেই খেয়ে নিয়েছিলাম। এখানকার সকল শিক্ষিকাদের যোগ্যতা প্রশ্নাতীত। অধ্যক্ষা যাঁরা যেমন সকল বালিকাদের কাছে আদর্শ স্বরূপা, তেমনি আবাসিক ছাত্রদের কাছে মায়ের চেয়েও বেশী কাছের মানুষ। অনেকক্ষণ ধরে এই মহান্ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় দেড়শ' বছরের বেশী প্রতিষ্ঠিত এই পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষায়তনের ইতিহাস শুনলাম, তারপর আবার ট্রামে করে ফিরে এলাম অতিথিনিবাসে। আগামীকাল মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ পরিদর্শনে যাব সুতরাং এখন সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করলাম।

মাধ্যমিক শিক্ষায়তনে

পরের দিন। অতিথিভবন থেকে বেরিয়ে অন্য রুটের ট্রামে চড়লাম। মাধ্যমিক শিক্ষায়তনের ক্যাম্পাস অতিথিভবন থেকে প্রায় মাইল চারেক দূরে। আগেই বলেছি, মাধ্যমিক শিক্ষাবিভাগে তাদেরই নেওয়া হয় যাদের বয়স ছ'বছর পূর্ণ হয়ে গেছে এবং এই মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত চলে। আবার এই মাধ্যমিক পাঠক্রম ২ বছর করে চারটি উপবিভাগে ভাগ করা আছে। এখানে পড়ানো হয় সাহিত্য, গণিত, ভূগোল, ব্যাকরণ, সঙ্গীত, চিত্রকলা, কৃষি, পশুপালন ইত্যাদি বিষয়গুলি। কিন্তু সব ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্ত পাঠ্য বিষয়গুলি পড়তে বাধ্য করা হয় না। কারণ এ কালের শিক্ষা ব্যবস্থা কোনো ভবিষ্যতের প্রলোভন দেখায় না। উদাহরণ দিয়েই বলি, এখানে ভর্তি হবার পর প্রথম দিকে একটি প্রাচীন ভারতীয় ভাষা, যেমন সংস্কৃত পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু কোনো শিক্ষার্থীর যদি ঐ ভাষা শেখার ব্যাপারে অনাগ্রহ দেখা যায় তা'হলে তাকে জোর করে সংস্কৃত শিখতে বাধ্য করা হয় না।

মাধ্যমিক শিক্ষায়তনের বিশাল ক্যাম্পাসের প্রবেশ দ্বারেই ওখানের শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীরা আমায় বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানাল। বালক-বালিকা

নির্বিশেষে সমস্ত পড়ুয়াদের একই ধরনের পোষাক। একাধিক পাঠভবন, ছাত্রাবাস, খেলার মাঠ, গ্রন্থাগার, সংগ্রহশালা, সাঁতার শেখার পুকুর সব মিলিয়ে একটি বিরাট শহর।

মাধ্যমিক বিভাগ থেকেই বই পড়া এবং পড়ানো খুব গুরুত্বের সঙ্গে শুরু হয়। শিশুবিভাগে ছাত্র-ছাত্রীদের তৈরী করে দেওয়া হয় যাতে তারা বই পড়তে এবং লিখতে শেখে বেশ ভালোভাবে। কিন্তু সেখানে কোনো নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকের ঝামেলা নেই। মাধ্যমিক বিভাগে সমস্ত শিক্ষণীয় বিষয় গ্রন্থাধ্যায়নের মধ্যে দিয়ে হয়। তবু বই পড়ে শেখার কাজটা যতদূর সম্ভব আকর্ষণীয় করা যায় তার ব্যবস্থা আছে। যেমন নাটক এবং চলচ্চিত্রের সাহায্যে ইতিহাসের জটিল ক্রান্তিকালগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের বোঝানো হয়। বিজ্ঞানের সব বিভাগগুলিতে এমন চমৎকার বীক্ষণাগার আছে যেখানে বই থেকে জানা ও শেখা বিদ্যাকে সহজেই যন্ত্রপাতির সাহায্যে হাতে-কলমে বুঝে নেওয়া সহজ হয়ে যায়।

এখানে সব কিছু শিক্ষার মাধ্যম 'ভারতী' ভাষা, যে ভাষা এ-কালে সমস্ত ভারতের মানুষের মাতৃভাষা হিসাবে গড়ে উঠেছে। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরেই দু'বছর 'সার্বভৌমী' ভাষা এস্পেরান্ত শেখানো হয়। এই এস্পেরান্ত ভাষার ব্যাপারটি আমায় ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যে এখানকার ঐ ভাষার প্রধান শিক্ষককে অনুরোধ করলাম। তিনি চমৎকারভাবে আমায় যা জানালেন তা' হলো সংক্ষেপে এইরকম: মাত্র ১৫টি ব্যাকরণের নিয়ম-সম্বলিত আধুনিক কালের এস্পেরান্ত বা 'সার্বভৌমী' ভাষা। লিঙ্গ, বিভক্তি, শব্দরূপ ও ধাতুরূপ খুবই সরল এবং অপরিবর্তনীয়। কোনোরকম গোঁড়ামী বা সঙ্কীর্ণ মনোভাবের বশবর্তী না হয়ে, সংস্কৃত, গ্রীক, চীনা, ল্যাতিন, স্লাভ, টিউটনিক, আরবী, ফারসী প্রভৃতি সমস্ত ভাষা থেকে এই 'সার্বভৌমী' ভাষার শব্দভাণ্ডার গড়ে উঠেছে। যে দু'বছর সার্বভৌমী ভাষা শিক্ষার জন্যে ব্যয় করা হয় সেই সময় সেই সব পড়ুয়াদের আলাদা ছাত্রাবাসে রাখা হয় যেখানে তারা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে 'সার্বভৌমী' ভাষায়। এইভাবেই ভাষা-শিক্ষা যেমন সহজ হয়ে যায় তেমনি ভাষা-শিক্ষার যা মৌল প্রয়োজন—ভাবের আদান-প্রদান করা, সেটাও জড়তামুক্ত হয়।

আগেও বলেছি, এখনকার শিক্ষা-ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসার দিকে সতর্ক লক্ষ্য রাখা। এই জন্যেই নানা ধরনের পরীক্ষার মাধ্যমে জেনে নেওয়া হয় প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কি কি বিষয়ে কৌতূহল কম এবং বেশী এবং সেটা জেনে নিয়েই প্রত্যেকের নিজস্ব প্রবণতা যেদিকে সেদিকেই তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। জোর করে গিলিয়ে দেওয়ার মতো শিক্ষাপদ্ধতি এ যুগে আর নেই। আমার মনে পড়ে গেলো বিংশ শতাব্দীতে আমাদের সময়ের

কথা। তখন বাবা-মা বা অভিভাবকরা নিজেদের পছন্দমতো অর্থকরী বৃত্তির বিদ্যালয়ে ছোটদের পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু একবারও ভেবে দেখার কথা মনে হতো না ঐ বিশেষ বিষয়ে তাদের সন্তানদের কোনো আগ্রহ আছে কি না। ফলে তখন অধিকাংশ ছাত্রদেরই বিদ্যার্জন এক কুইনাইন বড়ি চিবিয়ে খাওয়ার ব্যাপার দাঁড়াত। ভবিষ্যৎ জীবনে ঐভাবে তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিরা সমাজে শুধু তিক্ততারই সৃষ্টি করতে পারতেন। লেখাপড়া শেখার কাণ্ডটা সুকুমারমতি বালক বালিকাদের কাছে এক বিভীষিকার মতো ব্যাপার ছিল তখনকার দিনে।

এখনকার শিক্ষা-ব্যবস্থার আর একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো, শিক্ষার্থীদের পাঠক্রম এমনভাবে পরিকল্পিত যাতে ভবিষ্যৎ জীবনে কোনো মানুষই কোনো ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ না থাকে। এমন কি যারা উচ্চতর গবেষণার কাজে ভবিষ্যৎ জীবনে আত্মনিয়োগ করে তারাও নিজেদের উচ্চতর বিশেষ জ্ঞানের সীমার মধ্যে কূপমণ্ডুক হয়ে থাকে না। এখনকার শিক্ষাদান পদ্ধতি এমনই যে, মানুষের বহুব্যাপ্ত জ্ঞানভাণ্ডারের প্রাথমিক এবং মৌল উপকরণগুলি শেখানো হয় এই মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর থেকে। কিন্তু তার জন্যে একগাদা বই, পরীক্ষায় পাশ করা —এ সবের দরকার হয় না। অর্থাৎ শিক্ষাদান পদ্ধতিতে কোনো একটি বিষয় আরও দশটা বিষয়ের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কসূত্রে গ্রথিত। তাই যে বিদ্যার্থীর ভূগোল ভালো লাগে না তাকে ভূগোল পড়তে বাধ্য করা হয় না, কিন্তু সে হয়ত কৃষিবিদ্যায় আগ্রহশীল এবং কৃষিবিদ্যার মধ্যেই ভূগোল-সম্পর্কীয় জ্ঞান সে যথেষ্ট আহরণ করতে পারে।

আমাদের সময়ের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে তুলনা করলে এ কালের শিক্ষা-ব্যবস্থায় কি আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে সেটা বুঝতে সুবিধে হবে। তখনকার দিনে ভাষা বা সাহিত্যের মহাপণ্ডিত ব্যক্তিরা যাঁরা মোটা মোটা বই লিখতেন তাঁরা ছাপাখানার কোনো ব্যাপারের খোঁজ-খবর তো রাখতেনই না, পরন্তু ঐ ব্যাপারে কিছু জানা না বুঝবার চেষ্টা করাকে নিজেদের গৌরবহানিকর মনে করতেন। আর এ কালের একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে যতটুকু খোঁজ-খবর রাখেন সেটা আমাদের সময়ে শুধু কলেজের জ্যোতির্বিদ্যা-বিষয়ক অধ্যাপকদের দখলে ছিল। বিংশ শতাব্দীর একজন প্রযুক্তি বিজ্ঞানীর দর্শনশাস্ত্রের অ-আ, ক-খ না জানাটাই তার নিজের বিষয়ে পারদর্শিতা প্রমাণ হতো। আর এখন একজন উদ্ভিদ্‌বিদ্যা বিজ্ঞানী শিল্প সাহিত্যের যে খোঁজ-খবর রাখেন তাতে আমাদের সময়ের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের আচার্যের পদ তাঁকে অনায়াসেই দিতে পারা যায়।

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষার্থীদের জন্যে বই লেখেন তাঁরাই যাঁরা ঐ বিষয়টি পড়ান। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, পাঠ্যপুস্তক প্রণেতারা পরামর্শ গ্রহণ করেন ঐ

বিষয়ে আগ্রহশীল ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকেও। অর্থাৎ এ কালে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয় শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের যৌথ দায়িত্বে।

এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, ছাত্রীরাই শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়গুলিতে তুলনামূলকভাবে ছাত্রদের চেয়ে বেশী আগ্রহশীল এবং ঐ বিষয়গুলিতে তাদের যোগ্যতাও বেশী। এখানকার ছাত্রীদের দেখলে আমাদের পুরনো আমলের মানুষ স্ত্রীজাতির প্রতি ধারণা পাল্টে ফেলত। তখনকার দিনে ধারণা ছিল মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় সব দিক থেকেই নিম্নমানের। আসলে শোষণভিত্তিক সমাজে শুধু এক শ্রেণী অন্যকে উৎপীড়ন করেই থামতে পারে না, স্ত্রী-পুরুষের ভেদাভেদ চালু রেখে সমগ্র নারী জাতিকে পুরুষদের সেবাদাসী করে রেখেছিল পুরুষ-শাসিত রাষ্ট্রযন্ত্রে।

উচ্চশিক্ষা বিভাগ

পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী আমি প্রতিদিনই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা, দুটো বিভাগ-উপবিভাগ দেখে বেড়ালাম। অবশেষে ১২ দিন এইভাবে বিভিন্ন শিক্ষায়তন ঘুরে ঘুরে আমার দেখা শেষ হলো। প্রাথমিক, মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ-গুলিতে যেমন একাধিক বিষয় পড়ানো হয়, উচ্চশিক্ষা বিভাগে মাত্র একটি বিষয় নিয়েই শিক্ষার্থীদের পড়তে হয়। অবশ্য আমি আগেই বলেছি, প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিভাগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত শাখা-প্রশাখার সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় ঘটানো হলেও যার যেদিকে অনুসন্ধিৎসা বা প্রতিভা তাকে সেই বিষয়টি ভালোভাবে শেখানো হয় —অন্যান্য পাঠ্যবিষয়ে তার সমপরিমাণ মনোযোগ দাবী করা হয় না। আর এই উচ্চশিক্ষা বিভাগে যখন ছাত্রছাত্রীরা আসে তখন তারা যে বিভাগে ভর্তি হয় তার প্রস্তুতি মাধ্যমিক শিক্ষাসদনগুলি থেকেই নিয়ে আসে।

নালন্দার এই উচ্চশিক্ষা বিভাগে পনেরোটি স্বতন্ত্র বিষয় পড়ানোর ব্যবস্থা আছে। যেমন ভাষা, পুরাতত্ত্ব, জ্যোতির্বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত, সাহিত্য, বাস্তবিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিজ্ঞান, ইতিহাস, কৃষিবিদ্যা, সঙ্গীত, চিত্রকলা এবং যন্ত্র-প্রযুক্তি বিজ্ঞান। পুরাতত্ত্ব শাখায় প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনগুলি সংরক্ষিত আছে এক বিশাল মিউজিয়ামে। এটা বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় দশক নয়, এখন দ্বাবিংশ শতাব্দী —গভীর সমুদ্রের তলদেশ, আকাশ এবং পৃথিবীর কোনো অঞ্চলই মানুষের কাছে দুর্গম বা অগম্য নেই। ফলে বহু প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ইতিহাসের উপাদান সংগৃহীত হয়েছে। তাই অনেক পুরনো ধারণার পরিবর্তনও ঘটে গেছে এবং নতুনভাবে ইতিহাস

ও মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাস বিভাগের সংগ্রহশালা দুটি, একই বহুতল বিশিষ্ট বাড়িতে এবং সংগৃহীত জিনিসগুলিকে যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অনেক কর্মী নিযুক্ত রয়েছে। একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই সংগ্রহশালায় শুধু এ অঞ্চলেরই নয় পৃথিবীর সমস্ত মিউজিয়ামে সংরক্ষিত প্রত্নবস্তুর অবিকল প্রতিমূর্তি বিশদ বিবরণসহ রাখা আছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান বিভাগটি প্রাচীনকালের রাজগৃহ অঞ্চলে অবস্থিত। এখানে এক বিশাল মানমন্দির তৈরী হয়েছে। মানমন্দিরে ছোট বড় নানা মাপের, নানা ধরনের দুরবীক্ষণ যন্ত্র আছে। সবচেয়ে বড় দুরবীক্ষণ যন্ত্রটির সাহায্যে সৌরলোকের গ্রহগুলিকে সাধারণ চোখে যে আয়তনে দেখা যায় তার চেয়ে হাজার গুণ বড় দেখায়। এ ছাড়া মানমন্দিরে একটি বর্ণবীক্ষণ যন্ত্রও রাখা আছে। সবচেয়ে আমায় আশ্চর্য করল এখান-কার মহাজাগতিক বেতার-তরঙ্গ প্রেরক যন্ত্রটি, যার সাহায্যে দূর নক্ষত্রলোকের জীব জগতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। মানমন্দিরের অধ্যক্ষ জানালেন, "বহু দূরাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের গতি-প্রকৃতির পরিচয় আজ আর মানুষের অজানা নেই কিন্তু দীর্ঘ অনুসন্ধান ও উন্নততর বেতার-তরঙ্গ প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে আমরা এখন জানতে পেরেছি, এই গ্রহের বুদ্ধিমান জীব মানুষের মতোই দূর নক্ষত্রের গ্রহ জগতে এমন প্রাণী আছে যারা আমাদের বেতার-তরঙ্গ সঙ্কেতের উত্তর পাঠাচ্ছে। যদিও বহু আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিতির জন্য আমরা তাদের বিশদ পরিচয় এখনও পাইনি। তা'ছাড়া এটা খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি, মহাবিশ্বে জীবের ক্রমবিকাশের অনুকূল আবহাওয়া দূর নক্ষত্রলোকের অনেক গ্রহে বিরাজ করছে।" মানমন্দিরের যন্ত্রপাতি দেখে বিশেষ কিছুই বোধগম্য হচ্ছিল না, কিন্তু অধ্যক্ষের কাছ থেকে যখন সবিস্তারে এই অসীম মহাবিশ্বের নবলব্ধ জ্ঞানভাণ্ডারের সন্ধান পেলাম তখন মনে হলো এমন দিন হয়ত খুব দূরে নয় যখন এই পৃথিবীর মানুষ ভিন্ন গ্রহলোকে নিজের উপনিবেশ গড়ে তুলবে এবং সেখানকার প্রতিকূল পরিবেশকেও নিজের উপযোগী করে নেবে উন্নততর প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্যে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা বিভাগের পাঠক্রম শেষ করে কেউ যদি কোনো বিষয়ে অধিকতর শিক্ষা এবং গবেষণায় উৎসাহী ও যোগ্য বিবেচিত হয় তা'হলে তারও ব্যবস্থা আছে এখানে। নালন্দার গবেষণা বা বিশেষজ্ঞ শ্রেণীতে পড়তে আসে শুধু ভারতের সেরা ছাত্র-ছাত্রীরাই নয়—চীন, জাপান, আফ্রিকা, ইউরোপ প্রভৃতি দেশের মেধাবী ছাত্রদের ভীড় লেগেই আছে।

সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা

নালন্দায় থাকাকালীন অধ্যাপক বিশ্বামিত্র এবং অন্যান্যদের সঙ্গে আলোচনা করে এই দ্বাবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেকটাই জেনে নিলাম। খৃষ্টীয় সনের হিসাব মতো এটা ২১২৩ সাল। সারা বিশ্বে সাম্যবাদী ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়ে গেছে এবং আমাদের সময়ের তথাকথিত বহু স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্র এখন এক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে ঐক্যবদ্ধ। এই নতুন দুনিয়ার মানুষের মধ্যে কোনোরকম বিভেদ বা শ্রেণীগত বৈষম্য নেই। রাজা-প্রজা, মহাজন-খাতক, বণিক-ক্রেতা এই ধরনের যে-সব সম্পর্ক মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করত ; সামান্য সংখ্যক কিছু লোকের মুনাফা-লালসার শিকার হতো বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ, সেইসব বিভেদ-মূলক শোষণভিত্তিক সমাজের ব্যাধিগুলি চিরকালের মতো অবলুপ্ত হয়ে গেছে।

সারা পৃথিবীর মানুষজন আজ পরস্পরের আত্মীয়। পৃথিবীর সমস্ত স্থাবর জঙ্গম সম্পত্তির মালিকানা আজ সমানভাবে সকলের জন্যেই। এখন বিশ্ব-নাগরিকদের নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করতে হয় এবং তার জীবনধারণ এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে যা' কিছু দরকার রাষ্ট্র সব কিছুই তাকে দিয়ে থাকে। যন্ত্র ও উন্নততর প্রযুক্তি বিদ্যার অধিকারী এই শতাব্দীতে মানুষের কায়িক পরিশ্রমের প্রয়োজনও কমে গেছে। তা'ছাড়া শোষণভিত্তিক সমাজে যে অপ্রয়োজনীয় শ্রমের দরকার হয় এবং অপচয় ঘটে সেটা সাম্যবাদী সমাজে যে থাকতে পারে না এটা বলাই বাহুল্য। আজ মানুষ সপ্তাহে মাত্র ২০ ঘণ্টা পরিশ্রমের বিনিময়ে এই দ্বাবিংশ শতাব্দীর উন্নততর সভ্যতার সমস্ত কিছুরই সে অংশীদার।

এ কালের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা বা শাসন-কার্য পরিচালনার ব্যাপারটি সম্পর্কে দু'চার কথা বলে নেওয়া যাক। আপেলগ্রামে যে ধরনের গ্রাম-প্রতিনিধি, গ্রাম-সভাপতি ইত্যাকার ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম বিশ্বরাষ্ট্র পরিচালনা ও প্রশাসন ব্যবস্থা তারই বৃহত্তর প্রতিরূপ। গ্রামসভায় প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় প্রতি ২০০ জনের মধ্যে একজন হিসাবে। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে আবার সকলেই নির্বাচন প্রার্থী হবার যোগ্য হিসাবে বিবেচিত হয়। গ্রামের মানুষদের আহার, বাসস্থান, শিশু রক্ষণাবেক্ষণ অন্যান্য স্থান থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে আসার দায়িত্বগ্রামসভার। তবে গ্রামসভার সদস্যদের কার্যকালীন মেয়াদ তিন বছর মাত্র এবং এই সময়সীমা বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচিত সদস্যদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

গ্রামসভার ওপরে জেলাপরিষদ। গ্রামসভায় প্রতি ২০০ জনের জন্য যেমন এক-

জন প্রতিনিধি থাকেন তেমনি জেলা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয় কুড়ি হাজার লোকের মধ্যে থেকে একজন হিসাবে। একটি জেলার অধীনে কয়েক সহস্র গ্রাম থাকতে পারে সুতরাং জেলা পরিষদের সদস্যসংখ্যা সেই অনুপাতে কম-বেশী হয়। গ্রামসভা জেলা পরিষদের সঙ্গে সব কিছু ব্যাপারে যোগাযোগ রাখে এবং জেলা পরিষদের নির্দেশ একই সঙ্গে সবগুলি গ্রামসভায় পৌছে যায় —ভৌগোলিক দূরত্ব বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে আজ আর কোনো সমস্যাই নয়।

জেলা পরিষদের থেকে উচ্চতর ক্ষমতাসম্পন্ন প্রদেশ-সভা। এই প্রদেশ-সভাগুলি কয়েকটি জেলা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত এলাকা নিয়ে। প্রতি ২ লক্ষ নাগরিকের প্রতিনিধিত্ব করেন একজন নির্বাচিত সদস্য, যাঁর কার্যকালীন মেয়াদ অন্যান্য প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থার সদস্যদের মতোই তিন বছরের জন্যে। প্রদেশ-সভা কতকগুলি বিষয়ে, যেমন অপরাধীদের শাস্তিদান, উন্নয়নমূলক কার্যসূচী প্রণয়ন ইত্যাদি ব্যাপারে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। প্রদেশ-সভার ওপরে দেশসভা, যেখানে প্রতি দশ লক্ষ নাগরিক পিছু একজন করে নির্বাচিত হন। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নিজেদের মধ্যে থেকে একটি মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করেন এবং প্রত্যেক মন্ত্রীর অধীনে এক বা একাধিক দপ্তর থাকে।

এরপর সার্বভৌম বিশ্বরাষ্ট্র পরিচালন পরিষদ যেখানে প্রতি ৫০ লক্ষ নাগরিক পিছু একজন করে নির্বাচিত হন। বর্তমান বিশ্বে শিশু এবং ছাত্রদের বাদ দিয়ে সাবালক তথা প্রতিনিধি নির্বাচক মণ্ডলীর সংখ্যা ১৫০ কোটি। তাই বিশ্বরাষ্ট্র সংস্থায় নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা ৩০০। এই ৩০০ জন সদস্যের মধ্যে ভারত থেকে নির্বাচিত হন ৪০ জন। প্রতিনিধিরা নিজেদের মধ্যে থেকে ১৫ জনের এক মন্ত্রিপরিষদ্ গঠন করেন এবং ঐ মন্ত্রিপরিষদের একজন সভাপতি নির্বাচিত হন ; যিনি এই সার্বভৌম বিশ্বরাষ্ট্র সংঘের প্রধান বা সভাপতি। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলে আমাজন নদীর তীরে বিশ্বরাষ্ট্রের রাজধানী। ঐ নগরীর নাম সার্বভৌম নগর।

এখন থেকে ১০০ বছর আগে সমগ্র বিশ্ব এক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে নিজেদের সংযুক্তিকরণ ঘটিয়েছে এবং মানবজাতির ইতিহাসে সেই স্মরণীয় ঘটনার স্মারক হিসাবে সার্বভৌমী সনও প্রচলিত হয়েছে। এখন খৃষ্টাব্দ, শকাব্দ এইভাবে ক্যালেণ্ডারে বছরের হিসাব গণনা করা হয় না।

বিশ্বরাষ্ট্রের সার্বভৌম সভার সকল সদস্য, মন্ত্রীমণ্ডলী এবং সভাপতি সকলেই বিশ্বরাষ্ট্রের রাজধানী সার্বভৌম শহরে বাস করেন এবং সব কিছু কাজকর্ম 'সার্বভৌমী' ভাষার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। শহরের জনসংখ্যা ৫০ হাজার এবং পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চলের মানুষের বসবাস ঐ মহানগরীতে।

সাম্যবাদী বিশ্বে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ তথা জন্ম-নিয়ন্ত্রণ একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। বিশ শতক থেকেই বিজ্ঞানীরা জনস্ফীতি রোধের জন্য গবেষণা চালিয়ে আসছিলেন

কিন্তু সাম্যবাদী সমাজ সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত বহু রকমের চেষ্টা, নানা ধরনের প্রলোভন সত্ত্বেও এ ব্যাপারে কোনো উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সর্বোচ্চ সার্বভৌমী রাষ্ট্রসংঘ থেকে একেবারে নীচের গ্রামসভা পর্যন্ত সমস্ত স্তরের প্রশাসনিক শাখার ওপর ন্যস্ত। এই জন্যে প্রতি দশ বছরে অন্তত একবার করে জনগণনা করা হয় এবং জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধির হিসাব নিয়ে পরবর্তী দশ বছরের জন্ম-নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়। এই বিভাগ তু'মাসের বেশী গর্ভবতী মহিলাদের হিসাব রাখে এবং সে সম্পর্কে নিয়মিত বিভাগীয় মুখপত্র প্রকাশ করার ব্যবস্থা আছে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মূল উদ্দেশ্য তুটি। প্রথমত, সারা পৃথিবীর জনসংখ্যা যেন এমন একটি সীমার মধ্যে থাকে যাতে সীমাবদ্ধ পৃথিবীতে উৎপাদিত সমস্ত রকমের জিনিস সকলেই পর্যাপ্ত পরিমাণে পায়। দ্বিতীয়ত, বংশানুক্রমে যে সব রোগের বিস্তার ঘটে সেইসব রোগীদের প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট করে দিয়ে কয়েক ধরনের রোগকে পৃথিবী থেকে নির্মূল করা। অবশ্য বংশগতির কারণে যে রোগে নবজাতকরা আক্রান্ত হতো সেই ধরনের রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা কোনো সন্তানের জন্ম না দিয়ে বেশ কয়েক দশক আগেই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়েছে। এর পরেও কখনও এমন কোনো রোগের সন্ধান যদি পাওয়া যায় যা' রোগীর বংশধরদের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে বর্তাবে, সেখানেও বৃহত্তর জন-জীবনের স্বার্থে সেইসব রোগাক্রান্ত পুরুষ বা মহিলাদের শল্য চিকিৎসার সাহায্যে নির্বীজ বা বন্ধ্যা করে দেওয়া হয় যদিও সেইসব রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা যৌনজীবনের সুখ-অনুভূতির থেকে বঞ্চিত থাকে না।

বর্তমানে জনসংখ্যা-নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞদের মতে কোনো দম্পতির তুটির বেশী সন্তান থাকা উচিত নয়। কারণ অপুষ্টি, দারিদ্র্য এইসব কারণে অকাল মৃত্যুর সংখ্যা একেবারেই নেই আবার উন্নততর চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং সুসম খাদ্যাভ্যাসের ফলে মানুষ এখন অনেক বেশী দীর্ঘজীবী। তাই বর্তমান বিশ্ব-ব্যবস্থার লক্ষ্য জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির অনুপাত যেন সমান সমান থাকে। এখন সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় সকল মানুষই সুশিক্ষিত এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব সকল নাগরিকের কাছেই সুস্পষ্ট। তাই একাধিক সন্তানের জনক-জননীরা জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য যে সব সর্বাধুনিক ব্যবস্থা আছে তার একটিকে বেছে নেয়। বলে রাখা ভালো এ কালের জন্মনিরোধক পদ্ধতি মানুষের স্বাভাবিক যৌন-আবেগ বা ক্ষমতা বা যৌনমিলনের আনন্দের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। একদা জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা সমাধানের জন্যে ধনিকশ্রেণীর নেতারা সাধারণ মানুষকে সংযম অভ্যাসের উপদেশ দিতেন। অবশ্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যাটা তাঁরা ভুল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতেন। কিন্তু জনসাধারণকে অশিক্ষার অন্ধকারে রেখে তাদের দিয়ে যৌন-সংযমাভ্যাস করিয়ে ঐ সমস্যার যে

কোনো সমাধান করা যায় না সেটা বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর জনবহুল দেশগুলির অবস্থা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়। ফলে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বড় ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় তখনকার দিনের রাষ্ট্র নেতাদের জনস্ফীতি সমস্যার সাময়িক সমাধান এনে দিত। এখন সাম্যবাদী বিশ্বে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী এ সবই অতীত ইতিহাসের বিষয়। তাই শারীর বিজ্ঞানীরা এগিয়ে এসেছেন এই সমস্যার সমাজ কল্যাণাভিমুখী সমাধানের হাতিয়ার নিয়ে।

নালন্দা থেকে বিদায়

পুরো পনেরোটি দিন নালন্দায় কাটিয়ে এ বার নালন্দা থেকে বিদায় নিলাম। বিশ্বামিত্র অতীত এবং বর্তমান পৃথিবী এবং সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে অভিজ্ঞ। তা'ছাড়া সেই আপেলগ্রাম থেকে শুরু করে তার সাহচর্যে একদিনও বঞ্চিত হইনি। আমি বিশ্বামিত্রকে আমার ভ্রমণ-সঙ্গী হবার জন্যে অনুরোধ জানালাম। বিশ্বামিত্রও বোধহয় এই বৃদ্ধের প্রেমে পড়ে গিয়েছে সুতরাং আমার অনুরোধ মঞ্জুর হলো। এখানে আসার পথে পাটনা স্টেশনে গাড়ী বদল করেছিলাম কিন্তু সেই সাত সকালে পাটনা শহরের কিছুই চোখে পড়েনি। তাই ঠিক করলাম, নালন্দা থেকে সোজা পাটনায় যাব। তারপর অন্যান্য জায়গায় যাবার কথা চিন্তা করা যাবে।

দিনের বেলা যাত্রা শুরু হলো, ফলে পথের দু'পাশের নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী দু'চোখ ভরে দেখতে দেখতে চললাম। এ অঞ্চলের প্রতিটি গ্রাম প্রত্যেকের বিশিষ্টতা বিশ্বামিত্রের নখদর্পণে। তাই আমার দেখা এবং বিশ্বামিত্রের সঠিক সংবাদ এই দু' ঘণ্টার যাত্রাপথকে আনন্দময় করে রাখল। রেল লাইনের দু'পাশে আমের বাগান দেখে বিশ্বামিত্রকে বললাম, "আমাদের সময়ে এখানকার ল্যাংড়া, ফজলী আম জগদ্বিখ্যাত ছিল।"

বিশ্বামিত্রের তড়িৎ জবাব, "এখনও তাই আছে, তবে আকারে এবং স্বাদে আরও উন্নতি ঘটেছে। তা'ছাড়া আপনাদের সময়ে যেমন বছরে একবার ফল পাওয়া যেত এখন কিন্তু সারা বছরই সুপক্ক আম পাবেন।"

ট্রেনে চলতে চলতেই ট্রেনের গল্প এসে গেলো। বিশ্বামিত্রের কাছ থেকেই শুনলাম অস্ট্রেলিয়া এবং তার সংলগ্ন দ্বীপপুঞ্জ ছাড়া সারা পৃথিবী রেলগাড়ীতেই ঘুরে আসা যায়। কাঠমাণ্ডু, দার্জিলিং এবং সদিয়া এই তিনটি স্টেশন থেকে রেল লাইন হিমালয় অতিক্রম করে তিব্বতে প্রবেশ করেছে এবং তিব্বতের দুর্গম সমস্ত অঞ্চলই রেলপথের সঙ্গে যুক্ত। তিব্বত থেকে রেলপথ সমগ্র মোঙ্গোলিয়ায় জাল বিছিয়ে সাইবেরিয়ার দিকে চলে

গেছে ; আর একটি শাখা মোঙ্গোলিয়া থেকে মাঞ্চুরিয়া হয়ে চীনের ইয়েনান অঞ্চল ঘুরে শ্যাম-কম্বোজ পর্যন্ত বিস্তৃত। অবশ্য ভারতের আসাম থেকে একটি রেল লাইন চট্টগ্রাম হয়ে ব্রহ্মদেশের একদম দক্ষিণ সীমান্ত ছুঁয়ে মালয়, সিঙ্গাপুর অতিক্রম করে সমুদ্রের নীচে সুরঙ্গ পথে পাড়ি দিয়ে সুমাত্রা ইন্দোনেশিয়ার মাটিতে পৌঁছে গেছে। এদিকে তিব্বত থেকে পশ্চিমে তাসখন্দ, সমরখন্দ, আফগানিস্তান, ইরান সহ সমগ্র আরব দেশগুলিতে রেলপথেও যাওয়া যায়। উরাল পর্বতের বাধা অতিক্রম করে পশ্চিম এশিয়া থেকে রেলপথ ইউরোপের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। ফ্রান্স ও ইংলণ্ড এখন ইংলিশ চ্যানেলের বাধা অতিক্রম করে রেলপথে সংযুক্ত। আবার সুয়েজ খালের গর্ভে সুরঙ্গ পথে রেললাইন এশিয়া এবং আফ্রিকার মধ্যে যাতায়াতের সুবিধা করে দিয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে অফ্রিকার নাম উঠতে এ কালে আফ্রিকার অবস্থা সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। শুনলাম, এখন আফ্রিকা আর অজানা-অন্ধকার মহাদেশ নয়। বিংশ শতাব্দীর বর্ণবিদ্বেষ, পারস্পরিক জাতিগত সংঘাতময় আফ্রিকা এখন দুঃস্বপ্নের মতোই বিগত দিনের কাহিনী। শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলাম আফ্রিকার বিখ্যাত সাহারা মরুভূমিকে এক বিশাল হ্রদে পরিণত করা হয়েছে, ফলে আফ্রিকার বিশাল মরু অঞ্চল শস্য-শ্যামল হয়ে উঠেছে। ইউরোপ, এশিয়ার বহু লোক এখন আফ্রিকার স্থায়ী বাসিন্দা। বর্ণবৈষম্যের কলঙ্কময় যুগের অবসানে এখন আফ্রিকার আদিবাসীদের সঙ্গে নবাগত ইউরোপ বা এশিয়াবাসীদের মধ্যে কোনো বিভেদের প্রাচীর মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে নেই।

আবার রেলপথে বিশ্বপরিক্রমার খবর বলি। সাইবেরিয়া থেকে বেরিং প্রণালীর ওপর দিয়ে রেল লাইন আমেরিকা মহাদেশে পৌঁছে গেছে। অতঃপর কানাডা মেক্সিকোর সঙ্গে রেল যোগাযোগ আর কোনো সমস্যাই নয়। পুরো উত্তর আমেরিকা ঘুরে পানামা খালের নীচের সুরঙ্গ পথ ধরে রেল লাইন পৌঁছে যাচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকায় …তাই অস্ট্রেলিয়া সহ কয়েকটি দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জকে বাদ দিলে গোটা পৃথিবীটাই রেলগাড়ীতে চেপে বেড়িয়ে আসা যায়। তবে এ কালে কর্মব্যস্ত পৃথিবীতে রেলগাড়ীর তুলনায় বিমানের কদর বেশী। আর সমুদ্রের বুকে জাহাজের প্রয়োজন এখনও ফুরিয়ে যায়নি এবং এ কালে জাহাজের গতিবেগ বিংশ শতাব্দীর আমাদের সময়ের তুলনায় ১০০ গুণ বেশী। বিশ্বামিত্র আমাকে জানাল, এখন উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুতে মানুষ বিশেষ ধরনের কাজের জন্যে কয়েক মাস পর্যন্ত থাকতে পারে। আমার মনে পড়ল ক্যাপ্টেন স্কটের কথা, কি দুর্যোগ কি প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার মধ্যে তিনি তাঁর সহযাত্রীদের সঙ্গে জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন সেইখানেই যেখানে আজ মানুষ খুব স্বাভাবিকভাবেই যাতায়াত করছে।

পাটনায় এসে পৌঁছালাম। স্টেশনে মগধ প্রদেশ-সভার সভাপতি এবং অন্যান্য

নাগরিকবৃন্দ আমায় অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। এই অভ্যর্থনা পেতে পেতে একটা জিনিস লক্ষ্য করছি, মানুষ আমাদের সময়ের তুলনায় অনেক বেশী আন্তরিক আবার বাহ্যাডম্বর তুলনামূলকভাবে কম। নতুন সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষের যে গুণগত পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে এটা তারই একটা লক্ষণ।

নগর পরিভ্রমণের পর দেখলাম বর্তমানে পাটলীপুত্রকে একটা স্বতন্ত্র অঞ্চল হিসাবে গণ্য করা হয়, আর খোদ পাটনা শহরের সমস্ত চেহারাটাই পাল্টে গেছে। এখন পাটনা শহরের বাসিন্দা মাত্র পনেরো হাজার। পুরনো আমলের নোংরা গলি, ঘিঞ্জি বস্তি, পরিকল্পনাহীন নগর স্থাপত্য যেন ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে এক নতুন নগরীর পত্তন ঘটানো হয়েছে। নাগরিকদেব আবাসিক গৃহগুলি আমার দেখা গ্রামের বাড়ির মতোই। সেই সামনের দিকে ফুলের বাগান, দু'সার বাড়ির পরেই চওড়া রাস্তা, রাস্তায় শ্রেণীবদ্ধভাবে ছায়াতরু। তবে পাটনা যেহেতু মগধ প্রজাতন্ত্রের রাজধানী তাই এখানে অনেকগুলি বহুতল বিশিষ্ট সরকারী ভবন আছে। প্রদেশ-সভার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ও এখানে। একটি পঞ্চাশতল বিশিষ্ট বাড়ি চোখে পড়তে জিজ্ঞেস করে জানলাম যে, ঐ বাড়িটি সরকারী দলিল-পত্রের সংরক্ষণাগার। কিন্তু আমাকে সব চেয়ে মুগ্ধ করল এই শহরের 'অশোক ভবন' নামের একটি বাড়ি। স্থাপত্যকলায় এবং গঠনশৈলীতে এই ভবনটি নালন্দায় অবস্থিত 'বিশ্ববন্ধু ভবন'-এর অনুরূপ তবে সবদিক থেকেই শ্রেষ্ঠতর। ভবনের প্রবেশদ্বারে বড় বড় হরফে লেখা আছে এই শহরের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের স্মারক বুদ্ধের সেই অমর বাণী : 'এযে চ মুখ ভুতে বিজয়ে দেবনং প্রিয়স যো ভ্রম বিজয়ো'।

গণ-প্রজাতন্ত্রী ভারত

পাটনা থেকে রওনা হয়ে আমি ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রদেশে এবং দ্রষ্টব্য স্থানগুলি ঘুরে দেখতে আরম্ভ করলাম। আমার এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ডায়েরীর পাতায় প্রত্যেক দিনই লিখে রেখেছিলাম। কিন্তু বই লিখতে বসে বুঝতে পারছি আমার লেখা দৈনিক রোজনামচার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বাদ দিয়েও যদি গ্রন্থভুক্ত করি তা'হলে আপনাদের প্রচণ্ড রকমের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে এবং এখন পর্যন্ত যতটুকু লিখেছি তাতেও আপনারা অনেকেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছেন। বাস্তবিকই, এই বিশাল দেশ পর্যটন করে আমি যা দেখলাম বা জানলাম সে' সব তিন বা চারটি বাক্যেই শেষ করে দেওয়া যায়। তাই পাঠকদের কাছে কৌতূহলোদ্দীপক হতে পারে এমন দু' তিনটি বর্ণনা দিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করব।

পাটনা থেকে ট্রেনে কাশী পৌঁছালাম। কিন্তু বিশ শতকে যে কাশী দেখা ছিল সে ধরনের কোনো কিছুর অস্তিত্ব আর নেই। কাশীর সরু সরু গলি-ঘুঁচি ভেঙেচুরে বড় বড় রাজপথ তৈরী হয়েছে। পুরনো নামেই দশাশ্বমেধ ঘাট, মণিকর্ণিকার ঘাট আজও আছে কিন্তু তার রূপান্তর ঘটে গেছে বহুল পরিমাণে। ঘাটগুলিতে স্নানার্থীদের আনা-গোনা যথেষ্টই কিন্তু পুরনো আমলের মতো ঘাটে ভিখারী, সন্ন্যাসী আর পাণ্ডাদের ভীড় একেবারেই নেই। আসলে সাম্যবাদী দুনিয়ায় ঠাকুর দেবতাদের বড়ই দুরবস্থা; কেউই কোনো ঠাকুর-দেবতায় ভক্তি শ্রদ্ধার ধার ধারে না; ফলে ঠাকুরের অনুচর পুরুত-পাণ্ডাদের জমজমাট পেশাটি অবলুপ্ত হয়ে গেছে। এখন ঘাটগুলি শ্বেতপাথরে বাঁধানো, গঙ্গাবক্ষে বিদ্যুৎ-চালিত নৌকার আনাগোনা। কাশীর কুখ্যাত বেশ্যাপল্লী দালমণ্ডীর গলি যে কোথায় ছিল তার সন্ধান হয়তো পুরনো দিনের শহরের ম্যাপে পাওয়া যাবে কিন্তু বর্তমান বিশ্বে বেশ্যাবৃত্তির মতো একটি জঘন্য জিনিস অনেক আগেই উঠে গেছে। কাশী শহরের জনসংখ্যা এখন পঁচিশ হাজার। পুরনো আমলে পঁচিশ হাজার মানুষ শহরের ছোট্ট একটি এলাকার মধ্যে বাস করতে বাধ্য হতো। এখন সুপরিকল্পিত নতুন শহরে পঁচিশ হাজার মানুষ ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন এলাকায়। কাশীর বিখ্যাত মন্দির সমূহ এখন ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য স্থান হিসাবে সংরক্ষিত এবং পৃথিবীর সব দেশ থেকে পর্যটকরা যখন আসেন তখন বিনা বাধায় এবং জুতো-মোজা পরেই মন্দিরের ভেতরে ঢোকেন এবং ঘুরে ফিরে দেখেন।

উত্তরভারত ভ্রমণ শেষ করে আমি দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি স্থান এবং শ্রীলঙ্কা সফর করি। তারপর পূর্ব ভারতের উড়িষ্যা বঙ্গ, আসাম ঘুরে সোজা বর্মায় চলে যাই। এই সুদীর্ঘ পথ-ভ্রমণে আমার কোনো ক্লান্তি বা অবসাদ আসেনি। কারণ চলন্ত ট্রেনেই থাকি অথবা অতিথিনিবাসে বিশ্রাম করি কোথাও কোনো রকম অসুবিধা বা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাটাতে হয়নি। এটা কিন্তু আমার জন্যে বিশেষ কোনো ব্যবস্থা হয়েছিল ভাবলে ভুল করা হবে। এখন পৃথিবীতে সব মানুষের সমান অধিকার এবং জাতি-বর্ণ-ধর্ম এ সবের কোনো ভেদাভেদ আজকের মানুষের চেতনার মধ্যে নেই।

বর্তমান জগতে যা নেই

শ্রেণীভিত্তিক সমাজে মানুষের মধ্যে সম্পদশালী বা ধনী হবার বাসনা থাকত এবং সে কালের সমাজে সেটা মানুষের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা বলে গৃহীত হতো। তখন সমস্ত সমাজ, রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালিত হতো ধনিকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ তত্ত্বাবধানে। তখনকার দিনে ধনী ব্যক্তিরা কখনই এ কথা চিন্তা করত না কোন জিনিসের উৎপাদনে শ্রমের অপচয় ঘটে আবার কোন উৎপাদিকা শ্রমশক্তি সমাজের পক্ষে হিতকর। পুঁজিপতিরা সমস্ত জিনিসের উৎপাদনের সময় একটা জিনিসই মাথায় রাখত —উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা বাজারে কতটুকু। তাই যে জিনিসের চাহিদা আছে তা' সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর হলেও তাদের সে-সব জিনিসের উৎপাদনে কোনো দ্বিধা হতো না। যেমন মদ, তামাক এ সবের উৎপাদনে তখন ধনী ব্যক্তিদের উৎসাহ-উদ্যোগের সীমা ছিল না। কিন্তু দ্বাবিংশ শতাব্দীর সাম্যবাদী বিশ্বে এ ধরনের অপচয়ের চিন্তা করাও যায় না। এখন মানুষের শ্রমশক্তি নিয়োজিত হয় শুধু জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদনে। আবার এ যুগে প্রযুক্তি বিজ্ঞানের লক্ষ্য হলো মানুষের জীবনকে সুখী ও সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলা। তাই সেকালে শ্রমিকশ্রেণী দিনে ৮ ঘণ্টা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যা মজুরী হিসেবে পেত তাতে দু'বেলা ভরপেট খাওয়া জুটতো না। এখন একজন শ্রমিক উন্নততর যন্ত্রপাতির সাহায্যে মাত্র ৪ ঘণ্টায় যা' উৎপন্ন করে সেটা বিশ শতকের ঐ রকম অমানবিক পরিশ্রমী শ্রমিকের ১০০ ঘণ্টা শ্রমের উৎপাদনের সমান। আর এ যুগের শ্রমিক যে আরাম এবং সব রকম সুযোগ-সুবিধা পায় সেটা আমাদের সময়ের কারখানার মালিকরা যদি দেখে যাবার সুযোগ পেতেন তা'হলে নির্ঘাৎ হার্টফেল করতেন।

এ কালের সমাজ-ব্যবস্থায় মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে প্রয়োজন হয় না। কারণ সাম্যবাদী সমাজে সব কিছুর মালিক রাষ্ট্র নিজেই আবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সমগ্র বিশ্ব-মানবের হাতে। তাই পুরনো দিনের নানা নিপীড়নমূলক রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধানের অবলুপ্তি ঘটে গেছে। যেমন দেওয়ানী মামলা, ইনকাম-ট্যাক্স, নানা ধরনের পণ্যের ওপর শুল্ক, শেয়ার কেনা-বেচা ইত্যাদি। আর চুরি ডাকাতি ছিনতাই-এর ঘটনা নিয়ে ফৌজদারী মামলা-মোকর্দমাও বিগত দিনের ইতিহাস মাত্র। কারণ সাম্যবাদী সমাজে টাকার বিনিময়ে অধিকতর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের কোনো রাস্তা নেই। প্রত্যেক কর্মরত ব্যক্তি, শিশু-কিশোর, বৃদ্ধ এবং শারীরিক দিক থেকে অপটু মানুষের যা কিছুর প্রয়োজন সব কিছুরই জোগান দেয় রাষ্ট্র। সুতরাং টাকার

লেনদেন যেমন উঠে গেছে তেমনি মানুষের মধ্যে অপরের জিনিস চুরি করা কোনো অবস্থাতেই মনের মধ্যে আসতে পারে না।

আমাদের পুরনো দিনের কালো কোট, কালো টাই পরা উকিল-ব্যারিস্টার শ্রেণীটির কথা মনে পড়ল। যাদের কাজ ছিল বিচারালয়ে দোষীকে নির্দোষ এবং নির্দোষকে দোষী প্রমাণ করার চেষ্টা করা। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই ছিল কিন্তু তখনকার সমাজে প্রতিপত্তিশালী ঐ বৃত্তিজীবীদের খপ্পরে একবার পড়লে ভিটে-মাটি বন্ধক দিয়ে তাঁদের দক্ষিণা যোগাতে হতো। এখন যে সামান্য দু'চারটি মারামারি বা সমাজ-বিরোধী ব্যক্তিদের বিচার হয় সেখানে কোনো পেশাদার আইনজীবীর দরকার হয় না। অভিযোগকারী এবং অভিযুক্ত নিজেদের বক্তব্য নিজেরাই বিচারকদের কাছে পেশ করে এবং যারা বিচারক নিযুক্ত হয় তাদের বহু ধারা-ভাষ্য সম্বলিত আইন-কানুনের চুল-চেরা বিচার করতে হয় না। এ যুগে শুধুমাত্র মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেই অপরাধীদের বিচার হয়। মানবিক দৃষ্টিকোণ অর্থে ব্যক্তির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বা প্রবণতাকে যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয় তার চেয়ে অনেক বেশী লক্ষ্য রাখা হয় মানুষের সামাজিক অবস্থানের ওপর। অর্থাৎ কোনো কাজ শাস্তিযোগ্য কিনা সেটা বিচার করা হয় এই সাম্যবাদী সমাজের ইষ্ট-অনিষ্টের প্রতি লক্ষ্য রেখে।

বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় স্ত্রী পুরুষদের ভেদাভেদ নেই। এখন স্বামী বা স্ত্রী কেউ কোনোভাবেই একজন অপরের ওপর অর্থনৈতিক ব্যাপারে নির্ভরশীল নয়; তাই উভয়ের একমাত্র বন্ধন প্রেম ও ভালোবাসার। একালে বিবাহ যৌনজীবনের সামাজিক স্বীকৃতির অনুষ্ঠান নয়। তাই বিবাহিত জীবনে পারস্পরিক সম্পর্ক কোনো কারণে ব্যাহত হলে বিবাহবিচ্ছেদ খুব সহজেই ঘটতে পারে। তাতে সমাজ বা রাষ্ট্র কোনো বাধা সৃষ্টি করে না। আবার নতুন করে তারা অন্যের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হলে আপত্তির কিছু নেই। আমার মনে হলো, নর-নারীর এই সুস্থ জৈব সম্পর্ক সমাজে থাকার ফলে বহু ধরনের ব্যভিচার, বিকৃতি আপনা থেকেই লোপ পেয়েছে।

আমাদের আমলের বহু পেশা বর্তমান জগতে অবলুপ্ত। যেমন উকিল, ব্যারিষ্টার, বেশ্যা, পুরোহিত, মুচি, মেথর, ভিখারী, বিদূষক, দালাল, ব্যবসায়ী এইসব বৃত্তিজীবী মানুষের অস্তিত্ব নেই। সমাজে প্রভু-ভৃত্য, মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের অবসান ঘটে গেছে। বাল্যবিবাহ, অসম-বিবাহ, দেবদেবীর পূজার্চনা, ইত্যাদি সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অবশেষগুলিও নিশ্চিহ্ন। এই নতুন সাম্যবাদী পৃথিবীতে পুরনো দিনের যাবতীয় কুপ্রথার অবসান ঘটে গেছে—এ কথাগুলো যত সহজে লিখে ফেললাম আসলে কিন্তু দীর্ঘ সময় লেগেছে ঐ সব সমাজ-বিরোধী মানবতা-বিরোধী পেশা ও প্রথার অবসান ঘটাতে। যে দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে দ্বাবিংশ

শতাব্দীর মানুষ সুখী এবং সুন্দর সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে তার ইতিহাস স্বতন্ত্র-ভাবে লিখতে হবে। বহু প্রতিবন্ধকতা এবং রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সত্যোতন অতীতের ইতিহাস একদিকে যেমন ভয়ঙ্কর তেমনি গৌরবোজ্জ্বল।

দ্বাবিংশ শতাব্দীর সাম্যবাদী সমাজ বা রাষ্ট্র যখন জনগণের জন্য কোনো কল্যাণকর কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন তাকে সার্থকভাবে রূপায়ণের দায়িত্ব নেয় দেশের প্রতিটি মানুষ। ব্যাপক ও সর্বজনীন শিক্ষা এবং সংগ্রামী চেতনার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে আজকের দিনের মানুষের মধ্যে তাই এ কালের মানুষ এমন এক পৃথিবীর নাগরিক যা' বিংশ শতাব্দীতে এক অলীক গল্পকথার জগৎ বলেই মনে হবে।